হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা

সত্যজিৎ চৌধুরী

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

সান্যাল প্রকাশন ॥ কলিকাতা-৯

HARAPRASAD SHASTRI SMARAK GRANTHA

A commemoration volume on Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri

কপিরাইট : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র শাস্ত্রী ভিলা নৈহাটি

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৭।

প্রচ্ছদ : গৌতম চৌধুরী

প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল। সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯

মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন। কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র : জয়দুর্গা লাইব্রেরী। ৮-এ কলেজ রো। কলিকাতা-৯

हरप्रसादेन यशोऽर्ज्जितश्रीर्
निष्णातबुद्धिर् निखिलागमेषु ।
सर्व्वानतीतः सुधियः स्वमन्या
दिवंगतः सिद्धिम् अवाप्य कृत्स्नाम् ॥

भारते विदुषाम् मध्ये सुमन्त्रः पथिकृत्तमः ।
गौडवाणीभुजङ्गेषु चैतिह्ये पारदृश्वसु ॥
आख्यानकृत्सु भाषायां प्रत्नतत्त्वे सुदुर्गमे ।
सौगतानां तथा शास्त्रे दर्शने बहुविस्तरे ॥
गूढवर्त्मसु तन्त्रेषु जाग्रत्सु च दिवानिशम् ।
हरप्रसाद शास्त्रीति याति यो ह्यग्रपात्रताम् ॥

बङ्गेष्वेवं व्यहरततरां स्वे महिम्नि स्थितो यः ।
कीर्त्तिर्यस्यास्पृशत बहुशो दिगदिगन्तान् अशेषान् ॥
आचार्य्यं यं वरगुणगणः सन्निषण्णः समस्तस् ।
तस्मा एषा स्तुतिरनिपुणा वन्दनेनार्पिता नः ॥

হরপ্রসাদেন যশোঽর্জ্জিতশ্রীর্
নিষ্ণাতবুদ্ধির্ নিখিলাগমেষু ।
সর্ব্বানতীতঃ সুধিয়ঃ স্বমত্যা
দিবং-গতঃ সিদ্ধিম্ অবাপ্য কৃৎস্নাম্ ॥

ভারতে বিদুষাম্ মধ্যে সুমন্ত্রঃ পথিকৃত্তমঃ ।
গৌড়বাণীভুজঙ্গেষু চৈতিহ্যে পারদৃশ্বসু ॥
আখ্যানকৃৎসু ভাষায়াং প্রত্নতত্ত্বে সুদুর্গমে ।
সৌগতানাং তথা শাস্ত্রে দর্শনে বহুবিস্তরে ॥
গূঢ়বর্ত্মসু তন্ত্রেষু জাগ্রৎসু চ দিবানিশম্ ।
হরপ্রসাদশাস্ত্রীতি যাতি যো হ্যগ্রপাত্রতাম্ ॥

বঙ্গেষ্বেবং ব্যাহরততরাং স্বে মহিম্নি স্থিতো যঃ
কীর্ত্তির্যস্যাস্পৃশত বহুশো দিগ্দিগন্তান্ অশেষান্ ।
আচার্য্যং যং বরগুণগণঃ সন্নিষণ্ণঃ সমস্তস্
তস্মা এষা স্তুতিরনিপুণা বন্দনেনার্পিতা নঃ ॥

শ্রী সুকুমার সেন বিরচিত ।

সূচি

স্মৃতিকথা

রবীন্দ্রনাথকে লেখা শাস্ত্রী মশাই-এর চিঠির আলোকচিত্র। ১৯২৩-এর ২৩ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নৈহাটিতে আসেন। সম্মিলনের আহ্বায়ক ছিলেন শাস্ত্রী মশাই। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে চিঠিখানির আলোকচিত্র প্রকাশিত হল।

চিঠিপত্র প্রসঙ্গে

১.

শাস্ত্রী মশাই প্রাপ্ত চিঠিপত্র সযত্নে রক্ষা করতেন। দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত চিঠির একটি বিরাট সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধেয় সেই মূল্যবান সংগ্রহের বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য কিছু চিঠি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন, এগুলি শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল-এর যত্নে রক্ষা পেয়েছে। নৈহাটির বাড়ির একটি সিন্দুকে আরও কিছু চিঠি রাখা ছিল। দুটি সংগ্রহের শতাধিক চিঠি থেকে নির্বাচিত ৭৭ খানি চিঠি প্রয়োজনীয় টীকা দিয়ে এখানে প্রকাশ করা হল।

বিদেশীয়দের চিঠির বেশির ভাগ য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-বিদ্যা চর্চায় নিরত বিখ্যাত পণ্ডিতদের লেখা। চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল ১৯০১ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্যে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রবর্তক স্যর উইলিয়ম জোন্স; ১৭৮৪-তে তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৭৮৯-এ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। জোন্সের অনুপ্রাণনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সূচিত জায়মান প্রাচ্য-জিজ্ঞাসা ক্রমে ব্যাপ্ত ও গভীর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় পরিণত হয়। প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহের মূলে পশ্চিমী জাতিগুলির সাম্রাজ্যিক স্বার্থের যোগ যেমন ছিল, তেমনি মানবসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানার শুদ্ধ অনুসন্ধিৎসাও ছিল। উপরন্তু প্রাচ্য মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির সঙ্গে পরিচয়ে এবং নিজেদের সাধন-অর্জনের সঙ্গে তার তুলনাত্মক বিচারে পাশ্চাত্ত্য পূর্ণাঙ্গ ভাবে নিজেকে জানবার সুযোগ পেয়েছে। আভ্যন্তরীণ সংকট কাটিয়ে ওঠার আয়াসে আধুনিক য়ুরোপ প্রাচ্য শিল্পসংস্কৃতির সাহায্য নিয়েছে। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে পাশ্চাত্ত্যের আত্মিক সংকট ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে এবং পশ্চিমী মনীষী-সমাজে প্রাচ্য থেকে আলো পাবার আকুলতা বাড়ে। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের নিবিষ্ট গবেষণায়ও প্রাচ্য-বিবিক্ষু পশ্চিমী মানসিকতার প্রমাণ পাই। শাস্ত্রী মশাইকে লেখা বিদেশী মনীষীদের চিঠি সবই এই কালপর্বের অন্তর্গত। এ-সময়ে য়ুরোপের সব প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পালি ভাষা-সাহিত্য এবং ভারতবিদ্যার বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে পঠন পাঠন ও গবেষণার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সমসাময়িক য়ুরোপীয়

ভারতবিদ্যাবিদেরা অনেকেই হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামীয় বিদ্যায় প্রাজ্ঞ বিশেষজ্ঞ রূপে স্বীকৃত ছিলেন। আমরা এখানে যাঁদের চিঠি সংকলন করেছি, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এই মনীষী-সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ: সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক শ্চেরবাট্স্কোই, পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক লেভি, উত্রেখ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (হল্যান্ড) ভারতবিদ্যার অধ্যাপক কালান্ড, ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেলজিয়ম) তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক পুসাঁ, ওসলো ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের (নরওয়ে) ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক কনো, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জর্মানি) সংস্কৃতের অধ্যাপক য়াকোবি এবং জর্মান পন্ডিত য়োলি ও থিবো, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক বেন্ডেল, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার 'বোডেন অধ্যাপক'—ম্যাক্ডোনেল ও টমাস, প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি। নিজেদের গবেষণার কাজে এঁরা শাস্ত্রী মশাই-এর কাছে কত গভীর ভাবে ঋণী এঁদের চিঠির ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ রয়েছে।

প্রাচীন ভারতবিদ্যার অধিকাংশ তথ্য পুথিতে নিবদ্ধ আছে। পুথি-নিবদ্ধ তথ্যের সাহায্য ছাড়া ভারতবিদ্যা চর্চা অসম্ভব। ভারতীয় পন্ডিতদের মধ্যে শাস্ত্রী মশাই মূল পুথি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। য়ুরোপীয় গবেষকেরা তাঁকে ভারতীয় জ্ঞানের তথ্যভিত্তি বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মনে করতেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় বিদ্যায়ই শাস্ত্রী মশাই পারঙ্গম ছিলেন। পাশ্চাত্তো ভারতবিদ্যার এই দুই শাখা সম্পর্কে গবেষণায় তিনি শিক্ষক ছাত্র পরম্পরায় তিন পুরুষের পন্ডিতদের পরিপোষণ করেছেন।

বিদেশীয়দের চিঠির মধ্যে লর্ড কার্জন ও অন্য কয়েকজন রাজপুরুষের চিঠি আছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, এঁরা অনেকে ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যার গবেষণায় উৎসাহী ছিলেন, গবেষকদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। শাস্ত্রী মশাই-এর সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, গবেষণার কাজে আনুকূল্যও পেয়েছেন।

দেশীয় ব্যক্তিদের চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, গণপতি শাস্ত্রী, গঙ্গানাথ ঝা, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় ও আবদুল করিম-এর চিঠি গুরুত্বপূর্ণ। এসব চিঠি থেকে এঁদের সঙ্গে শাস্ত্রী মশাই-এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়, এবং বোঝা যায়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত ভাবে তখন যে গবেষণার কাজ চলছিল তিনি তার প্রেরণাস্থল ও অভিভাবক ছিলেন।

শাস্ত্রী মশাই-এর নিজের লেখা চিঠিপত্রের উল্লেখ থেকে জানা যায় দেশের আরও অনেকের চিঠি তাঁর সংগ্রহে ছিল, যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। অনেক অনুসন্ধান করেও আমরা এসব চিঠি এখনো পাইনি।

সংকলিত চিঠিগুলি পড়লে আবিশ্ব-মনীষী-সমাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

২.

বিদেশীয় ও দেশীয় ব্যক্তিদের চিঠি 'চিঠিপত্র/এক' ও 'চিঠিপত্র/দুই' শিরোনামে দুটি পৃথক পর্যায়ে ছাপা হল। এক-একজনের চিঠি আমরা তারিখ অনুসারে একগুচ্ছে পর পর রেখেছি। প্রতিটি গুচ্ছের প্রথম চিঠির তারিখ ধরে গুচ্ছগুলি কালক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। দু-একটি ভুল বানান সংশোধন করা ভিন্ন চিঠির মূলপাঠ যথাযথ রাখা হয়েছে। কারো কারো চিঠির দু-একটি বাক্যের গঠনে সামান্য ত্রুটি আছে, এ-ধরনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়নি। নিতান্ত অর্থবোধে অসুবিধে হলে [ ] বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে সম্ভাব্য শব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূল চিঠির নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দ বা বাক্য ইটালিক্-এ ছাপা হল। চিঠির অন্তর্গত ব্যক্তিনাম ও প্রসঙ্গগুলি সম্পর্কে সাধ্যমতো টীকা সংকলন করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়ায় টীকা দিতে পারিনি। পাঠোদ্ধার করা যায়নি এমন শব্দ '...' চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠ নির্ণয়ে সংশয় স্থলে [?] চিহ্ন দিয়েছি।

অধিকাংশ চিঠির পাণ্ডুলিপি জীর্ণ এবং লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার সহজ হয়নি। যথাযথ পাঠ নির্ণয়ে শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার, শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য আমাদের নিরন্তর সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটি অনুলিপি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবনে আছে, মাননীয় উপাচার্য চিঠিখানি ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য এবং শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল তাঁদের সংগ্রহের সমস্ত চিঠি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন। টীকা তৈরির কাজে আমরা সর্বদা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী এবং স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার গ্রন্থাগারিক শ্রীদেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-এর অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। এঁরা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

সম্পাদক

চিঠিপত্র / এক

১.

Paris 1st June 1901

Mon cher ami

I thank you very deeply for your kind despatch of Report on the search of Sanskrit mss. and of notices of Sanskrit mss. As soon as I received the Report, I read it through hastily and I sincerely congratulate you upon your brilliant discoveries. Should India bear many pandits like you! the task of Sanskrit scholars would become too easy; they would have only to pick off leisurely any wanted fruit from that Vol. कल्पवृक्ष. I need not say I feel a special interest in your old mss. of Nepal; on account of that interest I regret that you do not publish full colophons of the mss. under review. Or are they already published in the Proceedings of your Journal of Asiatic Society Bengal? If so I shall do my best to look at these Proceedings, but it is not at all easy to catch them anywhere. You also give an announcement of an extra volume of the notices of Sanskrit mss. to be shortly published. Now what is the meaning of shortly? I should feel intensely obliged to you if you would send me the proof sheets of that volume, or at least of those parts where the colophons are reproduced (date, items, tithi and so on, king, copyist). Of course, I should not miss

---

[ফরাসি ভারতবিদ্যাবিদ্ সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫) পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এ্যকল্ দ্য অউত্‌স এতুদ্‌স-এ, কোলেজ-দ্য-ফ্রাঁস-এ এবং স্ট্রাস্‌বুর্গ-এ সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। বিশেষভাবে বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯২১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট্ উপাধি দেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯২১-এ পরিদর্শক-অধ্যাপক রূপে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন।]

to state that I owe these informations to your kindness. I sent you my summary Report on researches in India and Japan, and later on my paper on Wang Hiuen-tse[১] and his travels in India. I hope both reached you safely, I am doing quite well and I hope and wish to visit again India end of next year. How is monsieur Santosh[২] ? संतोष तुल्यं धनमस्ति नान्यत् and it is said : सन्तुष्टो पितरो यस्मिं स्तेन लोकत्रय जितम् and you can not deny that you have really Santosh with him. I suppose he is now growing an advanced school boy, and an intended Pandit. Give him my best love and believe me,

my dear friend
Yours very faithfully
Sylvain Levi
9 Rue Guy-De-La-Brosse
Paris V

P. S. I think you have heard that France has started an Oriental school at Saigon,[৩] in order to promote Indian and Chinese studies. Sanskrit and Pali are to be taught as well as Annamite[৪] Chinese and Japanese. My friend and pupil Finot[৫] is the Director of this school. He is now staying here on furlough and Foucher[৬] went to Saigon to act as intermediary Director.

১. মহারাজ হর্ষবর্ধন চীনরাজকে উপহার পাঠান। প্রতিদান স্বরূপ চীন রাজের উপহার বহন করে নিয়ে রাজদূত ওয়াং হুয়েন-ৎসে ভারতে আসেন। এদেশে তাঁর আগমন ও অবস্থানের বিবরণ চীনা পুরাবৃত্তে পাওয়া যায়।

২. শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোষ ভট্টাচার্য।

৩. Ecole Francaise d' Extreme Orient.

৪. Annamite ভিয়েতনামের একটি আঞ্চলিক ভাষা।

৫. লুই ফিনো Louis Finot আচার্য সিলভ্যাঁ লেভির শিষ্য ছিলেন। ইনি ভারতবিদ্যা চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেন।

৬. আলফ্রেড ফুশে Alfred Foucher আচার্য লেভির শিষ্য। জীবৎকাল ১৮৬৫-১৯৫২। সংস্কৃত ব্যাকরণ, বৌদ্ধশাস্ত্র ও ভারতীয় পুরাতত্ত্বে বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

২.

My dear sir,

I thank you deeply for the kind presentation of your Valmikir Jaya. I read it with a vivid interest and I hope to give a review of it in our Journal Asiatique. Although being a "Pandit" par excellence, you do not content yourself with dead words and dead names ; you have a sense of real life, and the rishis of old have been taught by you new ideas and new feelings, I dare say, better ones. I wish to hear again and more of you, and of your work. Twelve years ago, I made a call at your place in Mulajor, together with Dr. Bloch.[১] Bloch is no more. Shall I ever see you again and our dear India !

Yours very sincerely
Sylvain Levi
1 Rue Guy-de-la Brosse
Paris V

পারী ডাকঘরের সিল ের
তারিখ ১১. ২. ১০.

৩.

Berek, 22 nd July, 1910.

My dear pandit,

I was awfully busy for some months and could not answer in due time. I beg you to excuse me on account of pressure of work. I felt delighted, and should I say, proud not to be forgotten by your people of India, by your lovely Santosh as well as by my old acquaintances in Nepal. I have just left Paris for the country, to enjoy a well-deserved holiday-rest. I took with me your

১. ইনি Jules Bloch (১৮৮০-১৯৫৩) নন, এঁকে শনাক্ত করা যায় নি।

Valmikir Jaya, to write down an account of it, as I find in it an interesting evidence about the things of New India. Your complaint about preparing old style Pandits is extremely remarkable, as coming from such a high authority as you are. Pandits are no more to be bright and useless 'ratna' in a raja's court : they must live in the midst of life, inform and lead public opinion, think with the people, think for the people and occasionally act for the people. India is actually confronted with two dangers : either keeping too faithfully her old faith or deserting it rashly. To start for a new order of things does not mean indeed a breach of tradition, but a wise and conscious deviation from it. I am sorry to see that new India does not take a sufficient interest in her past, which is the key of her future.

Many thanks for your kind presentation of a fasciculus of Bibliotheca Indica. I am not deep enough in the Sastra that I may read fluently and enjoy such scholastical works. I wonder that you could read and appreciate the Mahayana Sutralankara.[৮] I am now printing a French translation of it, with the help of the Chinese and the Tibetan translation. I shall be very glad to send you a copy as soon as I am back home. Later on, I shall perhaps return to Abhidhammakosha[৯] to compare Chinese and Tibetan with the Turk version discovered by M. A. Stein[১০].

৮. খৃস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যোগাচার শাখা আচার্য অসঙ্গ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। অসঙ্গের রচনা মহাযানসূত্রালঙ্কার-এর একটি সংস্করণ ১৯০৭ খৃস্টাব্দে লেভি পারী থেকে প্রকাশ করেন। নেপাল থেকে নিজের সংগ্রহ করা পুথি এবং তিব্বতি ও চীনা ভাষায় অনূদিত পুথিগুলির তুলনামূলক বিচারের পর তিনি ১৯১১ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

৯. আচার্য অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু (আঃ খৃঃ ৫ম শতাব্দী) রচিত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'অভিধর্মকোষ'।

১০. মার্ক অরেল স্টাইন Mark Aurel Stein (১৮৬২ ১৯৪৩) হাঙ্গেরীয় ভারতবিদ্যাবিদ। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত ভারতে লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ও পঞ্জাব বিশ্ব-

I am very eager to hear more of the Saundarananda[১১]. Do you propose an edition of it? I never read the name among the works of Asvaghosha. If it is an authentic one, it is certainly derived from the Vinaya of the Mula Sarvastivadin[১২]. I have compared many recensions of the tale of Saundarananda in different Vinayas. Please let me know more about your plans concerning the publication of this Kavya.

I am also waiting for your Nepal catalogue. You are indeed a wonderful Pandit and a fortunate man having done such a successful work in Nepal and in Bengal!

As soon as my review of Valmikir Jaya is printed, I send you a copy.

I am, my dear Pandit
Yours very sincerely
Sylvain Levi
1 Rue Guy-de-la Brosse
Paris V

বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। পরে ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন। প্রত্ন ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য ইনি বহু অভিযান পরিচালনা করেন। সংস্কৃত, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

১১. বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে অশ্বঘোষ (আঃ ২য় খৃঃ) রচিত কাব্যগ্রন্থ।

১২. বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে যাঁরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সর্ববস্তুর সত্তায় বা অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁদের 'মূল সর্বাস্তিবাদী' বলা হত। কাশ্মীরের সর্বাস্তিবাদীরাই মূল বা আসল সর্বাস্তিবাদী রূপে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের 'বিনয়' ও 'সূত্র' নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল।

৪.

Paris, 21 st. October 1910.

My dear friend,

I send you the review I give in the coming number of our Journal Asiatique of your Valmiki translated into English.[১৩] I hope I have done justice to the work which I read with such a vivid interest; I felt positively glad to introduce such a man to my colleagues of the Asiatic Society. I suppose you had my letter sent in August where I answered about the Abhidharma Kosha. You congratulate kindly upon my success as a teacher. Be the compliment deserved, I think that the whole of my achievement lies in my love for India: the more I study her, the more I love her for her continuously striving after truth in metaphysics and compassion in ethics; the more I suffer too on account of her perpetual shortcomings, due to unjust disdain of practical truth. Lack of natural science, lack of history (that is the natural science of a nation or of humanity), lack of experimental methods are plagues worse than any disease.

I am still longing for your Saundarananda; when is it to be printed? I am no less interested in your bardic lore[১৪] collected in Rajputana. I have been these years working on vernaculars; I read one hour a week Tulsidas Ramayan; I should have liked to take the Prithiraj rasau[১৫],

১৩. *The Triumph of Valmiki* / of / H. P. Shastri, M. A. / By R. R. Sen, B. L. / Pleader, and Law Lecturer, Chittagong College / Chittagong / 1909.

১৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সংগৃহীত রাজপুতানার চারণ সঙ্গীত। দ্র. H. P. Shastri, *Preliminary report on the operation in search of Mss. of Bardic Chronicles* (1913) এবং *Report of a Tour in Western India in search of Mss. Bardic Chronicles*.

১৫. দিল্লী সিংহাসনের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের (মৃত্যু ১১৯৫ খৃঃ) সভাকবি চন্দ বরদৈ (বরদাঈ) রচিত সম্রাটের জীবন কাহিনী আশ্রিত 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' হিন্দী সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য রূপে বিবেচিত হয়।

but it is of no help as being spurious. That you would soon print the Bardic Kosha you speak of! No man except Grierson[১৬] would peruse it with more joy and delight! Let me know more and more often of your work which is capital to all of us.

I am, my dear friend,
Yours very sincerely
Sylvain Levi
1 Rue Guy-de-la Brosse
Paris V

11 Pinpcct Rd.
St. Albams
Nov. 20, '01.

My dear Pandit,

I am afraid I am troubling you with a lot of requests about Mss. But I find, in finishing off my work (for your Journal & Catalogue) on the Kings of Nepal & neighbouring lands that a great mass of small details are involved requiring verification.

I long ago noted all the dates [in] your interesting article in JASB. for 1893. But I notice that the Candravyakarana[১৭] Ms. at pp. 249-50 is described in quite sufficient fullness for my purpose. I am fairly sure that I have succeeded in identifying that king Sri Vijayarajadeva.[১৮]

[সিসিল বেণ্ডেল Cecil Bendall (১৮৫৬-১৯০৬) ইউনিভার্সিটি কলেজ (লণ্ডন) ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। দুবার ভারত ও নেপাল ভ্রমণে আসেন। বহু সংস্কৃত ও পালি পুথি সংগ্রহ এবং তার বিবরণ প্রকাশ করেন।]

১৬. ৪১ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.

১৭. দ্র. H. P. Shastri, '*On a new find of old Nepalese Manuscripts*', Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. LXII, Part I, No 3, 1893, pp. 245-255

১৮. সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত-এর বর্ণনা অনুসারে নিদ্রাবলীর অধিপতি বিজয়রাজ বরেন্দ্রী অভিযানে রামপালকে সাহায্য করেন।

But to be quite sure I want a *tracing* of the Colophon ; so that I may see (1) general style of writing (2) *details* of date and (perhaps) (3) further details of place where written.

In referring to other Mss. in this Coln., I found with some surprise that they are not mentioned in the gen. Cat. of the Society's bks. and Mss. recently printed by Kunjavihari[১৯] under your direction. Is this an oversight ?

On the tracing you might direct the pandit who makes ...to add the exact location or Library-mark of the Mss.

I am just finishing the article. I hope your own introduction to the Cat. is nearly ready. It would be an excellent thing, if we could manage to issue the Cat. & the journal article nearly simultaneously.

You will see (if Dr. Bloch translated the German to you) that Jolly[২০] of Wurzburg is very anxious to see the Catalogue.

See "Medicin" by Jolly (in Buleleis...undriss)

Nacletrage (Appendix).

Yours sincerely,
C. Bendall

৬.

11 Pinpect Rd.
St. Albams
24 Jan, 02.

My dear Pandit,

I hope you are hurrying on my art. for the J. A. S. B. Please send me several copies (3 or 4) of the proof together with the orig. Ms. (of course). As I said before, I shall

১৯. কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ।
২০. ৯ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.

be glad of suggestions from yourself regarding the interpretation of the bastard sanskrit of that curious chronicle of Nepal.

I saw Prof. Macdonell[২১] of Oxford recently. He said that he applied to you for help in getting hold of a Vedic Ms., but that he did not get an answer from you. He is a man whom you should try to oblige, I think ; a good scholar & much amiable man.

Yours sincerely
C. Bendall

৭.

Cambridge
27 May. '02.

My dear Pandit,

I wrote to you by last mail and received yours of Ap. 30th. just afterwards.

I am sorry that my repeated enquiries as to the Durbar Library Cat. still remain unanswered. What you write about excessive occupation, reads curiously here.

We are all busy here ; but we find time to do what we feel *ought* to be done. It is really no use to bewail want of time & let work like your Catalogue, on which your reputation depends, drift on month after month & year after year. As you yourself point out, you have in common with all Education Officials, the vacations to fall back on.

I am glad you are lecturing on our old friend Shanti-

২১. ৪৪ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.

deva's work.[২২] I hope you use the commentary now appearing in Bibl. Ind. under Poussin's editorship. (Apropos why don't you make those Baptist Mission Press people push it on faster ? It is worth far more than the average of B. Ind. texts.)

Now, pray, "pull yourself together" (as the saying is) & use your summer vacation to good account.

With best wishes,

Yours sincerely,
C. Bendall

[P. S.] Two copies of pt. I of...& nine of III constitute an oversight of mine. Return me a pt. I & I will send you III with pleasure by return mail.

CB.

Send me also the obituary to which you speak.

৮.

30, Jan. '03.
102 Castle Street
Cambridge.

My dear Pandit,

This is to tell you that I am now returning pp I-16 of my article to Mr. Ross.[২৩]

The remainder will be following by *next mail.* So in a week the thing will be out of my hands.

I hope your own prolegomena to the Catalogue are now also ready ; so that it may be issued without delay.

২২. মহাযান পন্থী কবি শান্তিদেব সপ্তম শতাব্দীতে 'বোধিচর্য্যাবতার' গ্রন্থটি রচনা করেন। হরপ্রসাদ The Journal of the Buddhist Text and Research Society-তে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

২৩. ২৮ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.

As I pointed out in answer to a letter of yours in the summer, it is absurd to make out that I have delayed the Catalogue. Your wretched printers have taken 19 months to print 30 pages ! !

I am telling Mr. Ross (but tell you also, so that you may also keep an eye) that in finally passing my article for "press" care must be taken to order also enough copies for the edition of the Catalogue, as well as of the journal. I have also reminded him about the Plate ; as to whether the number ordered by you (750) is enough for *all* purposes. Remember, too, that (I) the heading of my article (2) perhaps also the pagination must be slightly altered before printing it off for your Catalogue.

Mr. Seal (Sil)[২৪] of Chinsura sent me a poem apparently interesting in old Bengali on quaint Buddhistic or Tantric Yoga.

Try & get him to publish his results in English. Why should he not make an art. for JASB or Ind. Antiquary with *Translated extracts* from the Bengali Text.

Bengalis haven't as a rule appreciation of historical Buddhism & Europeans don't know Bengali.

I hope you were pleased with Poussin's article on your Report in JRAS for the present month. It was most handsome, I think ; & certainly most courteous and appreciative.

Yours sincerely,
C. Bendall

[P. S.] By the bye there is no such place as 'Cambridge College, Cambridge'. We have 17 (not merely I) Colleges forming this University. Mine is called 'Caius' (not required, however, in address of letter)

২৪. শিবনাথ শীল।

৯.

Wurzburg, Germany
January 11, 1902.

My dear Sir,

You must have thought me very rude to have been so slow to answer your extremely kind letter of July 4, 1901 & thanking you for valuable sending of the same date. The four copies of your excellent History of India[২৫] have been distributed by me among the corresponding number of eminent Sanskrit Professors in Germany, all of whom are valuing your kind gift very highly. This history is a very useful work in my opinion, and may well serve as a manual for University Lectures on Indian History.

I seize this opportunity of congratulating you on the joyful occasion of your appointment as Principal[২৬] of the Sanskrit College which distinguished institution is sure to prosper in such more than good hands.

My work on Indian Medicine[২৭] for which you enquire is just out, in Buhler's Encyclopedia of Indo-Aryan Research. It contains a long reference to the medical Sanskrit compilations noticed in your valuable Report on the Search of S. Mss. 1895 to 1900. I do not send you a copy of my work, as it is written in German. I should have written it in English, as you have very properly

[য়ুলিউস য়োলি Julius Jolly (১৮৪৯-১৯৩২) জর্মন পণ্ডিত। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ঠাকুর ল' লেকচারার" নিযুক্ত হন।]

২৫. H. P. Shastri, History of India, Calcutta 1895.

২৬. হরপ্রসাদ ১৯০০ খৃস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন।

২৭. মূল গ্রন্থটির নাম *Medicin Abgeschlossen*, Grundriss Der Indo-Arischen Philologie Und Altertumskunde নামক কোষ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গ্রন্থ রূপে ১৯০১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। য়োলির এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ *Indian Medicine* নামে পুণা থেকে ১৯৫১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন সি. জি. কাশীকর

suggested to me, but for the fact that I have been forgetting my English dreadfully in this place in which I am quite cut off from the society of Englishmen.

I have had some correspondence with Dr. P. Cordier[২৮], the learned and able French scholar to whom you have referred me for obtaining copies of Nepalese medical Mss. However, Dr. Cordier could not give much help before his return to India, and he is gone to Pondichery now, where he will be hardly able to give much time to Nepalese Mss.

Prof. Bendall thinks that it would not be difficult for me to obtain the loan of the Kasyapa Samhita and other Mss. to be used by me at Wurzburg University Library. What do you think of the matter? Perhaps it would better if copies of these Mss. were made in Calcutta under your supervision, as you promised to have done. I should send you the money by return of post when the copies are ready. Those medical Sanskrit Mss. would have to be selected which you think particularly important. I should notice the Mss. in a leading Oriental journal.

I am also anxious to obtain a copy of a rare Sanskrit medical work published in Calcutta, 1873, the Sutrasthana of Astangahridayasamhita, by Babhata, revised by Pancananagupta Kavicintamani, printed at the office of Bhuvana Candra Vasak. It contains 180 pp in 80[sic]. This edition, I have been informed by Dr. Cordier, differs materially from all other editions of the Astangahridayasamhita.

I wonder whether the Sanskrit College Library contains any rare medical Sanskrit Mss., and whether I might have a look of them.

২৮. Dr. Palmyr Cordier.

Apologizing for troubling you with these questions, I remain, my dear Sir,

ever yours sincerely
J. Jolly

১০.

Buda...
Jan. 15th, 1902

My dear Sir,

Yesterday I made a discovery of the utmost importance for the editor of the Baudhayana Shrautasutra[২৯]. In the XIth volume of "Notices of Sanskrit Mss." published by yourself, I find mentioned in the Alphabetical Index of Mss. purchased up to 1891 under no १३३१ (Page 77) a Baudhayanasutra ४८ प्रश्नपर्यन्तम्, what I have sought now for period of more than four years seems to be within reach, viz. a nearly *complete* shrautasutra. I do not know if this Mss. has been described elsewhere but the title suffices; it must contain a *complete* Shrautasutra and gaining all except the three prayashcitta prashnas.

Now, my dear Sir will you kindly enable me to continue the publication of this most important of all Shrauta texts and to have the use of the said Mss. 1331?

Could not the Mss. be sent directly to my address here at Buda? You know I will take the utmost care of it. If this might be...in accordance with the restrictions, would you kindly indicate me the steps I have to take, to

[ভিলেম কালাণ্ড Willem Caland (১৮৫৯-১৯৩২), হল্যাণ্ডে জন্ম। স্বদেশে উট্রেখট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও সূত্র-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।]

২৯. বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালায় কালাণ্ড 'বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র' (তিন খণ্ড) ১৯০৪ সালে কলকাতা থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

become a temporary owner of the Mss. ? As things are just new, I have at my disposal many materials gathered from Benares, Bombay and elsewhere, but not enough to reconstruct the last part (two thirds) of the whole work. And firstly this part is the most important. You would oblige not only me personally but that have an...in.. Sanskrit Literature by helping me to get that Manuscript. *Be* so kind, my dear sir ; to help me in this matter.

You will by now have received, I hope my copy of the first 10 prashnas for the Bibl. Indica.

I am, my dear Sir, yours truly and affectionately,

W. Caland

(All costs of expedition and *emballoge* will be most gladly repaid by me.)

১১.

Barchem (Lochem)
30 July, 1904

My dear Sir,

I perceive that the second fascicle of Baudhayana has appeared. May I kindly ask to receive my five gratis ek ? *I regret to state that the disfigured title has not been corrected*. Baudhayana sautra sutra instead of srautasutra or Shrautasutra. I did not receive any new proof since a very long time. Can nothing have gone astray ? The last I had was the revise of fol. 31. How with the honorarium ? Must it wait till the whole work is completed.

Yours faithfully,
W. Caland

১২.

Singapore
17 May, 1902

My dear Sastri,

I have looked at your paraphrase of the Megha Duta and do not think I can offer you any more suggestions than the two mentioned overleaf. I do not understand why you have written it in such colloquial Bengali. Wd. it not be better if written in good yet quite simple language? In fact I found heaps of words that I do not understand. The principle followed in English is that, if a translation to be intended for very general use and suited for all kinds of people, it avoids all doubtful passages; but, if it is meant to give a true idea of the original and must therefore take in all passages, it is written in a higher style not likely to attract general curiosity. I hope the book may provide good classical literature for the public. I am returning the Mss. and the Text in a separate parcel regstd, to the Asiatic Socy.

I am,
Yours sincerely,
F. E. Pargiter

Purva Magha.

On page 29, instead of the words ও ঘরে কি হয় etc (to the end of the paragraph) I think it wd. be better to paraphrase the Sanskrit something like this—

"The young men of that place pay visits to those houses in company with the women of the city. In them

[ফ্রেডরিক্ এডেন পার্জিটার Frederick Eden Pargiter (১৮৫২-১৯২৭), জন্ম ইংল্যাণ্ডে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। আইনশাস্ত্র, রাজস্ব, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও গ্রন্থের লেখক। পার্জিটার-এর মৃত্যু উপলক্ষে হরপ্রসাদ লিখিত শোক-নিবন্ধ জর্নাল অ্যাণ্ড প্রসিডিংস্ অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর ২৪-তম খণ্ডে ১৯২৮) প্রকাশিত হয়।]

Kama keeps continual revelry. The odour-laden breeze around those houses makes known (গন্ধ্যাঢ্য বায়ুতে প্রকাশ হয় ?) that heedless of all restraints (সর্ব্ব নিয়ম.ভুলিয়া ?) they are intent on obeying Kama's calls fully."

On page 31 wd. it not be better simply to compare the two images which Kalidasa presents ?

(I) A woman, hurrying to meet her lover, and stumbling prettily as she hurries ; and in her confusion her tinkling girdle becomes loose and slips down till it discloses her navel.

(II) The river hurrying along over its rocky bed and its water tumbling about, leaving in places deep pools (or whirl-pools), while rows of wild fowl disturbed by the noise of the waves utter plaintive cries.

১৩.

9. 1. 05

Dear Haraprasad Babu

Mr. Ekner has arrived from Austria to get the musical information i.e. regarding the Vedas, that I asked you to get ready for him. He comes with this letter. Please let him know what is ready. The pandits at Benares were not obliging. I hope you can help him here.

Yours sincerely,
F. E. Pargiter

DE GAND.

My dear Professor,

With reference to my letter of the 5th Jan. 1903 I send you the announced copy of the first Chapter of the Commentary of the Nyayabindu. As previously said, my first Manuscript must not be printed (and will be send me back.) down from the end of the Nyayabindu (Mulasutra). I mean, down from the preambule and the metrical portion, beginning as follows:

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ནྱཱ་ཡ་བིནྡུ་ཊཱི་ཀཱ། བོད་སྐད་དུ། རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་[illegible]པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

སྐྱེ་བའི་འདམ་བ་ཀུན་རབ་སྤྱངས་རྒྱ་ཆེར་

[illegible]ནས་ [illegible] རྒྱལ་བ་འདོད་ཆགས་བྲལ

১৪ সংখ্যক চিঠির প্রথম পৃষ্ঠার আলোকচিত্র

১৪.

My dear Professor,

With reference to my letter of the 5th Jan. 1903 I send you the announced copy of the first chapter of the commentary of the Nyayabindu.[৩০] As previously said, my first manuscript *must not be printed* (and will be send me back) down from the end of the Nyayabindu (Mulasutra), I mean, down from the preamble and the metrical portion beginning as follows :[৩১]
and the text actually send must be substituted to the first.

I should like to receive some copies of the first fasciculus of the Bodhicaryavatarapanjika,[৩২] as I did never see it, except of Bendall's.

I send you some lucubration of mine on Buddhist dogmatic, but I fear the French is not very familiar to you. Belive me,

Yours faithfully,
Louis de la Vallee Poussin
13 Bd du Parc, Gand,
Belgium.
...1903

[লুই দ্য লা ভ্যালে পুসাঁ (১৮৬৯-১৯৩৯) বেলজিয়ম-এ জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং গ্রীক ও লাতিন-এর অধ্যাপক ছিলেন। চীনা ও তিব্বতি ভাষায় অনূদিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থের মূল সংস্কৃত রূপ পুনরুদ্ধার তাঁর বিশেষ কীর্তি। হিন্দুদর্শন, হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধদর্শন তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণার বিষয় ছিল। তিনখানি চিঠিই ১৯০৩ খৃস্টাব্দে লেখা, চিঠিতে সঠিক তারিখ নেই।]

৩০. খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের নৈয়ায়িক ও বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি রচিত গ্রন্থ 'ন্যায়বিন্দু'।

৩১. এই চিঠির আলোক-চিত্রে তিব্বতি ভাষায় লেখা অংশ দ্রষ্টব্য।

৩২. শান্তিদেব রচিত, প্রজ্ঞাকরমতি-র টীকা সমন্বিত 'বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা' পুসাঁর সম্পাদনায় খণ্ডশ প্রকাশিত হয় (১৯০১-১৪)।

১৫.

My dear Professor,

I have yesterday received the photographs, excellent indeed. Hope you will be kind enough to send the sames to Th. de Stcherbatskoi,[৩৩] karpovka 20, St. Petersburg, Russia, and to F. W. Thomas,[৩৪] India office Library, London. They will work at it with help of Tibetan. It is a pity that so large a part of the Mss. has been lost.

Yours faithfully,
Louis de la Vallee Poussin
13 Bd du Parc, Gand, Belgium.

ডাকঘরের সিল-এর
তারিখ: ২৪, ৮. ১৯০৩

১৬.

My dear Professor,

I am very grateful to you for the kind sending of photographs and for the letter (22 July 1903). As said before receiving the letter, please send a set of photographs to Th. de Stcherbatskoi, University of St. Petersburg, Russia, who is translating the Nyayabindu, and another to F. W. Thomas, India Office Library.

I have finished copying the ksanabhangas, and will have my copy revised by our friend C. Bendall.

I have here with me the Tibetan text of a ksanabhanga, but not by Ratnakirti[৩৫]. But both texts are very proximate.

The weather is very hot, and it is difficult to make any work—especially, as concerns Tibetan without lexicons.

৩৩ ১৮ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.।
৩৪. ৫৫ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.।
৩৫. অপোহসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক মহাস্থবির রত্নকীর্তি।

When the Tibetan text of the treatise by Ratnakirti shall be found, F. W. Thomas or myself will complete the missing passages.

As concerns the Apoha, I shall be glad to see in proofs your edition. I have also Tibetan Apohas and I have spend too many days in reading kumarila's[৩৬] discussions on this topic.

You will possibly give good help to Prof. Apte[৩৭] (Anandashrama, Poona) who is preparing a new edition of the 'Jaindarshana', with new 'Mss. containing a new chapter, probably, he says, genuine.

I do not doubt that Tantrism is very old ; but I fear that the actual Tantras are modern in Buddhism, it is to say, that they are more modern than the Sutras. I suppose that Tara is very old, but that the identification of Tara with Prajna is or was a scholastic expedient, used when the religion of Tara was acknowledged by the Doctors of the Law.

Yours faithfully,
Louis de la Vallee Poussin
Gand, Belgium

৩৬ মীমাংসা দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা, 'তন্ত্রবার্তিক' প্রভৃতি মীমাংসা গ্রন্থ প্রণেতা কুমারিল ভট্ট।

৩৭. আনন্দাশ্রম (পুনা)-এর সম্পাদক হরিনারায়ণ আপ্তে (১৮৬৪-১৯১৯)। ইনি মারাঠি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেন।

১৭.

Belvedere
Calcutta
July 17, 1903

My dear Sir,

I find that I have not hitherto formally acknowledged the receipt of the Report on the Bodh-Gaya Temple[৩৮] which has been submitted by Mr. Justice Sarada Charan Mitra and yourself after the enquiries made by you at the end of March Last.

Let me do so now : and in doing so allow me to express to you the acknowledgements of Government for the complete, erudite and valuable memorandum which you have prepared. It can not fail to be of use to Government, and will I hope lead to the settlement of a difficult question. In any case it will remain a monument to your learning, assiduity and impartiality.

Believe me to be
Yours truly,
J. A. Bourdillon

[J. A. Bourdillon নভেম্বর ১৯০২ থেকে নভেম্বর ১৯০৩ পর্যন্ত বাঙলার অস্থায়ী গভর্ণর ছিলেন।]

৩৮. ১৯০৩ খৃস্টাব্দে সরকার বোধগয়া মন্দিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন, হরপ্রসাদ এবং সারদাচরণ মিত্র এই কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৮.

My dear sir,

I have examined the two sets of photographs, you have kindly sent me, containing the Ksanabhangasiddhi & the Opohasiddhi[৩৯]. Both of the treatises belong to the authorship of Mahapandita Ratnakirti, are not to be found neither in the Tibetan Danjour[৪০] nor in the Chinese Tripitaka[৪১]. In consequence it is impossible for me to help you in establishing the text. Mr. De La Vallee Poussin has probably supposed that the author of the above mentioned works was Dharmottora[৪২], a translation of his ks.-bh.-s & ap. siddhi being contained in the Danjour.

With my compliments & kind regards,

2 II 04. o. st.
St. Petersburg, Karpovoka 20

Yours truly,
Th. Stcherbatskoi

P. S. Will you kindly allow me to keep the photos or am I to send them back.

[রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্ ফিদর ইপ্পোলিতোভিচ্ শ্চেরবাট্স্কোই (১৮৬৬-১৯৪২) দীর্ঘদিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ (লেনিনগ্রাদ্) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। মহাযান বৌদ্ধমতবাদ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি বিখ্যাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্চেরবাট্স্কোই ভারতে এসেছিলেন। চিঠিখানি ২. ২. ১৯০৪ (পুরানো পঞ্জিকা অনুসারে) তারিখে লেখা।]

৩৯. ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এবং অপোহসিদ্ধি দুখানি বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলা হরফে লিপিকৃত এই দুটি পুথি হরপ্রসাদ আবিষ্কার করেন এবং Descriptive catalogue-এর নবম খণ্ডে বিবরণ প্রকাশ করেন।

৪০. তিব্বতি ভাষায় অনূদিত ভারতীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। যাতে বুদ্ধের বচন আছে সেগুলিকে কেঙ্গুর (কাঞ্জুর) এবং অবশিষ্টগুলিকে তেঙ্গুর (তাঞ্জুর) বলা হয়। তেঙ্গুরের এক অংশে তন্ত্রের পুথির টীকা আছে। Palmyr Cordier ফরাসি ভাষায় *Catalogue Du Fonds Tibetan de la Bibliotheque Nationale* নামে কেঙ্গুর-তেঙ্গুরের তালিকা প্রকাশ করেন। Danjour বলতে এই তালিকা বোঝানো হয়েছে।

৪১ Nanjo Bunyu ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে *Catalogue of the Chinese Translation of Buddhist Tripitaka* সংকলন করেন। এর পরে ১৯১০ সালে Sir Denison Ross C. I. E. কলকাতা থেকে *Alphabetical List of Titles of Works in the Chinese Buddhist Tripitaka* সংকলন করেন।

৪২. বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মোত্তর ন্যায়বিন্দু টীকা-র রচয়িতা। এটি ধর্মকীর্তি রচিত ন্যায়বিন্দু-র টীকা।

১৯.

8, Northmoor Rd.
Oxford
4 February, 1904

My dear Mahamahopadhayaya,

I have latterly been expecting to hear from you by every mail. You will remember that you offered to write a paper on information obtainable from Kalidasa's Raghuvansam etc. I wrote to you, I believe, on the 14th October last, to say that I should be delighted to receive your paper, and endeavour to get it published by the Royal Asiatic Society.

That was just before the Doorga Pooja holidays, and if I remember rightly you wrote that you would easily write your proposed paper within a few days. That is the reason why I have been expecting your paper for sometime. I hope that you received my letter of the 14th October last, and that you may not have been prevented by illness or any other untoward cause from writing your paper. I should be glad to hear from you how the case stands.

With every good wish for the new year. I remain

Yours sincerely,
A. F. Rudolf Hoernle

[চার্চ মিশন সোসাইটির জর্মন মিশনারি রে. হর্নলের পুত্র আউগুস্তুস্ ফ্রীড্রিষ রুডল্ফ্ হর্নলের Augustus Frederich Rudolf Hoernle (১৮৪১-১৯১৮), জন্ম ভারতে। জর্মানিতে শিক্ষা শেষ করে কাশীর জয়নারায়ণ কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ভারতে আসেন, পরে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব ও প্রাচীন পুথি বিষয়ে তাঁর কাজ মূল্যবান। হর্নলের মৃত্যু উপলক্ষে হরপ্রসাদ লিখিত শোক নিবন্ধ জর্নাল অ্যাণ্ড প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর ১৫শ খণ্ডে (১৯১৯) প্রকাশিত হয়।]

২০.

8, Northmoor Rd.
Oxford
17th June, 1904

My dear Mahamahopadhyaya,

May I venture to bespeak your kind offices once more on behalf of the little book on the History of India[৪৩] written by Mr. Stark and myself? I believe it is Mr. Stark's intention to submit it once more this year for selection as a text book for the Entrance Examination.

He will send you a copy as soon as it is out of the press. It is, of course, essentially the same book, but we have utilised the interval to revise, improve and enlarge it. In my part you will find several alterations and additions, one of the latter, referring to the Pallovas, I have made acting on a suggestion of yours.

Mr. Stark has, I believe recast his Moghul period and added a chapter on the material and moral progress of India during the British period.

You were so very kind as to approve of our book in its original form, and exert yourself to secure its adoption. I trust you will agree with me that in it's revised form it still more merits selection by the Calcutta University. May I therefore ask your help once more when the question comes up for selection.

It may interest you that Professor Macdonell of Oxford, Professor Bendall of Cambridge, Mr. Rapson[৪৪] of the British

৪৩. *Histroy of India, Cuttack* 1904

৪৪. Edward James Rapson (১৮৬১-১৯৩৭) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং *Cambridge History of India* (Vol. 1 and 2)-এর সম্পাদক ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

Museum, Professor Pischel[৪৫] of Berlin and others have kindly promised to notice our book in the Athaenaeum[৪৬] and other English and German leading Papers.

I have not heard from you for sometime, but I hope you are prospering. Believe me,

yours sincerely,
A. F. Rudolf Hoernle

২১.

8, Northmoor Rd.
Oxford
29th December, 1904

Dear Mahamahopadhyaya H. P. Shastri,

I am much obliged to you for your letter of the 28th Nov. last, also for the copies from the Vishnu Smriti and its commentary, which arrived by the last mail.

I shall be glad to be informed what I owe you and the pandits who made the copies, for your troubles in the matter. On having it shall be transmitted to you at once.

I am yours,
A. F. Rudolf Hoernle

৪৫. জর্মান মনীষী কার্ল রিচার্ড পিশেল Karl Richard Pischel (১৮৪৯ ১৯০৮)। সংস্কৃত, পালি, বিশেষত প্রাকৃতে বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। যথাক্রমে কীল, হলে ও বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বহু সংস্কৃত পুথি আবিষ্কার করেন ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন।

৪৬. Athaenaeum ইংলণ্ডের প্রভাবশালী সংবাদ পত্র।

২২.

8, Northmoor Road
Oxford
2 June, 1905

Dear Mahamahopadhyaya,

I saw Mr. Pedler a little time ago in London, and heard from him how busy you all were re-organising theCalcutta University. I hear that you have been elected a member of the new History Board,and that the question of appointing a text book on Indian History will soon come on for settlement. I now write to bespeak your kind interest and support on behalf of the History book of Mr. Stark and myself. It has undergone some revision, and I hope you have been supplied with a copy of the revised edition. Perhaps you will remember, that at the time of the first failure you wrote to me to say that there would be more hope of success with the re-organised University. That opportunity has now arrived, and I trust that you will give us your own support.

I know that while you think highly of my portion of the book, you hold a less favourable opinion of Mr. Stark's portion. I now quite understand your position. My portion forms an entirely new departure ; it has no rival in any other history book. Mr. Stark's portion goes over old, well-known ground ; but anyhow to say *the least* it is no worse than any other rival history (for there is none entirely free from all inaccuracies), even if it be not considered an improvement upon them. For my part, I do consider that it is an improvement ; and I am glad to see that my opinion is shared by a Reviewer of our book in the Oxford University Magazine of the 31st May. The review, I believe, was written by Professor Macdonell ; in any case it speaks very highly of the book, and reco-

mmends it to *English* readers. I have sent a copy of the review to our printers in Cuttack, and I hope they will send you a copy for information.

There has been also a favourable review in the Journal of the Royal Asiatic Society of England. And I am told that The Indian Antiquary will also publish a favourable notion.

So, altogether, considering that my portion has no rival, and that Mr. Stark's portion is (at least) no worse than any other rival, I think I may fairly claim that our book is the best History of India in the field at the present time, and quite worth your support before the new History Board.

I dare say you know that it has been already adopted in the Madras Presidency, by most (if not by all) schools and colleges. Here in England, it has been recommended to the Civil Service Probationers by their tutors in Oxford and Cambridge, and the idea has been suggested of its being appointed for the Indian History Prize Eassy in the Public Schools. The Calcutta University, you see, will be in good company, if it adopts our book for its schools and colleges.

I have just heard that Mr. R. D. Bhandarkar has been appointed to officiate for Dr. Bloch. This is good news. I suppose you know him. He is an able man, and his researches on Indian History have all my sympathy. Your presence in Calcutta and his, together raise great expectations in us all for the advancement on Indian Research.

With every good wish for your labours.

I remain
Yours sincerely,
A. F. Rudolf Hoernle

২৩.

8, Northmoor Road
Oxford
2 July, 1907

My dear Mahamahopadhyaya,

Allow me to thank you for your most kind and appreciative letter which I received by the last mail. I thank you especially for the promise of your support of the little History book. Your opinion of the book, I am sure must carry great weight with the committee and the Senate, especially among the members from your own countrymen. I have had also some other kind and appreciative letters from Dr. K. S. Macdonald, Dr. Morrison, Dr. Percival[৪৭] and others, either direct or through Mr. Stark, so that I have every hope that you will not stand alone on supporting our History book.

I will gladly answer your questions.

(1) You say that "Prof. Macdonell gave up the Yashodharman Vikramaditya theory because he could not find the surname Vikramaditya ever given to Yashodharman." This appears to me a misunderstanding. I presume you refer to P. 323 of Prof. Macdonell's *Sanskrit literature.* But if you read it again, you will notice that he is speaking of Ferguson's theory, adopted by Max Muller. That theory had nothing to do with the identity of Yashodharman and Vikrama, because *at that time* nothing was known about the existence of Yashodharman. The case stands thus: Ferguson ascribed the expulsion of the Scythians to Vikrama, Macdonell objects that Yashodharman expelled them, as shown by the inscription. I *myself* now maintain that this is no objection, because Yashodharman and Vikrama are the same person. My theory is quite new ; it has never been published ;

---

৪৭. H. M. Percival (১৮৫৫-১৯৩১) কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

Macdonell has never heard of it, and therefore he has never expressed himself against it; on the contrary, I am confident that when he reads my proofs, he will agree. I must explain these proofs in a short letter; they are published in the July Number (1903) of the Journal of the Royal Asiatic Society; and I must ask you to kindly read them *there*. I believe the Journal is kept by the Bengal Asiatic Society; but in any case I will send you one of my extra-copies, as soon as I receive them. Please remember that I only maintain the identity of Yashodharman and Vikramaditya. But I do not hold the other portion of Ferguson's theory that Vikramaditya founded the Era. That Era is much older, it was the national Malava Era; I only hold that the Era *changed its name*, in honour of Vikramaditya's great victory.

(2) As to Yajna Sena, Vaidarbha was a portion of the Andhra Viceroyalty, since the time of Ashoka. Vaidarbha was the border province with respect to Agnimitra's Viceroyalty. Hence Yajna Sena is called king of Vaidarbha. His dominions were divided by the river Urash between him and Madhabasena.

(3) The Political History in the Grundriss[৪৮] has not yet been published. I believe Mr. Fleet is charged with it, and so, I suppose, it will be written in English.

(4) As to Minayiff's[৪৯] Maha Vyatyalli, I received my copy, I believe as a present. I will make enquiries, and try to have a copy for you.

(5) As to the Pallavas and Kanohi, I am afraid, the

৪৮. *Grundriss Der Indo-Arischen Philologie Und Altertumskunde* (Encyclopedia of Indo-Aryan Research).

৪৯. Ivan Pavolovich Minaev (১৮৪০-১৮৯০) বিখ্যাত রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্। বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধসাহিত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মিনায়েফ্ পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৭৪, ১৮৮০ এবং ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তিনি তিনবার ভারতবর্ষে আসেন।

space which was allowed to me was so limited that I could not treat Southern India as fully as I should have liked to have done. Perhaps in a future edition, or in a Text book for the F. A. or B. A. I may be able to go fuller into the whole subject.

(6) It is very interesting to know from you that, "The Indians knew that the Southern dialects of Telugu and Goon[৫০] were not of Sanskrit origin." You say that you "got it in an old work." What old work? Would you kindly quote the passages and what dialect do you mean by Goon?

(7) I shall be most happy to answer any question that you would like to put to me, *so far as I am able.* But I lay no claim to omniscience! In fact, I am learning a good deal from your own researches, which I always follow with the greatest interest, as you will have seen from my last letter, in which I asked you for more information about your readings of the Ashoka-inscription in the Jogimara cave. I only wish I could have more of the results of your researches.

I congratulate you on your purchase of a house in Calcutta. It must be a great comfort to you to be able to live close to your work. I often regret that I have no more any opportunity to see and meet you, and talk over with your points on Indian History and Antiquity which interest both of us. Perhaps if I should succeed in the appointment of my History Book, I may have the means to revisit India, and meet you once more.

Believe me,

Yours very sincerely,
A. F. Rudolf Hoernle

৫০. 'গোণ্ড' নামক উপভাষা এক সময়ে দ্রাবিড় ভাষাভাষী অঞ্চলের উত্তর-পূর্বাংশে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে এখানে সম্ভবত এই উপভাষার কথাই বলা হয়েছে।

২৪.

Inscriptionum Indicarum[৫১] Vol I, Plate XV, p. 105.

I take it that you read the Sitabanjira Inscription as follows :

अदीपयन्ति हृदयं सदं-वगर- कवयो
adipayanti hridayam sadam-Vagara -Kavayo
एतत्त्रयं दूरे वसंत्याः
etat-trayam dure vasantyah.

This seems plain enough ; but there is one difficulty. You read dule as dure, i.e., $l=r$. If so, the inscription is in Magadhi ; and in that case, we should expect the facsimile tohave षड *Shadam*, वषंतिया Vashamtiya, also वगल Vagala.

The rest of your translation I can not make out from the facsimile.

As to your translation of Jogimara inscription I have great difficulty in following it :

You seem to read : *Su-tanuka namah* "Salutation to Su-tanuka" and you seem to take it to refer to a *male* person, for you say "*he* is in much quest at Benaras". Now, *su-tanuka* should be inflected : *Su-tanukassa namo* (or if it is feminine, *su-tanukaya)*. I doubt whether *namah* (Pali-*namo*) could form a compound. Further : Cunningham has *devadashinyi*. This does not mean "who *shows* us the Gods", but "who *sees* the God." Moreover : *dashinyi* does not agree with *Su-tanuka*. Sanskrit (*deva-*) *darshin* would be in Pali (genetive) masculine *dashshino* or *dashshishsha*. In Pali (genetive) *feminine* it would be *dashshiniya* or *dashshinya*. Of course, Cunningham's *dashinyi* might be a false reading for *dashinya*. But if you take it as feminine,

[সম্পূর্ণ চিঠিটি আমরা পাইনি। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে খণ্ডিত অংশটুকুই প্রকাশ করা হ'ল।]

৫১. E. Hultzsoh, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. I, Oxford 1825

you must also take *Su-tanuka* as feminine, that is to say, you ought to have *su-tanukaya*.

Of course there may be an explanation for all these difficulties. It is for this reason, that I should like to know how you read the original facsimile and how you transcribe it into Pali, as well as into Sanskrit.

As I have said, if your translation and reading is correct, you have made a most interesting discovery, which I should like to bring to general notice.

By the way : you translate "at Varanasi." I suppose this is based on Cunningham's reading (on p. 105) *balanasheye* that you will observe that his reading does not agree with his own facsimile which is as follows

balunashshye.

ba lu na she ye

Believe me
Yours sincerely,
A. F. Rudolf Hoernle

২৫.

Carlton Club
Pall Mall
London S. W.
June 24, 1904.

Dear Mahamahopadhyay,

As an old friend, may I ask you to do me the favour to propose the re-adoption of my little *History of India*[৫২] as

[স্যার রোপার লেথ্ব্রিজ (১৮৪০-১৯১৯) ১৮৬৮-৭৬ খৃস্টাব্দ অবধি বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন, ১৮৭৭-এ প্রেস কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৭১-৭৮ পর্যন্ত 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

৫২. সম্ভবত Sir Roper Lethbridge & Pope Rev. G. U. রচিত "*A History of India for Schools*" (প্রথম সংস্করণ 1872)। "*A short Manual of the History of India* (1881) নামে লেথব্রিজ এর আর একখানি বই ছিল।

the authorised textbook for the Entrance Examination of the Calcutta University. H. E. the Viceroy has kindly expressed an interest in it, and I know that many of the masters and Professors who teach Indian History in our Entrance Classes prefer to teach it from my book rather than from any others. I shall esteem it a great favour if you will be so good as to use your great influence to obtain its re-adoption. With kind regards, Believe me,

Yours very sincerely,
Roper Lethbridge,

২৬.

My dear Pandit,

The full marks in the M. A. papers are 100.

The edition of the Vikramorvasi used here is the one published in the Bombay Sanskrit Series.

Do you require a statement of the text books for 1905, or copies of them ? If the latter, you should apply to the Registrar, but I doubt whether he will supply *books.*

I am well, and trust you are the same.

Allahabad
9. 8. 04

Yours sincerely,
G. Thibaut

[জর্জ ফ্রেডরিখ্ উইলিয়ম থিবো (১৮৪৮-১৯১৪) জর্মান ভারতবিদ্যাবিদ্। বারাণসী সংস্কৃত কলেজে ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেন এবং পরে এলাহাবাদের মুর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৮৮-১৯০৬) ও কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক (১৯১৩-১৪) ছিলেন। ইনি হিন্দু দর্শন, জ্যোতিষ ও গণিতে গবেষণার জন্য খ্যাত।]

২৭.

26, Wooluberia
Ballygange
5th Feb. 05

To

M. M. H. P. Shastri, M. A.

Dear Mahashaya,

I am very happy to inform you that I have found out the exact date of the Chinese translation of 'সাংখ্য কারিকা'[৫৩] was made. It was translated by Paramartha in A. D. 557-569.

This translation contains, Isvara krishna's text (সাংখ্য কারিকা) as well as a commentary on it. But this commentary is so strange to say that was done by Gaudapada[৫৪]. Gaudapada—whose time was supposed to be about 8th or end of the 9th century. So it might not able to be translated by a man of 6th century. Therefore we come to this conclusion that the commentary which is translated into Chinese is not that of Gaudapada's but must be of somebody else, which is lost in India. Some says that the commentary which is translated into Chinese is that of Vasubandhu's[৫৫] but this is also doubtful.

With best regards
Yours most of pupil
K. Ohmiya

[কে. ওমিয়া অল্প বয়সে ছাত্র হিশাবে হরপ্রসাদের কাছে আসেন এবং হরপ্রসাদের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। পরে ইনি শিক্ষকতার কাজ পেয়ে জাপানে প্রত্যাবর্তন করেন। এঁর জীবনপঞ্জী আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।]

৫৩. খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লেখক ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত গ্রন্থ।

৫৪. প্রাচীন অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য, শংকরাচার্যের 'পরমগুরু'।

৫৫. পুরুষপুরের ব্রাহ্মণ সন্তান বসুবন্ধু. খৃস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা 'যোগাচার' এঁর দ্বারা পরিপুষ্ট হয়।

২৮.

The Madrasah
Wellesley Square,
Calcutta.
July 22, 1905.

My dear Mahamahopadhyaya,

I am very sorry to say that as I am just starting for a week's leave (Darjeeling) I am unable to appoint a time to see you at present. With regard to the Victoria Memorial, I don't think any Sanskrit Ms. would be suitable. But if you have any interesting original documents in your office connected with the encouragement on the part of Government of Sanskrit Studies they would be suitable.

The other subject you mention I shall be glad to have an early opportunity of discussing with you on my return.

Yours sincerely,
Denison Ross

[ডেনিসন রস (১৮৭১-১৯৪০) কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (১৯০১-১১), ভারত সরকারের মহাফেজখানার অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের সহসম্পাদক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরে স্বদেশে ফিরে গিয়ে কিছুদিন বৃটিশ মিউজিয়াম-এ কাজ করেন (১৯১১-১৪) এবং স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। রস ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, আরবি এবং তিব্বতি জানতেন। পাটনা খুদাবক্স লাইব্রেরির আরবি ও ফারসি পুথির বিবরণাত্মক পঞ্জী তাঁর অন্যতম কীর্তি।]

২৯.

Bonn
6th Oct. 1905

My dear Sir,

I received your kind lines of 13th last and thank you very much for all the trouble you take with the proofs of the उपमितिभवप्रपञ्चाकथा[৫৬] (sic) as well as the समराइच्चकहा.[৫৭] The corrections in the letter, especially in the notes, are rather numerous because I got two new Mss. since I sent the first part of my Manuscript for the press (70 pages). But I trust that afterwards they will be few ; for these I have no more occasion for material alterations caused by those new Mss.

For the great number of corrections in the उपमिति I am not to blame ; for I have not written the Manuscript, but had to take over Peterson's[৫৮] Manuscript written rather slovenly by his Pandit. I have corrected it throughout ; but the Pandit's handwriting seems to cause many difficulties to the Printer.

The षड्दर्शनसमुच्च[৫৯] is an interesting work, and the edition is very good. D-Luigi Luali a pupil of mine, has done his work very well. He is a very clever & zealous scholar who deserves acknowledgement and encouragement.

[জর্মান ভারততত্ত্ববিদ হারমান গেয়র্গ য়াকোবি Herman Georg Jacobi (১৮৫০-১৯৩৭)-র চিঠি। মুনস্টার, কীল ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক য়াকোবি সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ভাষায় এবং জৈনধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।]

৫৬. 'উপমিতিভবপ্রপঞ্চাকহা' একখানি জৈন নীতিকথা। লেখক সিদ্ধর্ষি, জীবৎকাল সপ্তম শতাব্দী।

৫৭, 'সমরাইচ্চকহা' প্রখ্যাত জৈন গ্রন্থকার হরিভদ্র সূরী রচিত নীতিকথা মূলক গ্রন্থ। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে য়াকোবি এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

৫৮. পীটার পীটারসন (১৮৪৬-১৮৯৯) বোম্বাই-এ এলফিনস্টোন কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

৫৯. 'ষড়দর্শনসমুচ্চ' ষড়দর্শনের উপরে রচিত হরিভদ্র সূরীর গ্রন্থ।

It would be of great interest if you could find again the description of the six systems you came across in a Buddhist Sanscrit metrical work. For such descriptions by outsiders are very suggestive and help us to understand the position of the different schools in the literary world.

With kind regards
I am,
Yours truly
H. Jacobi

৩০.

9... ..05
Wellington College
Berks

Dear Sir,

Mr. Macfarlane of the Oriental Library here, told me I might mention his name in writing to you.

I am studying Indian music and there are one or two points on which I should be glad of your assistance.

(1) The Saman chants.

Have you got a copy with the notation marked ? Have you got A. C. Burnell's Arshayabrahmana[৬০] 1876 ? Could you help me to get hold of a Samavedin who could chant them for me, and if he is found, might he come to the library and chant while I looked on the copy ? I know no Sanskrit, and have you therefore a clerk who could transliterate for use one or two short selected passages ?

[আর্থার হেনরি ফক্স স্ট্র্যাঙ্গোয়েজ (১৮৫৯-১৯৪৮) ১৯১১ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত 'দি টাইমস্' পত্রিকার এবং ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত অব্জারভার পত্রিকার সংগীত সমালোচক ছিলেন। *Music of Hindostan, Music observed* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। চিঠির উপরে ঠিকানা কেটে দেওয়া রয়েছে, অন্যকোনো ঠিকানা থেকে লিখেছিলেন মনে হয়।]

৬০. আর্থার কোক বুরনেল Arthur Coke Burnell, (১৮৪০-৮২) ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। ১৮৭৬ এ সায়ণভাষ্য সমেত আর্ষেয়ব্রাহ্মণ সম্পাদনা করেন।

(2) Dates of Sanskrit musical works—Viz.
Mandukishita.
Naradashita.
Bharata's Natyasastra.
Sangita Ratnakara (1210 A. D.).
Sangita Darpana.
Raga vibadha (A. D. 1010).
Sangita Narayana.
Sangita Parijata.
Sangita Taranga.
Sangita Sara Sangraha.

Two of them I know, and the others I have put in what suppose approximately to be their order. The first three are of course the most important, and probably impossible to do more than guess at.

(3) Could I have an English-speaking pandit at my disposal for a few hours, who would undertake some translation work if necessary, (as a matter of business, of course).

I hope I am not presuming in asking so much. I have a very little time here only till the evening of the 13th.···

Yours faithfully
A. H. Fox Strangeways

P.S. My boy waits for an answer ; but if you are not at leisure just now perhaps you could let me have a line by to night's post.

৩১.

1, Carton House Terrace, S. W.
January 5. 1910.

My Dear Sir,
I have heard from Oxford of the invaluable part that you have played in arranging for the purchase, the cataloguing and the despatch to England of the wonderful collection of Sanskrit Mss. [৬১] which Maharaja Sri Chandra Samshere of Nepal has so generously presented to the Bodleian Library and I should like both as a former Viceroy and as Chancellor of the University to send you a most sincere line of thanks for the great service which your erudition, goodwill and indefatigable exertions have enabled you to render to us.

With best of wishes for the new year and with the hope that scholars like yourself may never be wanting in India.

I am yours faithfully,
Curzon of Kedleston

[জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন Georgo Nathaniel Curzon, (১৮৫৯-১৯২৫), ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ অবধি ভারতের বড়লাট ছিলেন। জর্ণাল অ্যাণ্ড প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর ২২ খণ্ডে (১৯২৬) কার্জন-এর মৃত্যু উপলক্ষে হরপ্রসাদ শোক নিবন্ধ লেখেন।]

৬১. হরপ্রসাদ কাশীতে ৭,০০০ দুর্লভ পুথির সন্ধান পান। ম্যাকডোনেল (৪৪ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.) ভারতভ্রমণে এসে এই আবিষ্কারের কথা শোনেন এবং তাঁর অনুরোধে কার্জন নেপাল রাজের অর্থানুকূল্যে এই সংগ্রহ কিনে অক্সফোর্ডে আনাবার ব্যবস্থা করেন। হরপ্রসাদ এই বিরাট সংগ্রহের তালিকা তৈরি করে দেন।

৩২.

Villa Vaikuntha
Bestum-Kristiania
21.8.14

Dear Mr. Haraprasad Sastri,

Many thanks for your two papers which reached me safely yesterday owing to the fact they had been directed via Gibraltar. If they had been sent in the usual way, they would have been kept back in Germany. I am not able [to] say when it will [be] possible to print your.... This unhappy war has unsettled everything.

Yours sincerely,
Sten Konow

৩৩.

On Tour
January 15. '15

My dear Shastri,

Many thanks for your letter of the 13th, just received. I am wandering about at present in a green boat within 3 miles from Rampal & cannot check the references you so kindly give me; but from a study of the Dacca District Map I fear I cannot quite follow you in the identification of Rampal with Ramavati[৬২]. As far as we know, until recent times, the Teesta itself came down to somewhere near the present Goalundo, so there is no chance

[স্টেন কনো (১৮৬৭-১৯৪৮) নরওয়ের মানুষ। ছাত্র জীবনে গ্রীক, লাতিন, জর্মান এবং নর্স তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল। জর্মান পণ্ডিত পিশেল-এর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কনো বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হার্ভার্ড-এ সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক (১৯০০), গ্রিয়ারসন-এর 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'-র সহকারী (১৯০৩), ওস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯১০) এবং বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক (১৯২৪-২৫)।]

৬২. 'রামাচরিত অনুসারে রামপাল-এর রাজধানী রামাবতী এবং 'বল্লাল চরিত' অনুসারে বল্লাল সেন-এর রাজধানী রামপাল।

of the Karatoya having an exit further to the east. All I think I said when we met at the Asiatic Society's room was that the Ganges formerly flowed past Dacca. But before getting to Dacca, it must necessarily have been joined by the Karatoya, presumably somewhere near Goalundo or slightly to the east. I believe the Varendra Research Society are discussing the point in their proposed new edition of Rama Charita[৬৩].

You probably heard that I invaded the room of the Bangiya Sahitya Parishad a month or two ago to see the coin of Danujmarddan that Rakhal Babu[৬৪] alleged in the 'Pravasi' was minted in Chandradwip. I think I convinced Nagendra Babu[৬৫] & others present that the mint name did not begin with Chandra but with the syllable চা. You may be interested to know that I have since found a coin of the king in which the mint is clearly চাটিগ্রামাৎ

Yours sincerely,
T. K. Stapleton

৩৪.

The Nichirenshu Office
No 15 Nihonenoki, Shiba, Tokyo, Japan.
Feb. 8th, 1917.

Mahamahapadhyaya
Haraprasad Shastri C.I.E
Dear Sir,

It is always with the feeling of deep gratitude that I think of your kindness poured upon Rev. Mr. R. Kimura, the fearer, that enabled him to pursue his studies in your country for three long years, we are now sending him

৬৩. এই গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের প্রবন্ধের ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্র.।
৬৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবৎকাল ১৮৮৫-১৯৩০।
৬৫. নগেন্দ্রনাথ বসু, জীবৎকাল ১৮৬৬-১৯৩৮।

again to India to let him make researches on philosophy, history, Buddhism and at the same time study the Sanskrit. We shall feel ourselves under further obligation to you, should you be so kind as to extend to him your kind help and protection while he is with you.

Very sincerely yours

Kanko Sano
Chief of the Educational
Department of Nichirenshu

৩৫.

Rumleigh,
Bere Alston
Devon
27th July, 1920

My dear Haraprasad,

Your letter reached me more than a month ago with the copy of your Presidential Address before the Bengal Asiatic Society. I ought to have answered it sooner, but I find that in these days laziness counts for a good deal among the motives of action or inaction. Also though the ladies of my family are inclined to shy at and to stumble over the unfamiliar names and subjects with which you deal, I have had the address read over to me thrice within the intervening time, and with increased interest and delight, at each perusal. Yours is certainly one of the most profound and illuminating addresses that the society has been privileged to listen to ; and I

[স্যার আল্‌ফ্রেড উডলে ক্রফ্‌ট Sir Alfred Woodley Croft (১৮৪১-১৯২৫) দর্শনের অধ্যাপক রূপে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন এবং পরে ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাক্‌শন পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৮৯৩-১৮৯৬) ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৮৯১-১৮৯২) ছিলেন। ক্রফ্‌ট-এর মৃত্যু উপলক্ষে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটিতে শোক-নিবন্ধ পাঠ করেন (১ মার্চ ১৯২৬)।]

wish I could think that there existed such means of intercommunication between the world of living men, and the world of those who have passed beyond, that our dear departed friend Hoernle should have been able to listen to, or to become in some way acquainted with the masterly *resume* that you give of all that has been done since 1898, in the work in which he delighted and took an active part.

Of course your address covers a wider field than his, and all that lies outside the common boundary, is of surpassing interest, and would have given Dr. Hoernle the keenest delight. I refer to those interesting sections of your address, in which you deal with the migrations of peoples, the discovery in Bengal of what may be called a widespread body of underground Buddhism, the intercourse of earlier Bengal scholars with Tibet, and other matters which in the last century were hardly thought of but which are brought into full light in the vivid pages of your address.

Of myself I have little to say. My life pursues its quiet contended course and my health continues to be quite good. I enjoy the occasional visits of old friends, and the garden is always a delight to me, and would be an even greater delight if the weather of this summer had been more favourable. But it has been unusually inclement —never very warm, and generally wet and windy. I look for a fine August and September, and if these remaining months come up to my expectations they will make up for the disappointments of the earlier summaer.

Good-bye my dear friend ; it is always a pleasure to hear from you.

Believe me yours sincerely,

A. Croft

৩৬

Rumleigh,
Bere Alston
Devon.
7th May, 1924

My dear Haraprasad,

I have been deeply interested in the book and the paper that you so kindly sent me with your letter of March 29. As you say there has been a long interval of silence between us and I have often thought of you and wondered how you were getting on. And now the answer has come full and complete. I have dipped into the pages of your book and have been greatly impressed by the learning and research which it manifests over the wide field of early Aryan migrations to India. You have made the subject peculiarly your own and will, I am confident, be recognised as the standard authority on the abstruse and yet fascinating topic treated with so much erudition and clearness. My own acquaintance with the subject is of course so elementary that I can only touch its fringes, but your treatment of it is so luminous and clear that I can follow the general argument and recognise how valuable an addition you have made to our knowledge of that remote period. The men in fact *live* in your pages and that is the way that history should be written, if in its turn it also desires to live. I hope I have conveyed to you some sense of my admiration for your work and of my gratitude to you for so valuable a gift.

I am very glad to know that in all these studies and researches you are keeping good health, and I too have nothing to complain of. I am quite as well as any one can hope to be at my age of 83. I have no organic ailment,

and but for my eyesight which does not in any way improve and such muscular weakness as always accompanies old age I am in perfectly sound heath. I have a pleasant garden to walk in and here I spend many happy hours when the sun is bright enough to enable me to sit in comfort.

I am much interested and to some extent concerned in the recent political development in Bengal and in India. But changes of this magnitude can not take place without some disturbance of political equilibrium and I am ready to hope that things may finally turn out well. But I see how disturbing these changes must be to old and quiet stagers like yourself and I do not wonder that they confirm you in your increased attention to learning and literature which is all to the advantage of India and the world.

I can hardly by the way, realise your anticipation of a possible Naihati University.

With every feeling of friendship and good-will Iam,

most sincerely yours

A. Croft

৩৭.

Snelsmore House
Nr. Newbury
10. 6. 24

My dear Mahamahopadhyaya ;

I am much obliged to you for sending me a copy of your book on "Magadhan Literature"৬৬. I have read it

* [লরেন্স জন লুমলে ডানডাস রোনাল্ডসে, পরে মার্কুইস অব জেট্‌ল্যাণ্ড, দ্বিতীয় (১৮৭৬-?) ১৯১৭ থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলার গভর্নর এবং ১৯২৮ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।]

৬৬. ১৯২০-২১ খৃস্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হরপ্রসাদ ছয়টি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এগুলি ১৯২৩-এ *Magadhan Literature* নামে প্রকাশিত হয়।

with much interest, and in particular the chapter on the Arthashastra of Kautilya. I have never come across a copy of the whole work ; but it must be a veritable Encyclopedia of information on India as it was in the days of the Mauryan Empire, and before it.

I was extremely interested in your letter of March the 6th in which you give an explanation of certain aspects of Indian art which have puzzled—and have, indeed, been a stumbling-block to many Western critics. It is still not quite clear to me, however, why obscene subjects should have been chosen to represent Sunya ?

I have been distressed to hear that certain young men in Bengal have been taking to violent political crime again. I do hope that this unfortunate movement will not spread. What good can come of it ?

I trust that this will find you in good health.

With kind regards
Yours sincerely
Ronaldshay

৩৮.

17. 4. 26

My dear Mahamahopadhaya,

It is most kind of you to have sent me the new volume of the Catalogue of Sanskrit Manuscripts, which with its preface in English is a most interesting publication. You are greatly to be congratulated on this best monument to your scholarship and industry. I have also received with much pleasure your translation into English of Vidyapati's Kirtilata[৬৭]. The recovery of such work provides valuable

৬৭. ১৯২৫ খৃস্টাব্দে হরপ্রসাদের সম্পাদনায়, 'মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত/কীর্ত্তিলতা/বাঙলা ও ইংরাজী-অনুবাদ সমেত' প্রকাশিত হয়। অনুবাদ দুটি হরপ্রসাদের।

material for the historian. Last, but not least, I am indebted to you for your most interesting letter on the subject of Buddhist Art. Your division of the subject into 4 periods is ingenious. It is interesting to find testimony to the prominence of Bengal in painting and sculpture in the Tibetan work which you quote. I have no doubt that the research work of the Varendra Research Society[৬৮] is adding substantial testimony to this view.

Thanking you once again for your kindness and wishing you continued health and success.

Believe me yours sincerely,
Ronaldshay

৩৯.

Telephone :
No. 22, Richmond.

Aske, Richmond
Yorkshire.
10. 4. 29

My Dear Mahamohopadhaya,

I have received with much pleasure your letter of March the 17th. and I am most grateful to you for sending me a copy of Vol. V of the catalogue of Sanskrit Mss. in the Asiatic Society of Bengal. The volume has reached me this morning, and I hasten to congratulate you on the completion of a volume which must indeed represent an immense amount of erudite labour, and must be of the utmost permanent value to scholars for all time. The Preface should prove of the greatest interest.

---

৬৮. বাঙলা দেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ১৯১০ খৃস্টাব্দে রাজসাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

I have recently had the misfortune to lose my Father; and have recently therefore changed my title from Ronaldshay to Zetland.

I hope that this will find you in good health, and still in enjoyment of the task upon which you have now been so long engaged.

With my renewed thanks and congratulations,

Yours sincerely,
Zetland

৪০.

Telephone : } Newbury 238
Telegrams : }

Snelsmore House
Nr. Newbury
9. 8. 31

My Dear Mahamohopadhyaya,

I have received with great pleasure the 6th. Volume of your Catalogue and I hasten both to thank you for your kindness in sending it to me, and to congratulate you on the completion of so scholarly a volume. I am so glad that your ideas about the prefaces of the volumes have expanded, since they add enormously to the value of the catalogue. I shall look forward with the greatest interest to the volume on Sanskrit Philosophy on which you hope soon to be at work.

Trusting that this will find you, as it leaves me, in good health, and with my warm regards,

Yours sincerely,
Zetland

৪৯.

Telephone
43 : Camberley

Rathfarnham
Camberley
Surrey

March 18th, 1926

My dear Mahamahopadhyaya,

I have lately been reading your edition of the Kirtilata with great pleasure. It came when I was ill, and for a long time I have been unable to do any reading or writing, but am better now. I have found it most interesting and congratulate you on so successfully editing this most important work.

I have myself got a copy of the Nepal Mss. and find that in the Prakrit portions my copyist invariably represents an original Sanskrit ksh क्ष by skh (स्ख), where you write kh kh (ख् ख्). Thus he writes कस्खन्, where you give कख्ख्न्. I wonder if he has any authority for this, for it is an interesting point. According to Rama Tarkavagisa's Prakrit Grammar,[৬৯] in Magadhi Prakrit, Sanskrit क्ष becomes स्ख,, so that the copyist appears to have retained the old Magadhi custom.

[স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১) ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এ যোগ দিয়ে ১৮৭৩ সালে ভারতে আসেন এবং ১৯০৩ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি ভারতীয় ভাষা ও উপভাষা সমূহের তথ্য সংগ্রহ এবং তুলনামূলক চর্চার ক্ষেত্রে বিপুল গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ২০ খণ্ডে প্রকাশিত লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। আঞ্চলিক ভাষার প্রাচীন সাহিত্য, লোককথা, সমাজবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়েও তিনি মূল্যবান কাজ করেন।]

৬৯. রাম তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য রচিত 'প্রাকৃত কল্পতরু'। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় ইংরেজি অনুবাদ সহ এই গ্রন্থের সটীক সংস্করণ বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা-র ২৭৮ সংখ্যক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়।

I hope that you are well and flourishing. I have not heard news of you for a long time, and delight to hear about old friends .

Yours very sincerely,
George A. Grierson

৪২.

Rathfarnham
Camberley
Surrey
March 27th,/29.

Telephone
43, Camberley

My dear Mahamahopadhyaya,

I have been confined to bed by illness for some weeks, or I should before this have written to thank you for acting as my proxy in receiving the Sir William Jones Medal and in the meantime I have received your very welcome letter of March 7th. You will, I am sure, understand how much I regret the delay that has occurred in thanking you, and will also forgive a short letter, for I am not yet able to write much, having only come downstairs for the first time today.

I owe you special thanks for your kindness in appearing after your serious accident, of which, of course I was unaware when I mentioned your name to Mr. Van Manen[১০]. I do hope that your appearance did not in any way interfere with your recovery, and that you will soon be quite able to get about again in your old way. The Medal arrived a week or two ago, and was shown to me by Lady Grierson. It was a pleasant thought to us both that it had passed through your hands, for I think that you must now

১০. Johan Van Manen এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক (১৯২১-১৯৩৬) ছিলেন।

be the oldest friend that we have remaining in India. How many years it is since I first met you with Professor Bendall[৭১] on his visit to Nepal !

Thanks also for the copy of your beautiful catalogue of the Purana MSS. in the Library of the A. S. B. You will understand that I have not yet been able to read it. That pleasure must be postponed till I am stronger, but I have not been able to resist dipping into the Introduction for a few minutes, and enjoying the clearness and learning you have shown in the account of the Ramayana.

Your edition and translation of the Kirtilata have been a source of great interest to me. Some day I hope to make a thorough study of its language. For this your edition will be invaluable. Thanks also for the Lahore address[৭২]. Like everything you do, it is laden with ripe fruit.

About the sheets of Rajendra Lala Mitra's edition of the Prakrita pada of the Samkshipta-sara, I am sorry to say that I cannot now remember the exact facts. So far as I can remember, its publication was discontinued because what was printed was found to contain some serious errors. You will probably find some decision regarding it in the old minutes of the Council. If you examine the printed sheets you will no doubt see that they contain many mistakes.

Now I must stop. I have already written too much. Again thanking you for your kindness about the Medal, and with many old memories,

Believe me,
Yours very sincerely,
George A. Grierson

৭১. ৫ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.

৭২. *'Sanskrit Culture in Modern India'*, Presidential Address, 5th Oriental Conference, Lahore (1928).

৪৩.

Rathfarnham
Camberley
Surrey
July 10th / 29

My dear Mahamahopadhyaya,

Your letter No 137 / 36 of the 17th June was indeed a most pleasant surprise to me. I hasten to thank the Bangiya Sahitya Parishad for the honour it has done me in electing me an Honorary Member, and you for the extremely kind language in which you conveyed to me the news. It is needless to say that I accept the honour with gratitude, coming as it does from the Society which has done so much to throw light on the literary history of the Province with which I was long associated.

The honour is the more pleasing to me, because the news was conveyed to me by one of my eldest friends in India, from whose conversation and writings I have profited more than perhaps you are aware. Your letter recalls to me old memories, beginning from the time when I first met you in Calcutta and afterwards in Bankipur, with Professor Bendall.

Yours Sincerely,
George A. Grierson

৪৪.

Telephone :
Oxford 854

20, Bardwell Road
Oxford
Nov. 4, 1926.

Dear Mahamahopadhyaya,

Allow me to introduce you a Japanese Buddhist pupil of mine, Mr. S. Miyamoto[১৩]. He is going to travel, after visiting Ceylon, for a few months through India.

I shall be much obliged if you will put him in the way of benefiting as much as possible from what he can see in Bengal as illustrating Buddhism.

I hope you may be in Calcutta at the time he will be there.

Trusting you are in good health

Yours sincerely
Arthur A. Macdonnel.

[বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত আর্থার অ্যান্টনি ম্যাক্‌ডোনেল-এর (১৮৫৪-১৯৩০) জন্ম বিহারে, মজঃফরপুরে, ইনি অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বোডেন-অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৭ এবং ১৯২২-২৩ সালে দুবার ভারতে আসেন। প্রথম বারে তিনি উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। এই সময়েই হরপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। হরপ্রসাদ তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন।

১৩. '*Mahayana and Hynayana*' ও '*Outlines of Buddhism*' গ্রন্থের লেখক মিয়ামোতো শো সোন (১৮৯৩-?) তোকিয়ো ও অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়ন করেন। ইনি তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন।

৪৫.

India Office Library
Whitehall , S. W. I.
November 8, 1926

My dear Professor Haraprasad,

May I, with thoughts of old kindness, introduce to you my friend Mr. S. Miyamoto[৭৪], Japanse scholar of Buddhism with whom you will have many interests in common. No doubt he has read most of the many Sanskrit Buddhist texts discovered by you. He hopes to visit Nepal, and in case he obtains permission, your advice & recommendations to him would be of the greatest value.

I am, as you know, unfortunately, a bad correspondent. But I hear of you from time to time, when I inquire of friends from Calcutta. I hope that you found your Dacca experience interesting, had worthy pupils there.

With all good wishes for your health,

Yours sincerely,
F. W. Thomas

৪৬.

December 30, 1928
161 Woodstock Road,
Oxford.

My dear Mahamahopadhyaya,

At the end of the year I am sending you my best wishes for 1929. I hope that you and your family are still as

[ফ্রেডরিক উইলিয়ম টমাস (১৮৬৭-১৯৫৬)-এর জন্ম ইংলণ্ডে। ই. বি. কাওয়েলের প্রভাবে ইনি আজীবন ভারতবিদ্যা চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। টমাস যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অক্স্‌ফোর্ডে বোডেন অধ্যাপক এবং রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ও ডিরেক্টর পদ। ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, ভাষা—বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁর কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেম্ব্রিজ প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধাবলী, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ১৩-১৬ খণ্ড সম্পাদনা, চীন তিব্বত সীমান্তের লুপ্ত 'নাম' ভাষা পুনরুদ্ধার।]

৭৪. ৪৪ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.

vigorous as when I had the pleasure of meeting you eight years ago. From the last issue of the journal of the Bihár and Orissa Research Society I see that your interests are maintained in all their keenness and that your courage is equal to extensive new enterprizes. So as you are still adasamistha,[৭৫] you must be regarded as in all essentials still a young man. Please accept the most cordial congratulations and good wishes of an old friend.

Yours very sincerely,
F. W. Thomas

৪৭.

March 28, 1929
161 Woodstock Road,
Oxford.

My dear Mahamahopadhyaya,

It gave much pleasure to receive your letter and your benediction, which is an encouragement in a new sphere of work. Although there is much to do and one has to become used to a new distribution of time and energy, I think I already note some improvement in my ways as regards answering letters, and I am glad to have drawn a response from so esteemed a friend of long standing.

It was most kind of you to send me a copy of your volume V, a huge work. The Preface is a mine of information and replete with ideas, the fruit of your extra-

৭৫. 'অদশমীস্থ'। দশমীস্থ অর্থ ৯০-এর উর্ধ্বে।
অ দশমীস্থ=৯০ এর নিচে যার বয়স।

ordinary experience of Sanskrit Mss. and familiarity with all branches of the literature. It is wonderful that you should have been able to compile a catalogue in XIV volumes of which this (No. V) is only one. I remember my surprise when you spoke to me of this work in Calcutta in 1921. I hope that you will find no difficulty in carrying through the publication of the remaining volumes.

I am glad to have news of Suniti[৭৬], on whom we rely confidently of linguistic studies in India. I hope to be writing to him before long.

With all kind regards, and sincere congratulations upon your undiminished vigour, I remain.

Yours sincerely,
F. W. Thomas

৪৮.

2. 12. 27.
The Croft
Park Hill.
Ealing. W. 5.

My dear Haraprasad,

Now that I have retired from the Council of India, I have more leisure, and have utilized that for the last few days to read your Magadhan literature[৭৭] more carefully than I was able to do when it first reached me. I now realise more fully what a valuable contribution it is to our knowledge of ancient times in my old province. Bihar

---

৭৬. ভারতের মানবিকী বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০ ১৯৭৭)।

৭৭. ৬৭ সংখ্যক চিঠির পাদটীকা দ্র.

owes a great deal to your researches, as indeed does the greater part of Northern India. And what a joy it must be to you to see your son Benoytosh[৭৮] following so faithfully in your footsteps. He is fortunate in having an enlightened chief like the Gaekwad to support him and facilitate the publication of the results of his researches,

What are you doing now that you have left Dacca ? I hope your health keeps good. My wife and I are very well. Our daughter and her two children have been with us, but she is leaving on Monday next to join her husband who has been transferred from China to India. I suppose you still accept Jayaswal's reading on the backs of the Patna statues. Apart from that do you think there is any doubt as to their representing human beings and not Yakshas ?

With kindest ragards, I am

Yours sincerely
E. A. Gait

P. S. How time passes ! Bihar has now the fourth Governor since I left.

৪৯.

23. 12. 30
The Croft
Park Hill
Ealing W, 5.

My dear Mahamahopadhyaya,

It is long since we have corresponded, and I have no recent news of you. But I hope that your health is still

---

[এডওয়ার্ড আলবার্ট গেইট (১৮৬৩-১৯৫০) ১৯১৫ থেকে ২০ পর্যন্ত বিহার, উড়িষ্যার লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন। 'হিস্ট্রি অব আসাম' গ্রন্থের লেখক]

৭৮. হরপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (১৮৯৭-১৯৬৪) বরোদাতে ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট-এর ডিরেক্টর এবং গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালার প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

good and that you are able to continue your invaluable research work.

I am thinking of writing a paper on the achievements of modern research in India, and shd. like to incorporate a brief account of the way in wh. forgotten Mss. have been recovered. I shd. be very grateful if you will kindly tell me where I can find an account of your own work in this sphere. I have seen various references to it in the J. A. S. B. but so far have not come across a connected account.

It must be very gratifying to you to find your son Binoy following so ably in your footsteps.

With kindest regards, and wishing you all the compliments of the season, I am,

Yours sincerely
E. A. Gait

৫০.

19. 2. 31.
The Croft,
Park Hill
Ealing W. 5.

My dear Sastri,

Very many thanks for your letter of 25/1 and three of your interesting reports on the search for ancient Mss.

I am grieved to hear that you have been confined to your room for 3 years by a broken leg. Can nothing be done for it ? It is a terrible infliction, but I am happy to learn that you are not allowing it to interfere with your literary activities.

It is a great pleasure to hear of the continued success of the B. O. R. S.[৭৯] As you say, Jayaswal has been a great

৭৯. Bihar and Orissa Research Society.

pillar of strength. The society is also much indebted to you for many interesting papers.

I am afraid the paper I am contemplating will only be a small affair for the man in the street, It will only be a resumé of known facts.

With kindest regards and hopes for your recovery, I am

Yours sincerely
E. A. Gait

৫১.

4. 4. 31
The Croft
Park Hill
Ealing W. 5.

My dear Haraprasad,

Many thanks for your letter of 16/3 and the very interesting papers you have sent me.

I am delighted to hear that Benoy has received such recognition at the hands of the Gaikwad. It must be a very great joy to you to see him following so successfully in your footsteps.

Jayaswal has sent me his Baroda address. If he wishes to be Prime Minister, I greatly hope he will be offered the post. But he wd. be a great loss to the Patna Bar and the B. O. R. S.

With kind regards and hope, that the condition of your leg is improving.

I am
Yours sincerely
E. A. Gait

৫২.

9, Connaught Place
Marble Arch. W. 1.
12th April, 1929

Dear Dr. Shastri,

I was very pleased to receive the fifth volume of the Catalogue of Sanskrit Mss., and your very charming letter whieh accompanied it. Please accept my very sincere thanks for the book and for your kind sentiments. I am glad to know that your valuable work in the field of scholarship is being continued.

I do very often think of Bengal and the many friends I made there, and it is an honour to be able to count among those friends so learned a scholar as yourself.

It will be a pleasure to hear from you at any time.

Believe me,
Yours sincerely
Lytton

[লর্ড রবার্ট লিটন্ (১৮৭৬-১৯৪৭) ১৯২২ থেকে ২৭ পর্যন্ত বাংলার লেফ্টেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন।]

চিঠিপত্র/দুই

১.

আনোয়ারা মধ্য ইং স্কুল
চট্টগ্রাম
৬।৯।০১

শ্রীচরণে নিবেদনমিদং,

প্রায় বৎসর কাল হইল, আমি—'বঙ্গীয় পরিষদের' সহিত পরিচিত হইয়াছি। কিন্তু এতাবৎকাল আমি ভবদীয় শান্তির বিঘ্ন....করিতে পারি নাই। সাদৃশ ক্ষুদ্র...পত্র ব্যবহার কোন সাহসে...পরিষদের সহযোগী সম্পাদক ....ও আশ্বাসেই আপনার নিকট পত্র দিতে সাহসী হইয়াছি। আমার আবিষ্কৃত 'রাধিকার মানভঙ্গ'[1] আপনারই সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে জানিয়াও এতদিন আপনার নিকট পত্রাদি লিখিতে সাহস করি নাই। আশাকরি, আমার এই অনধিকার চর্চার জন্য ক্ষুদ্রমতি—অজ্ঞান বালক আমাকে ক্ষমা করিতে আপনার উদার মনে কোনই কুণ্ঠা উপস্থিত হইবে না। আমার অজ্ঞতা বশতঃ যদি ভাষা কোথায়ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হয়, তাহাও নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

পরিষদের সহিত পরিচয়ের বহু পূর্ব্বে, যখন আমি এফ. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন অবধি আমি প্রাচীন সাহিত্য প্রিয়। পূর্ণিমা নামক মাসিক পত্রিকায় আমার সংগৃহীত "অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী" প্রকাশ করিয়া আমি সাহিত্য সংসারে বিশেষতঃ আমাদের জন্মভূমির কবি বাবু নবীনচন্দ্র সেনের সহিত পরিচিত হই। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে এই...বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। নবীন......তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ...সেই অবধি প্রাচীন সাহিত্য ...বর্দ্ধিত হয়। স্থানীয় "জ্যোতিঃ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় পুঁথি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমার একখানি বিজ্ঞাপন বোধহয় দেখিয়া থাকিবেন। সেই বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়া একবার আমি কমিশনার মিঃ ম্যানেষ্টী (Mr. Manisty)

* [মুন্শি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) পুথি সংগ্রাহক ও প্রাচীন সাহিত্যের গবেষক ছিলেন। তাঁর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী স্কুলে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন।]

১. নরোত্তম ঠাকুর রচিত 'রাধিকার মানভঙ্গ' 'শ্রী আবদুল করিম'-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত পরিষদ-গ্রন্থাবলীর ১০ সংখ্যক পুস্তিকা, হরপ্রসাদের লেখা ভূমিকা যুক্ত।

কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছি। কিন্তু সেকথা তুলিয়া কাজ নাই। এ পর্যন্ত নানা মাসিকে আমার পরিশ্রমের পরিচয়াত্মক প্রবন্ধাদি লিখিয়া এখন ঈশ্বর কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে একরূপ পরিচিত হইয়াছি। ইহাতে আমার গুণপনা কিছুই নাই, যাঁহারা আমাকে পদতলে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ের বিশালতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সম্প্রতি 'পরিষদে' আমার প্রাপ্ত পুঁথি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি জানেন। চট্টগ্রামে এমন কত পুঁথি পাওয়া যায়। আমি আপনাকে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বাড়ী বিস্তর পুঁথি রহিয়াছে। দেশের লোক এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, এই সকল পুঁথি তাহাদের ···হইলেও তাহাদের মায়া ত্যাগ···অনিচ্ছুক। ইতিপূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছি যে, আমি "ম্লেচ্ছ" মুসলমান! হিন্দুগণ ম্লেচ্ছকে পুঁথি দিতে চায় না বলিয়া আমার পক্ষে পুঁথি সংগ্রহ আরো কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে নাকি পাপ হয়! হায়! যে দেশের লোকের মনোভাব এইরূপ, সেই দেশে হিন্দু মুসলমানে দিন ২ কাটাকাটি না হওয়াই বিচিত্র !!

আমি দরিদ্র—অন্নচিন্তা জর্জ্জর ব্যক্তি। তাহাতে আপনাদের ন্যায় উচ্চ পদেও আরূঢ় নহি। সুতরাং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থব্যয় করিয়া পুঁথি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসাধ্য! উদার প্রকৃতি কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে মাত্র আমি কয়েকটা পুঁথি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমার মনে হয়, অর্থ-বলে আমি এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব। তাই আজ আমি আপনার, —এসিয়াটিক সোসাইটীর আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। চট্টগ্রামে হিন্দুর মধ্যে আমার কোন বন্ধু নাই—অবশ্য সাহিত্যপ্রেমিক বন্ধুর কথাই বলিতেছি। 'আলো' নামক মাসিক·· পত্রিকার সম্পাদক আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ·· আর ইহজগতে নাই।···অর্থবলে জগতে না করা···আমার বিশ্বাস, আপনারা অর্থ সাহায্য করিলে আমি মাতৃভাষার পূজোপকরণের কতকটা অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব। সম্প্রতি 'ধর্ম্ম ইতিহাস' (গুণরাজ খাঁ প্রণীত)[২] ও 'কণ্বমুনির পারণা'[৩] (ভনিতা নাই) নামক দুইখানি বিক্রেয় পুঁথি পাইয়াছি। প্রথমটার পত্রসংখ্যা ৬২, দুই পৃষ্ঠে লেখা; ২য়টী ক্ষুদ্র, ১৩ পাত, দুই পৃষ্ঠে লেখা। কত মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে জানাইলে বাধিত হইব। মনে

২, ৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১০-এর অতিরিক্ত সংখ্যায় আবদুল করিম সংকলিত বাঙলা প্রাচীন পুথির বিবরণ-এ পুথি দুখানির বিবরণ আছে।

রাখিবেন, সহজে এখানকার লোকে এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে চায় না। বিস্তর সময় নষ্ট করিলাম। মাপ করিবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী
শ্রী আবদুল করিম।

২.

শ্রী হরিঃ শরণম্

নারিকেলডাঙ্গা।
২৭এ মার্চ ১৯০২।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য আপনি যে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। যত্ন করিয়াও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহাতে আর কাহারও কোন দোষ থাকে না। আপনাকে বেমুরি শাস্ত্রীর[৪] জন্য এতটা কষ্ট দিয়াছি তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি।

আপনার অপর কথা সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব। এবং আপনার অনুকূল মত পাওয়াতে অনেকটা সুবিধা হইবে। কিমধিকমিতি।

আপনারই
শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮) প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ও আইনজ্ঞ, ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণায় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগের সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।]

৪. বেমুরি শ্রীরাম শাস্ত্রী।

৩.

শ্রী হরিঃ শরণম্

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
২৬এ আষাঢ় ১৩০৯।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার প্রদত্ত "মেঘদূত ব্যাখ্যা" খানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও যত্নের সহিত তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

ব্যাখ্যাটি যে কেবল মেঘদূতের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছে এমত নহে, ইহা সঙ্গে সঙ্গে নিজের সৌন্দর্য্যও ব্যক্ত করিতেছে। গ্রন্থখানি যে জগদ্বিখ্যাত কাব্যের ব্যাখ্যা সেই কাব্যের ও যে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের রচনা তাঁহার নামের যোগ্যই হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি মহার্ঘ্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইতি।

আপনারই
শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.

Narikeldanga, Calcutta
August 23, 1903

My dear Mahamahopadhyaya,

I have received your letter of yesterday's date & the Sonnets of the Kavi Sammilani[৫] in three groups.

I am so hard pressed for time that I am sorry to say I have been able to look over only the nine sonnets you have marked as deserving of prizes. I agree with you generally & I think these nine sonnets are on the whole good. But I feel bound to observe that the one to which you have given the first place though embodying a beautiful thought, is

৫. ইডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিক প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা একটি বাৎসরিক কবি সম্মিলনীর আয়োজন করতেন। কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

not mellifluous in language or rhythm & there is in it an intolerable disagreement between the sentential & caesural pause. Such utter disregard of form & measure is perhaps a little too much for a young poet. I observe a similar disregard though in a very slight degree, in the sonnet marked fourth, in which the ninth line is in a metre different from that of the other lines.

I beg to send herewith a currency note for Rs 10 (ten) as my own contribution to the prize fund.

I intend starting for Madhupur in the morning of Saturday the 5th of September & so I fear I shall not be able to join my colleagues in visiting the Visvavidyalaya. I would therefore request you to write to Raja Piyari Mohan Mukherji,[৬] whom we have usually elected as our Chairman to fix the day & hour for visiting the institution & then either you or he may communicate to the other members of the Board of Visitors the time appointed, so that the visit & the payment of the donation to Pandit Sa´masrami[৭] may take place before the Puja vacation. If I am here & not unavoidably engaged at the time appointed, I shall join my colleagues.

Yours very sincerely,
Gooroo Das Banerjee

P. S. The Sonnets sent are herewith returned.

৫.

Narikeldanga
August 25, 1903.

My dear Mahamahopadhyaya,

I have received your kind note of this day's date. If the Kavi Sammilani will not spare me, the only day on

৬. উত্তরপাড়ার জমিদার (রাজা) প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৪০ ১৯২২)।

৭. আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬-১৯১১)।

which I may have a little time to spare is Thursday the 3rd of September. If that day will suit you, I shall try my best to attend your meeting at 7 P. M.

Yours very sincerely,
Gooroo Das Banerjee

৩.

Narikeldanga, Calcutta
October 5, 1904

My dear Mahamahopadhyaya,

I am sorry I was not here when your letter of the 29th September was sent. I feel much obliged to you for your doing me the honour of putting off the distribution of prizes to the Kavi Sammilani for my sake & fixing it for today ; but I am glad that my son Haran's inability to give any definite answer to your kind letter of yesterday will enable the Sammilani to have a new chairman this year, for I am sure you must have by this time settled the arrangements for this evening's meeting. I shall however try to attend the meeting which I understand, will be held at 7 P. M. to day, at the hall of the University Institute.

I beg to enclose herewith a currency note for Rs. 10 (ten) as my humble contribution to the Kavi Sammilani Prize fund.

Yours sincerely,
Gooroo Das Banerjee

৭.

শ্রী হরিঃ শরণম্‌।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
১৩ নবেম্বর, ১৩১১ [বঙ্গাব্দ]।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার অদ্যকার পত্র পাইয়াছি।

গতকল্য আমি যাইতে পারি নাই তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত আছি।

নিমন্ত্রণ পত্রের মুসাবিদা যাহা পাঠাইয়াছেন তাহাতে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখিনা। মুসাবিদা অতি সুন্দর হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ পত্রে আমি স্বাক্ষর করিব না স্থির করিয়াছি। যদিও আপনাদের অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তব্য ও তাহা করিতে না পারিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইব, কিন্তু কোন কার্য্যে আর অগ্রগামী বা প্রবর্ত্তক হইব না এই সংকল্প একবার করিয়া তদ্বিপরীত কার্য্য করাও কর্ত্তব্য নহে। এবং আমার স্বাক্ষরের অভাবে কোন ক্ষতি হইবে না। যাঁহারা আপনার স্বাক্ষরের অনুরোধ রাখিবেন না, তাঁহারা যে আমার স্বাক্ষরের বিশেষ সম্মান করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে আপনি আমা অপেক্ষা অধিক পরিচিত এবং বিষয়ীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির সহিত আপনার ও আমার পরিচয় প্রায় তুল্য। অদ্য আমি সমস্ত দিনই বাটীতে থাকিব। আপনার ও কালীপ্রসন্ন বাবুর[৮] যখন সুবিধা হয় আসিবেন, সাক্ষাৎ লাভে পরম সুখী হইব। ইতি—

আপনারই
শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৮.

Narikeldanga, Calcutta
July 17, 1905

My dear Mahamahopadhyaya,

I beg to send herewith a fair copy of the draft we made last Friday evening.

I have ventured to make two small additions to our draft, hoping that they will meet with your approval, or at any rate, that you will not object to them. One of these

৮. সম্ভবত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, যিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরে (১৯০৮-১০) সংস্কৃত কলেজ-এর অধ্যক্ষ হন।

is the addition of Bhashapariccheheda with Siddhanta Muktavali to Kusumanjali under head (4) of Group D (Nyaya), the addition being made by reason of the popularity of the work with Bengal Naiyayiks. The other is the addition of paragraph 3 about the definition of subjects, which is clearly necessary.

If the draft is approved, please sign it & return it to me by the bearer if convenient. He will wait if directed to do so.

Yours sincerely,
Gooroo Das Banerjee

৯.

Vakils Library
Calcutta
26. 8. 1903

My dear Haraprasad Babu,

I have got a bad toothache, and having worked in Court all day, feel so uneasy that I must not attend the Council meeting this afternoon.

I enclose list of papers I have read before the Society.

I am told Tarkalankar has applied for loan of books. I have no doubt you will help the old man.

Yours affly.
Asutosh Mookerjee

[আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) হাইকোর্টের বিচারপতি হন ১৯০৪ খৃস্টাব্দে। ১৯০৬-১৪ এবং ১৯২১-২৩ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হরপ্রসাদ-এর একটি মন্তব্য স্মরণীয়, "প্রচার ছিল আমার সঙ্গে তাঁর অহিনকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। ...আমাদের পরস্পরের প্রতি অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল।"]

১০.

Bhowanipore
8th Aug. 1914

My dear Sastri Mahasay,

Many many thanks for genuine Sandesh such as delights a Brahmin. I am growing old, but I am still able to relish such sweets.

Yours affly,
Ashutosh Mookerjee

১১.

1, Pioneer Road
Allahabad
5th Sep. '04

My dear Sastriji,

The press has sent the final proof of form 61 of the Slokamanabika [?]. But this I find is an incomplete form of only 5 pages. This looks ominous. There are still about 400 slokas to complete the work, and of the copy too I have got only about 800 and odd pages ; and I fully remember having sent over 900 pages. Kindly have a thorough search made and let me know the result.

In the meantime I believe the press could continue work with the introduction, appendices etc.

I hope you will kindly let me know the fate of my "copy" soon ; so that I may do rest of the work over again ; in case the few pages be really lost beyond recovery.

Hoping you wont mind my troubling you.

Yours Sincerely,
Ganganath Jha

[মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা (১৮৭১-১৯৪১) বিশেষভাবে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। তিনি বারাণসী সংস্কৃত কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ (১৯১৭) এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯২৩-৩২) রূপে কর্মজীবন অতিবাহন করেন।]

১২.

25. Rammohan Shaw Lane
Duff Street
Calcutta
Friday the 19th February
1913

Dear Mahamahopadhyaya,

Herewith enclosed please find the opinion on the thesis. Kindly go through it, and do the needful. I have put the matter clearly and tersely. I trust this will meet your views.

Dr. Bruhl[১] wants the Report immediately: the Syndicate will consider the matter, this afternoon.

Kindly therefore either send it on to Dr. Bruhl after doing your part, or—what would be better—return it to me per bearer, and I will hand it over to the Registrar personally (which is desirable in a matter like this).

Yours sincerely,
Brajendra Nath Seal

P. S. Kindly send me a line in reply.

১৩.

মহাত্মন,

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব সরস্বতী এম. এ. মহাশয়ের দ্বারা আমরা মহাশয়কে আমাদের কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির বিশিষ্ট সভ্যের

[সাহিত্য, দর্শন ও গণিতে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) এই চিঠি লেখার সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।]

১. Dr. P.J. Bruhl কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

পদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম ; আপনি ইহাতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্মতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে অতিশয় উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য সমিতির ৬ পৌষের (১৩২০) সাধারণ অধিবেশনে সম্মিলিত সভ্যগণ আপনার নিকটে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

অবসর ক্রমে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান এবং এদিকে মধ্যে মধ্যে পদার্পণ পূর্ব্বক আমাদিগের অনুসন্ধান কার্য্যের সহায়তা বিধান করিবেন এই বিনীত প্রার্থনা।

বশংবদ
কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে
শ্রী কালীচরণ সেন
সম্পাদক

২৭ পৌষ, গৌহাটি
১৩২০

১৪.

Moradpur
Bankipore
8/2/14

My dear Mr. Shastri,

I am sorry that I could not meet you when I···Calcutta ...sad even now at...that I have part...with friend like you.

Once I requested you to get me a copy of the Nila Mata Purana[১০]. Have you written to your pupil for it ?

I hope you will not forget your pupil because he is now in the old capital of the...Aśoka !

[কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল (১৮৭১-১৯৩৭) অক্সফোর্ড থেকে এম. এ. পাশ করে ডেভিস বৃত্তি নিয়ে চীন-বিদ্যায় গবেষণা করেন এবং ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক রূপে নিয়োগ করতে চাইলে তাঁর উগ্র রাজনৈতিক মতের জন্য ভারত সরকার এই নিয়োগে বাধা দেয়। ফলে তিনি আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে কৃতী গবেষক জয়সোয়াল পাটনা মিউজিয়ম ও বিহার রিসার্চ সোসাইটি সংগঠনে প্রধান উদ্যোগী এবং দীর্ঘদিন সোসাইটির পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।]

১০. "নীলমত পুরাণ" কাশ্মীরের আঞ্চলিক পুরাণ রূপে স্বীকৃত।

Now I have to tell you a...news. They undertake to print and publish an···Indo···Review for me...cost. They want···to take its editorship and asked me whether I can bring out the fresh quarterly issue in May or June next. Should I take the responsibility ? Will you and Nagen Babu[১১] stand by me ? Kindly write to me by return of post.

Yours sinly,
Kashi Prosad.

১৫.

Bankipore
23. 4. 14

My dear Sir,

I am thinking of paying a visit to Simla. Will you kindly give me a kind & nice introduction to Dr. Marshall ? You have spoken so highly of him that I should like to see him while there.

I shall be soon able to send a reprint of...complete notes on Brahmin Empire.

I am doing better here at the Bar.

Yours affectionately,
Kashi Prosad

Did Kanjilal send the copy of the Nilamata Purana ?

১১. নগেন্দ্রনাথ বসু।

১৬.

Bankipore
13. 6. '14

My dear Mr. Shastri,

This seems to be absolutely genuine. I do not think that "Shyam Shankar" has any thing to do with Shamji Krishna Varma[১২]. He had no relative of this name in Europe when I was there. I think you ought to accept the election. In case you don't please suggest my name. When you go to St. Petersburg, don't leave me behind — your faithful follower !

Yours sincerely,
K. P. Jaiswal

১৭.

Mithapur
Bankipur
26. 6. 14

Confidential

My dear Mr. Shastri,

I have put in the article as the opening one. It is excellent. I have rendered it in a style befitting your name. I hope you will like the Hindi of the paper.

Instead of publishing it as coming from the Editor, I have put it over your Signature. This would enhance the status of the paper. As the article is coming from you I have anticipated a personal reference in connection with the Satavahanas, a line about Govind Singh has been inserted in its proper place.

I am publishing the article in English in the Express[১৩]

১২. বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা (১৮৫৭-১৯৩০)।

১৩. পাটনা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র-'এক্সপ্রেস'।

of tomorrow, the reference to Sir Ch. S. Baley's patna is very neat indeed. I have added the name of Lord Hardinge also. I hope all this additions will find your approval.

The paper will be posted to you tomorrow.

I am now anxiously awaiting the other articles for "Pataliputra" kindly mentioned in your letter.

If any Bengali newspaper translates your comprehensive sketch of Patliputra it would do well.

Yours affectionately,
Kashiprasad.

P. S. I did not know about Bijjaldeo

Needless to say that I am heartily grateful for the opening article.

১৮.

Bankipore
3. 12. 14

My dear Mr. Shastri,

I mentioned to my friend Mr. Raja—editor of the Express, your decision about starting the I. H. R. He was so pleased with the reference to the German that he put it down in the paper !

I shall carry out your desire with regard to noticing the विश्वकोष of Nagen Babu in Pataliputra. I have already personally...help about which you had written.

What about the Nila-mata ? Your pupil has not sent it to you yet. We might get something there for our H. R.

I thank you for the papers in Bengalee which I shall utilize in time. Won't you send something on Kalidasa—say on Ramagiri ?

Should we print our paper C. H. R. at the Baptist mission? Their charges will be high but work will be quite fit. I suppose if you have a talk with them, they might fix some special rates for us. Of course, the matter will be locked up for long as in the case of A. S. B. publications and therefore they can make a reduction for the H. R.

Yours sinly. & affly.
Kashi Prasad.

১৯.

Seal of the Govt. of Travancore	Office of the curator for the publication of Sanskrit Mss. Trivandrum 6th October 1914

Dear Sir,

I have very much pleasure to send you a copy each of the numbers 36—39 of the Trivandrum Sanskrit Series, in continuation of the first 35 numbers already sent. Your valuable suggestion which I learned from the "Report on the Search for Tamil and Sanskrit Mss." to the Government of Madras for the year 1893—94 No. 2 has been referred to in the preface to Tikasarvasva.

I have received your very kind letter containing the suggestion referring to Veda country. But I came to know later there was a country by name Veda in Travancore and thought the Veda Janapada mentioned in the commentary of the Vararuchasangraha[১৪] might more satis-

---

[গণপতি শাস্ত্রী (১৮৬০--১৯২৬) ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৮ ১৯২৫ পর্যন্ত ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত পুথি সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ রূপে 'ত্রিবান্দ্রম ম্যানস্ক্রিপ্ট সিরিজ' প্রবর্তন করেন। ভাস এর তেরখানি নাটক প্রকাশ তাঁর জীবনের বিশিষ্ট কাজ।]

১৪. ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ৩৩ সংখ্যক গ্রন্থরূপে "বাররুচ সংগ্রহঃ" প্রকাশিত হয়। নারায়ণের "দীপপ্রভা" নামক টীকা সমেত এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন টি. গণপতি শাস্ত্রী ১৯১৩ সালে।

factorily be identified with this country, Veda, in Travancore than the town Bednaur. I hope I would be able to send you the Pratimanataka in a month or two at the latest.

I am,
Dear Sir,
Yours faithfully,
Ganapati Sastri.

২০.

Lalgola Raj

Lalgola
Murshedabad
The 23rd February 1915

প্রণাম নিবেদনমেতৎ,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি। বৈষয়িক ও সাংসারিক নানারূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় অনবসরবশতঃ উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। লাট সাহেব মহোদয় সাহিত্য পরিষদ দেখিয়া[১৫] সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন ও পুনরায় দেখিতে আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমি পরিষদের তেমন কিছুই করি নাই; তবে যাহা কিছু করিয়াছি তাহাই আপনার মহানুভবতা গুণে আপনার চক্ষে যথেষ্ট বোধ হওয়ায় আপনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। পরিষদ আপনার যত্ন-বলেই বঙ্গেশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইল। এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আশাকরি আপনি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন। ভরসাকরি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। নিবেদনমিতি।

প্রণতঃ
শ্রীযোগীন্দ্র নারায়ণ রায়

১৫. ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৯শে মাঘ বাঙলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল সাহিত্যপরিষৎ দর্শনে আসেন

২১.

কটক

ইং ৫ মে ১৯১৫

প্রণতিপূর্বক নিবেদন,

আপনার আশীর্বাদী পত্র পাইয়া মহাশয়ের পত্র লিখিলাম। অমরকোষের টীকা পড়িয়াছি।

এখানে অনেক দিন আছি। সেই হেতু কোন কোন ছেলে আমায় একটু ভক্তি করে। ছেলেদের কথা ধর্তব্য নহে। আপনাদের আশীর্বাদ-ভাজন হইতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে। বাঙালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি তাহা আপনাদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি। দুঃখ হইতেছে আপনাদিগের সামীপ্য সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। ইতি—

নিঃ শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়

২২.

Chief Dewan's Office,
Political Department,
Tippera State, Camp-Calcutta,
88B, Hazra Road, Kalighat.
January 11, 1920.

D. O. No. 242

Dear Sir,

Referring to our conversation regarding the History of the Tippera State, I am glad to inform you that H. H. has been pleased to learn that you have kindly agreed to take up the work. H. H will look up to you for early completion of the work which has been so near his heart for years and regards the association of your name with it as the sure guarantee of satisfactory execution.

[যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) এই চিঠি লেখার সময়ে কটক র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, বৈদিক-সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যোগেশচন্দ্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন।]

H. H. expects

(1) that you will be pleased to fully go through the work with Pandit Amulya Ch. Vidyabhusan and revise it thoroughly.

(2) that you will kindly edit the publication ;

(3) that you will be so good as to write an introduction.

Pandit Vidyabhusan has been asked to sit with you every evening as desired.

As each part or chapter is ready it should be sent to the Press.

You will of course determine the plan of arrangement in consultation with Amulya Babu and get up a table of contents before sending the matter to the Press.

Pandit Vidyaratna suggested that I should make an immeditate remittance to you. We are rather short of money here. I am however enclosing a cheque for Rs. 250/ (Two hundred and fifty) for your immediate use. Kindly acknowledge the same.

Yours faithfully,
P. K. Dasgupta
Chief Dewan, Tippera State.

২৩.

দার্জিলিং

To Haraprasad Shastri 12/6/31

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ,

আপনার সস্নেহ পত্রখানি আমাকে গভীর তৃপ্তিদান করিয়াছে। আমার সপ্ততিতম জন্মোৎসবের উদ্বোধন সভায় আপনি সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন ইহা আমার সৌভাগ্য। বাংলা সাহিত্যে এতদিন ধরিয়া আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহা সমগ্রভাবে দেখিবার শক্তি আপনার মত কয়জনের আছে ? সেদিনকার সভায় উদার ভাষায় আমার সম্বন্ধে আপনি যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি।

আগামী শীতকালে কোনো এক সময়ে আমাকে অভিনন্দন করিবার প্রস্তাব আপনারা করিয়াছেন। সম্মানের অতি বিপুল সমারোহে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধকরি। তথাপি এ আমন্ত্রণ অস্বীকার করিবার শক্তি আমার নাই। এ বৎসর দেশের বাহিরে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, অতএব দেশের লোকের নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবার অবকাশ পাইব। আপনি আমার অভিবাদন জানিবেন। ইতি ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮,

স্নেহস্বারা সম্মানিত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

My dear Haraprasad Babu,

I got a letter from Mr. O' Malley[১৬] yesterday in wh. he writes that he has requested you to permit me to see the Mss. of Ramapala-Caritam & Harivilasa alias Carita[১৭] for refererences to Keshori dynasty. I should have gone to you, but I have been practically laid up with an attack of dysentery & am forbidden to go out for at present.

I shall therefore be much obliged, if you will kindly send me per bearer, the two Mss. If you like you can send me the extracts about Orissa History ; in wh. case I will not want the Mss., but may refer to you for...on some... incidental points, where required. As Mr. O' Malley has been pressing me for early···of the sketch. I shall be much obliged if you can give me these extracts by to-morrow or the day after to-morrow, as convenient.

Hoping you are in good health.

Yours sincerely,
Monmohan Chakraborty

১৬. লিয়ুইস সিডনি স্টিউয়ার্ড ওম্যালি L. S. S. O'Malley (১৮৭৪-১৯৪১) বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স-এর সম্পাদক ছিলেন (১৯০৫-১৯০৯), পরে জনগণনায় অধীক্ষক ও বিভাগীয় বিচার সচিব হন।

১৭. ১৪৯৩ খৃস্টাব্দে চতুর্ভুজ রচিত কাব্য 'হরি চরিতম'। এটি এশিয়াটিক সোসাইটির 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালায় ২৮৮ সংখ্যক গ্রন্থরূপে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়।

স্মৃতিকণা

নলিনীগোপাল মজুমদার

চল্লিশ বৎসর পূর্বে ঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র

[শাস্ত্রী মশাই-এর এই আত্মস্মৃতি ১৩২৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ, আশ্বিন ও ফাল্গুন সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ননীগোপাল মজুমদার-এর স্বাক্ষরে প্রকাশিত হলেও তিনি অনুলেখক মাত্র। লেখাটির সন্ধান দিয়েছেন শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল।]

১.

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একদিন তাঁহার পটল-ডাঙ্গার বাসায় সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে রাজেন্দ্রলালের শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"১৮৭৭ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে আমি এম. এ. পাশ করি। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তাঁহার খুব সদ্ভাব ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নিকট আমার উল্লেখ করেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে দেখিতে চান। পন্ডিতমহাশয় এক দিবস আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, রাজেন্দ্রলাল তোমাকে দেখিতে চাহেন, একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ কর।'

"রাজেন্দ্রলাল তখন মাণিকতলায় ৮নং বাটীতে থাকিতেন। এই বাটীর একপার্শ্বে তখন ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ছিল, আর এক পার্শ্বে তিনি পুত্রগণকে লইয়া থাকিতেন। আমার বাসা সে সময় আমহার্ষ্ট্ স্ট্রীটে ছিল। একদিন রাজেন্দ্রলালের সহিত দেখা করিতে গেলাম। উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমি যে সময়ের

কথা বলিতেছি সে সময় উমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের নিকট যাতায়াত করিতেন। মিত্র মহাশয় আমাকে ও উমেশকে একটা কাজের ভার দিলেন।

"এশিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় উপনিষদ্ বাহির হইবার কথা চলিতেছিল। তিনি উহার কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদের ভার আমাদের উপর দিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'উপনিষদের কোন অংশের অনুবাদ করিতে হইবে?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'Make your own choice'. ইহার কিছুদিন পরে আমি ও বটব্যাল অনুবাদ লইয়া মিত্র মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। উপনিষদের যে অংশ আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম সে অংশের প্রত্যেক শব্দের টীকা ফুট্নোটে দিয়াছিলাম এবং কে কোন্ অর্থে উহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলি নাই। রাজেন্দ্রলাল আমার অনুবাদ পড়িয়া বলিলেন, 'তোমার কিছুই হয় নাই। কি প্রকারে অনুবাদ করিতে হয় তাহা তুমি জান না। তোমার দ্বারা এ কাজ হইবে না। দেখত উমেশ কেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছে।'

"বটব্যালের লেখা তিনি খুব পছন্দ করিলেন এবং উহার প্রশংসাও করিলেন। ইহার পর কিছুকাল রাজেন্দ্রলালের সহিত আর সাক্ষাৎ করি নাই। একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়া তিনি আবার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমেশচন্দ্র Statutory Civilian হইয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া যান। রাজেন্দ্র-লালের কাজ করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক হয়, তাই আমাকে আবার ডাকিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'I have been rather too hard upon you. তুমি যে সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছ তাহা আমার স্মরণ ছিল না। উপনিষদের অনুবাদ করা অতি দুরূহ, তাহার ভার তোমার উপর দিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। যাহা হউক, এইবার তোমাকে একটা সহজ কাজের ভার দিতেছি।'

"নেপাল হইতে যে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথিগুলি সোসাইটিতে আসিয়া স্তূপাকার হইয়াছিল মিত্র মহাশয় তাহার একটা ক্যাটালগ প্রস্তুত করিতে ছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতেরা পুঁথিগুলির Summary করিয়া দিত, সেই সকল Summary ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ভার পড়িল আমার উপর। আমি কিছুদিন কাজ করিয়া লক্ষ্ণৌ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া যাই। আমার শরীর তখন তেমন ভাল ছিল না, তাই যাইবার সময় রাজেন্দ্রলাল আমাকে বলিয়াছিলেন, 'Try to increase the span of your existence.' লক্ষ্ণৌ কলেজে আমি বেশী দিন থাকি নাই। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তথায় অধ্যাপনা করি, পরে কলিকাতায়

ফিরিয়া আসি। লক্ষ্মৌ সহরে থাকিবার সময় আমার সহিত রাজেন্দ্রলালের পত্র বিনিময় চলিত। আমাকে তিনি কত স্নেহ করিতেন তাহা তাঁহার পত্রে বুঝিতে পারিতাম। প্রায়ই তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিতে উপদেশ দিতেন। আমার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি কত উৎসুক ছিলেন। তাঁহার ক্যাটালগের প্রুফ্‌গুলি আমার কাছে যাইত, আমি উহা সংশোধন করিয়া ফেরৎ পাঠাইতাম। রাজেন্দ্রলাল আমাকে যে সকল পত্র লিখেন তাহা আর এখন নাই, অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে, নৈহাটীর বাটীতে সন্ধান করিলে এখনও বোধ হয় দুই-একখানি মিলিতে পারে।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজেন্দ্রলালের কাজ আরম্ভ করি। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Nepalese Buddhist Literature[১] নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার ভূমিকায় তিনি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। একদিন তিনি ইচ্ছা করিয়া ভূমিকার ঠিক ঐ অংশেরই প্রুফ আমাকে দেখিতে দিলেন। সেই জায়গাটা তোমাকে দেখাইতেছি।" শাস্ত্রী মহাশয়ের পণ্ডিত শেল্‌ফ হইতে একখণ্ড Nepalese Buddhist Literature নামাইয়া আমার হাতে দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আমার হাত হইতে বইখানা লইয়া উহার গোড়ার একটা পাতা খুলিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। উহাতে লেখা আছে,—During a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M. A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. ...I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me and tender him my cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit Language and knowledge of European literature fully qualified him for the task ; and he did his work to my entire satisfaction.

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এরূপ প্রশংসা কখনও আশা করি নাই। বাস্তবিক, সেদিন আমার যে আনন্দ হইয়াছিল আজ চৌত্রিশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি আমার মনে আসিতেছে। লক্ষ্মৌয়ে থাকিবার সময় আমি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। এই সময় রাজেন্দ্রলাল এক পত্রে

[১. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, 1882.]

আমাকে লিখেন, 'I wish you every success in your venture'—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরও প্রগাঢ় হইয়াছিল। মিত্র মহাশয়ের ক্যাটালগ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, আমার পুস্তকের জন্য তুমি বিস্তর খাটিয়াছ, তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাই।' এই বলিয়া আমার হাতে একখানা ১৪৫ টাকার চেক দিলেন; এই অযাচিত দান আমি মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম।

"তাঁহার দৈনিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাকে বলিতেছি। তিনি খুব ভোরে উঠিতেন। তাঁহার একখানা গাড়ী ছিল; তাহাতে করিয়া হেদোর ধারে আসিতেন। সেখানে কৃষ্ণদাস পাল, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিতেন। তখন একটা বেশ দল হইত। নানারূপ গল্প করিতে করিতে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরিয়া শ্যামবাজারের দিকে হাঁটিয়া যাইতেন, গাড়ী পিছন পিছন চলিত। বেড়ান সারা হইলে রাজেন্দ্রলাল গাড়ীতে উঠিয়া বাসায় ফিরিতেন। তাঁহার বাটীর উপর তলায় একটা বড় হল ছিল, তাহার পূর্ব পার্শ্বের একটি ঘরে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। ঠিক যখন আটটা বাজিত, তখন আমরা আসিয়া জুটিতাম। আমি সবদিন যাইতাম না, যেদিন প্রুফ্ দেখার দরকার হইত সেইদিন যাইতাম। প্রুফ্ দেখা শেষ হইলে বেলা সাড়ে নয়টায় রাজেন্দ্রলাল স্নানে যাইতেন। স্নান আহার সারিয়া ১২টা পর্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। তাহার পর পড়িতে বসিতেন। নূতন পুস্তক তিনি এক অভিনব প্রণালীতে পড়িতেন। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা পড়িলেন, যদি কিছু নোট করিবার থাকিত নোট করিলেন, নীল পেন্সিল দিয়া আবশ্যক অংশ চিহ্নিত করিলেন, তাহার পর পরবর্তী চারি পৃষ্ঠা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। পঞ্চম পৃষ্ঠা পড়া হইলে আবার দশম পৃষ্ঠা পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপ চারিপাতা অন্তর একটি পাতা পড়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। একদিন কৌতূহলী হইয়া আমি ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজেন্দ্রলাল তদুত্তরে বলিলেন, 'গ্রন্থের প্রথম পাতাতেই যদি কোনও মৌলিকতার আভাস পাই, তাহার পরবর্তী পৃষ্ঠা পাঠ করি, তাহা না পাইলে চারিটি পাতা বাদ দিয়া পঞ্চম পাতায় কি আছে দেখি; তাহাতেও যদি লেখকের কোনও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাই বহিখানি বন্ধ করি।'

"এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র

ও উহার ইংরাজী অনুবাদ[২] বাহির হয়। ইহার কিছুদিন পরেই (১৮৮৩ সালে) কাওয়েল এবং গাফ্ মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের' ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। একদিন রাজেন্দ্রলালের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া দেখি তাঁহার দুই ভলিয়ুম যোগশাস্ত্র এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের নবপ্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ সাজান রহিয়াছে। নানা কথা বার্ত্তার পর যখন আমি উঠিয়া আসিতেছি রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, 'এই কয়খানি পুস্তক লইয়া যাও, পড়িয়া দেখিও।' কয়েক দিবস পরে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরপ্রসাদ, বইগুলি পড়িয়াছ ?' আমি বলিলাম—হাঁ পড়িয়াছি। রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার কোন্ অনুবাদ ভাল লাগিল ?' আমি বলিলাম—কাওয়েল ও গাফের কৃত অনুবাদ মূলানুগত, কিন্তু উহা বুঝিতে হইলে মনে মনে উহার সংস্কৃত তর্জ্জমা করিয়া লইতে হয়। আপনার অনুবাদ সব জায়গায় ঠিক literal না হইলেও we are carried away by your English. তিনি সম্মতির সুরে বলিলেন, 'Exactly so, আমিও তাহাই মনে করি।'

"রাজেন্দ্রলালের সমালোচকের দৃষ্টি খুব ছিল। লেখার ভালমন্দ বুঝিতে বা বিচার করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটা বড় মারাত্মক দোষ ছিল। কেহও যদি তাঁহার নিজের লেখার কোনো ভুল দেখাইত, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইতেন। কিন্তু আমিও ছিলাম নাছোড়বান্দা, তাঁহার রাগ বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। হয়ত পুঁথিতে এক কথা আছে, ভুলিয়া তিনি আর এক লিখিয়া বসিয়াছেন এবং প্রুফ্ দেখিবার সময় আমি তাহা ধরিয়াছি। রাজেন্দ্রলাল ত একেবারে চটিয়া আগুন। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—রাগিলেত হইবে না, পুঁথিতে যাহা নাই তাহা লিখিয়াছেন।

"এই বলিয়া পুঁথির পাতা খুলিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। খানিক পরে, গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'এখন উপায় ?' আমি তখন তাহাকে সংশোধন করিয়া লিখিতে বলিতাম। তখন তাঁহার রাগ জল হইয়া যাইত, সন্তোষের চিহ্ন দেখা দিত। লেখার দোষ বাহির করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহার মত সুন্দর ইংরাজী লিখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি হয়ত একটা ইংরাজী লেখা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেছি ; উহার যে অংশে দোষ তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি ; কিন্তু কি হইলে যে ঠিক হয় স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজেন্দ্রলাল ঠিক

[২. *Yoga-Sutra (Text and English Translation)*, **Editor and Translator : Rajendralal Mitra, 1881-83.**]

ধরিয়া ফেলিলেন এবং কাটিয়া কুটিয়া ভাষা এমন বদলাইয়া দিলেন যে, আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না।

"ইংরাজী রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার বেশ মনে আছে, বাবু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হইলে যখন বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন, কোনও কোনও দিন দেখিতাম, রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতার মত অনর্গল ইংরাজী বলিয়া যাইতেছেন, রাজকুমার বাবু লিখিয়া লইতেছেন এবং তাহাই হিন্দু পেট্রিয়টে পরে ছাপা হইয়া যাইতেছে। সে সময় রাজেন্দ্র-লালই উহার প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজে তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অধিকাংশ মতামতই এখন নূতন নূতন গবেষণার ফলে অসার বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচনা প্রতিভা এখনও দেশের লোকের আদর্শ হইয়া আছে।"

২.

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, "১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সম্মান সূচক এল. এল. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী তাঁহাকে এই উপাধি দান করেন। ইহার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই সম্মান পান নাই। উপাধি প্রাপ্তির খবর পাইয়াই রাজেন্দ্রলাল ভাবিলেন, শুভ সংবাদটা গৃহিণীকে একবার দিয়া আসি ; শুনিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার খুব আহ্লাদ হইবে।—সটান গৃহিণীর সকাশে গমন। ভুবনমোহিনী তখন সাংসারিক কাজকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই স্বামীর উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি নাকি কি একটা 'পায়া' পাইয়াছ ? রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—হাঁ, য়ুনিভার্সিটী আমাকে এল. এল. ডি. পদবী দিয়াছেন। ইহা একটা খুব বড় সম্মান। কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে পূর্ব্বে এ পদবী ঘটে নাই। ভুবনমোহিনী এল. এল. ডি'র অর্থ ঠিক বুঝিলেন না। খানিক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলেন. পদবী-টদবী বুঝি না, উহাতে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাই শুনি। রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—টাকা ত পাওয়া যাইবে না, উপরি এখন ৩০০ টাকা দিয়া গাউন তৈয়ারী করাইতে হইবে। রাজেন্দ্রলালের পত্নী সেকালের ইংরাজী ভাববর্জ্জিতা সরলা নারী। সম্মান অর্জ্জন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ডেরও বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহা তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আসিল না। বিস্মিত হইয়া স্বামীকে বলিলেন—টাকা পাওয়া যাবে না ? তবে অমনধারা 'পায়ার' কাজ নেই, ছেড়ে দাও।

"রাজেন্দ্রলাল পত্নীর কথায় ঈষৎ ক্ষুন্ন হইয়া অন্তঃপুর হইতে ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। এ গল্প আমরা পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম।

"কৃষ্ণদাস পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র একসঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কাজ করিতেন। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে উভয়ের মতে মিল হইত না। পাল মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতেন। যখন পেট্রিয়টে রাজেন্দ্রলালের দ্বারা ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রস্তাব লেখার দরকার হইত, কৃষ্ণদাস তাঁহার বাসায় গিয়া ধরিয়া বসিতেন। অগত্যা মিত্র মহাশয়ের কথামত তিনি লিখিয়া লইয়া যাইতেন। এই সকল লেখায় অবশ্য রাজেন্দ্রলালের নিজের মতই ব্যক্ত থাকিত। কিন্তু ছাপিতে দেওয়ার সময় কৃষ্ণদাস ঐ সকল প্রবন্ধের স্থানে স্থানে, ঠিক নিজের মতের সমর্থক হয় এমনি ভাবে ঈষৎ বদলাইয়া পেট্রিয়টে বাহির করিতেন। এই রকম মজা প্রায়ই হইত। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল ভারি চটিয়া যাইতেন এবং কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিতেন! অবশ্য তাঁহার রাগ কিছু স্থায়ী হইত না। কৃষ্ণদাসকে না হইলে তাঁহার চলিত না, রাজেন্দ্রলাল ভিন্ন কৃষ্ণদাসেরও অন্যগতি ছিল না।

"কৃষ্ণদাসকে লইয়া রাজেন্দ্রলাল কৌতুক করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চাপকানের সমালোচনাই কতদিন যে হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। যাঁহারা রাজেন্দ্রলালকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, বেশের পারিপাট্য তাঁহার খুব ছিল। তিনি অধিক দাম দিয়া চাপকান পিরান প্রভৃতি বেশ পছন্দসহি করিয়া প্রস্তুত করাইতেন। তিনি যে ঠিক বিলাসী ছিলেন তাহা নহে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে পরিষ্কৃত থাকিতে অপরকে পরিষ্কৃত দেখিতে ভালবাসিতেন। বাবু কৃষ্ণদাস পালের বেশের পারিপাট্যের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরও তাঁহার অল্পই ছিল। সর্ব্বদা কাজ লইয়াই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। রাজেন্দ্রলাল প্রায়ই আঙুল দিয়া কৃষ্ণদাসকে দেখাইয়া বলিতেন, 'এঁর এই যে চাপকানটি দেখছেন, এটি মান্ধাতার আমলের। লাটসাহেবের কৌন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রই ইঁহার অবাধ গতি। কাপড়-চোপড়ের উপর বাজে ব্যয় করা ইঁহার মোটেই অভ্যাস নেই।'—এরূপ পরিহাস কৌতুক রাজেন্দ্রলালের বৈঠকখানায় প্রায়ই চলিত।"

শাস্ত্রী মহাশয় একটু থামিয়া পরে বলিতে লাগিলেন, "একবার রাজেন্দ্রলাল আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন। সেই ঘটনার কথা বলিতেছি।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের Translation[৩] বাহির করিবার উদ্যোগ করেন। আমি তাহার কিয়দংশ লিখিয়া দিব, রমেশবাবু বাঙ্গালা দেখিয়া দিবেন এবং ছাপাইবার সমস্ত খরচ খরচা দিবেন এইরূপ বন্দোবস্তে কাজ আরম্ভ হয়। পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বেই শশধর তর্ক-চূড়ামণি 'বঙ্গবাসী'-তে লিখিলেন—রমেশবাবু ইংরাজী হইতে বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, যে ব্যাখ্যা একেবারেই আগ্রাহ্য। বেদের প্রত্যেক ঋকে গূঢ়ভাবে তিন প্রকার অর্থ আছে, নির্গুণ ব্রহ্মপক্ষে, সগুণ ব্রহ্মপক্ষে এবং সূর্য্যদেব পক্ষে।—এইরূপ মত প্রকাশ করায় আমিও 'বঙ্গবাসী'-তে লিখিতে শুরু করি। উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক এবং শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কটূক্তিও বেশ চলিতে ছিল। শেষ বঙ্গবাসী আমার লেখা আর লইলেন না। আমি 'ভারতবাসী'তে গেলাম। পূজার ভারতবাসীতে চূড়ামণি-ব্যাকরণ নামে আমার লম্বা এক প্রবন্ধ বাহির হইল। ছাপার দোষে, চূড়ামণি-ব্যাকরণ 'চড়ামণি-ব্যাকরণ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহার জন্য বড়ই দুর্গতি হইয়াছিল।

"পূজার পর আমি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ডান হাত লম্বা করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। আমি একটু থমকাইয়া গেলাম। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য আমি ঘুরিয়া তাঁহার বাম কর্ণের কাছে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণ অপেক্ষা বাম কর্ণে তিনি একটু বেশী শুনিতে পাইতেন। কানের গোড়ায় মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আজ এ কি? এ মূর্ত্তি কেন?

"রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, 'মূর্ত্তি হবে না! তুমি—তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভদ্র সমাজে বেড়াও, তুমি···কিনা মেছোনীদের মতন মেছোবাজারে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে লোকের সঙ্গে গালিগালাজ করছ! ভদ্রলোকের সমাজে তোমার বসা উচিত নয়।' আমি বলিলাম—চূড়ামণি যে বড় অন্যায় করছে। কতকগুলি ভুল প্রচার করছে। তিনি আরও রাগিয়া বলিলেন, 'ভুল প্রচার করছে, তাতে তোমার কি? তোমার একছত্র লেখায় উহার একশ পাতা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তা' জান? তুমি কিনা তার সঙ্গে সমান উত্তর করতে যাচ্ছ! আমার বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না।' আমি সভয়ে বলিলাম—এই ত, আর ত কিছু না। আচ্ছা এমন কর্ম্ম আমি আর করব না। তখন তিনি ঠাণ্ডা হইয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে এই ঘটনায় যে শিক্ষা

[৩. ঋগ্বেদ সংহিতা, ১৮৮৫-৮৭।]

দিয়াছিলেন তাহা আমি জীবনে ভুলিব না। সেই অবধি খবরের কাগজে আমাকে যতই গালি দিক্ না আমি তাহার কখনই জবাব দিই না। তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া যাইতেছি, উদ্দেশ্য আমার ঠিক আছে। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হইয়া থাকে যিনি উহা ভদ্রভাবে দেখাইয়া দেন আমি তাঁহার গোলাম হইয়া যাই। গালাগালি দিলে জবাব দিই না। আমি যে নিজেই এই কার্য্য করি তাহা নহে; আমার ছাত্রবর্গকেও এ কথাটি আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই।

"একবার গরমের ছুটিতে ওয়ার্ডের ছেলেগুলিকে বাড়ী পাঠাইয়া রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার নিকটে কাশীপুরের গঙ্গার ধারে, মতিঝিলের পশ্চিমে, মতিশীলেদের যে অনেকগুলি বড় বড় কুঠি ছিল তাহার একটিতে বাস করিতে লাগিলেন। আমায় বলিলেন, 'তোমার ত অনেকদূর হইবে, তুমি যাইবে কিরূপে?' আমি বলিলাম— দূর হইবে না। কাশীপুরে আমার এক মামী থাকেন, আমি তাঁহার কাছে কাশীপুরেই থাকিব। এইবার রাজেন্দ্রলালের নিকট সমস্ত দিন থাকিবার সুযোগ হইল। প্রায় সমস্ত দিনই তাঁহার কাছে থাকিতাম। তিনি সে সময় বোধ-গয়ার উপর তাঁহার বহি লিখিতেছিলেন। তাঁহার কাছে খুব চটাল চটাল প্রুফ্ আসিত। তিনি সেইগুলি নিজে দেখিতেন এবং আমাকেও দেখিতে বলিতেন। আমি তাঁহার কথা মত দেখিয়া দিতাম। বৌদ্ধদের গ্রন্থে গল্প আছে, এক স্ত্রীলোক শ্রাবস্তীতে আসিয়া বুদ্ধদেবের চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিয়া দিল। একদিন সেই লেখার প্রুফ্ রাজেন্দ্রলাল দেখিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। হাসিয়া বলিলেন, 'তা হলে শাক্য সিংহেরও ওসব দোষ ছিল। কেন না, যা রটে তা বটে।' আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—শুধু যে কলঙ্ক ছিল তা নয়, বোধ হয় একটু দোষও ছিল।

"তিনি কৌতূহলের সহিত বলিলেন, 'সে কি রকম?' আমি বলিলাম, অবদান কল্পলতার প্রথম গল্পে এ কথা আছে। আমি যাহাকে তখন প্রথম গল্প বলিয়াছিলাম, সেটা বাস্তবিক অবদান কল্পলতার ৫১ গল্প। এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে পুঁথি আছে, তাহাতে ঐ ৫১ গল্পেই বহি আরম্ভ হইয়াছে। রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস তিব্বত হইতে পুরা অবদান কল্পলতার পুঁথি আনিলে উক্ত গল্প যে বহির ৫১ গল্প তাহা প্রকাশ হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই দ্বিতীয় অংশেরই Notice করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের একবার একটা মূত্রকৃচ্ছ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, যে পূর্ব্বজন্মে তিনি একজন কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—তিক্তমুখ। শ্রীমান নামে এক ধনবানের পুত্রকে তিনি অনেকবার কঠিন পীড়া হইতে আরাম

করেন। কিন্তু সে লোকটা বড় দুষ্ট ছিল। পুত্রের পীড়া সারিয়া গেলে (ঠিক এখানকার লোকেরই মত) সে তাঁহাকে দর্শনী বা ঔষধের দাম বলিয়া কিছুই দেয় নাই। তাই ফের যখন তার পুত্রের অসুখ হইল, বুদ্ধদেব ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ দিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। সেই পাপেই তাঁহার একটা খারাপ ব্যারাম হয়।

"রাজেন্দ্রলাল বলিলেন, 'বুদ্ধদেবের রোগটা যত ঠিক, রোগের Explanation-টা তত ঠিক নয়।'

"আমি বলিলাম—শ্রাবস্তীতে সুন্দরী তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিল, শিষ্যদিগের নিকট বুদ্ধদেব তাহারও কারণ দেখাইলেন—পূর্ব্ব-জন্মে কি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে কারণে সুন্দরী তাঁহার বিরুদ্ধে কলঙ্ক আনিয়াছে।

"বুদ্ধদেব বলিলেন—পূর্ব্বজন্মে আমি বৈশ্য ছিলাম, আমার নাম ছিল মৃণাল। আমি ভদ্রা নামে এক বারবিলাসিনীকে রাখি। সর্ত্ত ছিল, সে আর কাহাকে তাহার কাছে আসিতে দিবে না। কিন্তু একদিন, অন্য এক পুরুষকে তাহার নিকটে দেখিয়া রাগিয়া সেই রমণীকে হত্যা করি। তাই এ জন্মে সুন্দরী আমার নামে কলঙ্ক রটাইতেছে।

"এই সকল কথা শুনিয়া রাজেন্দ্রলাল খুব হাসিলেন। তখন তাঁহার কাছে কলিকাতার দুই তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বসিয়া ছিলেন। তাঁহারাও বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দিনটা নানারকম গল্প গুজবে ও হাসিখুশিতে বেশ কাটিয়া গেল।"

৩.

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিল। খাটের উপর বিছানো ফরাসের উপর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলালের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। "সেকালের ১নং ওয়ার্ডে রাজেন্দ্রলাল অনেকবার কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটি, য়ুনিভার্সিটী এবং অন্যান্য সভায় শুধু যে তিনি বক্তৃতাই করিতেন, তাহা নয়, কাজও যথেষ্ট করিতেন। আবার অনেক সময় পেন্সিলে লিখিয়া কাগজের টুকরা মেম্বরদিগের নিকট পাঠাইতেন। তাহাতে অনেক ফুক্কুড়ি থাকিত। মেম্বররা যে সব সময়ে তাহা বুঝিতেন, তাহা নয়, অনেক সময় বুঝিতে পারিতেন এবং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। এমন

রসিকতা করার অভ্যাস তাঁহার খুব ছিল। বাহির হইতে তাঁহাকে গম্ভীর দেখা যাইত, তাঁহার যে সকল ছবি বাহির হইয়াছে তাহাতেও এই ভাবটিই ফুটিয়াছে, কিন্তু তিনি যে কিরূপ রসিক ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। কমিটিতে হারিলে রাজেন্দ্রলাল রাগ করিতেন না, রাগের কোনও লক্ষণও দেখাইতেন না, বরং অনেক সময় রসিকতা করিয়া দেখাইতেন যে, হারিয়াও তিনি হারেন নাই। একবার ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদের প্রার্থী হইয়া পশুপতি বসু ও রাজেন্দ্রলাল দাঁড়ান। রাজেন্দ্রলাল যাহাতে না হন, তাহার জন্য বসুজ মহাশয় কোনও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। অনেক উকিলের চিঠি ঝাড়িয়াছিলেন, ব্যারিস্টারকেও অনেক পয়সা দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালও ছাড়েন নাই, তবে পশুপতি বাবুর যোগাড়টা ছিল কিছু বেশী, কাজে-কাজেই রাজেন্দ্র হারিয়া গেলেন। এ সম্বন্ধে তিনি পরে একদিন বলিয়াছিলেন, 'কমিশনার হওয়ায় আমার কোনও স্বার্থ নাই। আমি শুধু কলিকাতাবাসীর জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারা যদি আমাকে না চায়, আমি আর দাঁড়াইব না। তাহাদের জন্য আমি যে সময়টা নষ্ট করিতাম, তাহা নানারূপ Good Work-এ ব্যয় করিব। আমার সংস্কৃত পুঁথির 'নোটিশ' প্রস্তুত করায়, ইতিহাস পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহি লেখায় একটা স্থায়ী ফল থাকিবে, কিন্তু মিউনিসিপালিটির কাজে কি ফল ?'

"য়ুনিভার্সিটীতে Croft[৪] সাহেবের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের খুব ঠোকাঠুকি হইত। বিপক্ষ দলের ভোট যখন বেশী থাকিত, তিনি অবশ্য হারিয়া যাইতেন। কিন্তু হারিয়াও বেশ শান্ত ও ধীর ভাবে চলিয়া আসিতেন। সময় সময় বিরুদ্ধবাদীদের দুই একটা ঠোকা দিতেও ছাড়িতেন না। ডাক্তার হোর্ণলি (A. F. R. Hoernle)[৫] Cathedral Mission কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং নিজেও একজন মিশনারি ছিলেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন, মিশনারিকে গবর্ণমেন্টে চাকুরী দেওয়া হইল এই কথা লইয়া রাজেন্দ্রলাল খুব আন্দোলন করেন। তাহাতে গবর্ণমেন্ট জবাব দিয়াছিলেন—His missionary character will remain in abeyance. ইহার উত্তরে রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'How-long ?' ছাত্রদের পক্ষ লইয়া তিনি অনেক সময় লড়িতেন। Entrance পরীক্ষায় যখন বছর বছর বিস্তর ছেলে ফেল হইতে

৪. [এই গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্র.]
৫. [এই গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্র.]

লাগিল, তখন তিনি Massacre of Innocent বলিয়া তুমুল আন্দোলন করেন।

"১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বপ্রথম একজন বাঙ্গালীকে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট করা হয়। অর্থাৎ Sir William Jones সোসাইটি পত্তন করিবার পর ঠিক একশ বছর চলিয়া গেলে একজন দেশীয় লোককে প্রেসিডেন্ট করা হইল। যে দিনের সভায় তিনি নির্ব্বাচিত হইলেন, সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখনও মেম্বর হই নাই, সোসাইটির প্রতাপ ঘোষ আমাকে সভায় টানিয়া লইয়া যান। দেশীয় অনেক মেম্বর উপস্থিত ছিলেন। কে কে ছিলেন, ঠিক মনে পড়িতেছে না, তবে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন বেশ মনে আছে। আমি সেই প্রথম সোসাইটির মিটিং-এ যাই। সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর রাজেন্দ্রলাল সমবেত সদস্যদিগকে ধন্যবাদ দিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাহার গোড়ার একটা ছত্র এখনও আমার মনে আছে। রাজেন্দ্রলাল উঠিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন, 'Though my abilities may be humble I yield to none in my interest to the Asiatic Society.' অনেক দিন পর্যন্ত সোসাইটির সভাপতিরা Annual advises দেন নাই, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ সভাপতি হইবার ঠিক একবছর পরে রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির বার্ষিক সভায় নূতন ধরণে একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি কানে শুনিতে পাইতেন না; সেইজন্য পুরা দুই বৎসর সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রায় সকল অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং বাদ প্রতিবাদে খুবই যোগ দিতেন। তাঁহার দৃষ্টি চারিদিকে ছিল। অশ্ববৈদ্যক সম্বন্ধে দুইখানি মাত্র বহির কথা লোকে জানিত, একখানি নকুলের আরখানি জয়দত্তের। রাজেন্দ্রলাল বিশেষ জিদ করিয়া সোসাইটি হইতে এই দুইখানি পুস্তক ছাপাইতে বলেন। তিনি খবর দেন যে, অশ্ববৈদ্যকের প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ শালিহোত্রের অশ্বশাস্ত্র আর পাওয়া যায় না; বোগদাদে উহার তর্জ্জমা হইয়াছিল, তাহার পার্শী তর্জ্জমা চলিত আছে। পার্শী হইতে হিন্দীতেও তর্জ্জমা হইয়াছে, কিন্তু মূল পুঁথি এখনও পাওয়া যায় নাই; অথচ অশ্বচিকিৎসককে সমস্ত ভারতময় শালিহোত্র বলে। শালিহোত্রের পুঁথি রাজপুতানায় পাওয়া গিয়াছে শুনিলে আজ তিনি আনন্দে বিহ্বল হইতেন। ইংরাজী কোন্ সাল মনে নাই, এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধক্রমে জর্ম্মানীর উরটামবার্গের (Wurtemberg) খ্যাতনামা পণ্ডিত জলী[৬] (Prof. Jolly) মনুটীকা সংগ্রহ নামে এক পুস্তক ছাপাইতে সুরু করেন।

৬. [এই গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্র.]

পুস্তকখানি আর কিছু নয়, বাদ প্রতিবাদ, বিচার বিতন্ডা ছাড়িয়া দিয়া কোনু টীকাকার মনুর শ্লোকের কি অর্থ করিয়াছেন তাহাই উক্ত পুস্তকে সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি চারি পাঁচখানি টীকার অনুযায়ী চারি পাঁচ রকম অন্বয় ও প্রতিবাক্যও দিতেছিলেন। তিনটি অধ্যায় মাত্র শেষ হইয়াছে, এমন সময় বোম্বাই সহরের প্রসিদ্ধ উকীল মান্ডালিক মহোদয়ের সাত টীকাশুদ্ধ মনু বাহির হইয়া গেল। রাজেন্দ্রলাল অমনি বলিলেন, জলীর মনুটীকা সংগ্রহ আর ছাপা হওয়া উচিত নয়। উনি ত কেবল চুম্বক দিতেছেন, পুরো পুঁথি ছাপা হইয়া গেল, তাঁহার চুম্বকের এখন আর কোনও কদর রহিল না। সুতরাং মনুটীকা সংগ্রহ ছাপা বন্ধ হইয়া গেল। এশিয়াটিক সোসাইটি শাঙ্করভাষ্য ও তাহার টীকা ভামতি ছাপাইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বছর পরে হোর্ণলি সাহেবের কাশীস্থ কোনও বন্ধু ভামতীর টীকা কল্পতরু ও তাহার টীকা পরিমল ছাপাইবার প্রস্তাব করেন। হোর্ণলি সাহেব একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, সোসাইটিতে তুমি এই প্রস্তাবের সপক্ষে নোট্ দাও। আমি তাঁহার কথামত নোট্ দিলাম কল্পতরু কি, পরিমল কি, বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম, যখন ভামতী ছাপা হইয়াছে, এ দুইখানিও ছাপান উচিত। আমার minute দেখিয়া রাজেন্দ্রলাল অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। আমিও দৈবক্রমে সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত। তিনি আমায় বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, তুমি এ কি কাজ করিয়াছ? দেখ আমার ইচ্ছা—যাহাতে তোমার একটু নামপসার হয়। কিন্তু তুমি এমনই লিখিয়াছ যে, বাধ্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধে minute দিতে হইতেছে।'—আমি বলিলাম, 'কল্পতরু, পরিমল তো বেশ বই, আপনি ইহার বিরুদ্ধ হইতেছেন কেন?' —তিনি বলিলেন, 'আমরা বুঝি বসিয়া বসিয়া কেবল বেদান্তই ছাপিব? কেন? আর বুঝি দর্শন শাস্ত্র নেই?' তিনি আমার বিরুদ্ধে minute দিলেন, তাঁহার কথাই বজায় রহিল।

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একবার একটা চাকুরীর উপরোধপত্র লইবার জন্য আমি বৈদ্যনাথে রাজেন্দ্রলালের কাছে যাই। সকালে বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইয়া তীর্থের কাজ সারিয়া পান্ডার বাটীতে নিদ্রা গেলাম। বিকালে পান্ডা কোশল্যা নদীর ওপার হইতে রাজেন্দ্রলালের বাটী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি কোশল্যা নদী পার হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বাটীর যে দিকে গিয়া উঠিলাম, বাটীর সদর দরজা ঠিক তাহার বিপরীত। বাটীখানি পঁয়ত্রিশ বিঘা জমির উপর—একতলা, মাঝে একটা হল, চারিকোণে চারিটা ঘর, অর্থাৎ ঠিক বাংলা প্যাটার্ণের। আমাকে দেখিয়া রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বিস্মিত হইলেন।

আমাকে বলিলেন, 'তুমি এখানে ?···এখন ত গাড়ীর সময় নয় ? তবে কোথা হইতে আসিলে ?' আমি বলিলাম—'সকালে আসিয়া পান্ডার বাসায় ছিলাম।'—তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। যে কয়টি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইনি বোধ হয় আমাদিগের বাটীতে খাইতে চাহেন না, তাই পান্ডার বাটীতে অতিথি হইয়াছেন। কিন্তু আজ যখন আমার বাটী আসিয়াছ, আমিও তোমাকে ছাড়িব না।'—ইহার উপর আর কথা চলে না, রাজেন্দ্রলালের আতিথ্য লইলাম। যতক্ষণ তাঁহার বাটীতে ছিলাম, তিমি আমাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমি আসিয়াছি বলিয়া ভাল ভাল ব্যঞ্জন রাঁধাইলেন। কলিকাতা হইতে ভাঙন মাছ সংগ্রহ করা ছিল, তাহাও ফরমাইস মত রাঁধাইলেন। বৈদ্যনাথের পেঁড়া প্রভৃতিও আনান হইল। রাত্রিতে আহার হইয়া গেলে নিজে দাঁড়াইয়া একটি কোণের ঘরে বিছানা করাইয়া দিলেন, মশারিটি পর্যন্ত কিরূপে খাটান হইল, তাহার তদারক করিলেন। আমাকে শুইতে বলিয়া, কিরূপে দরজা বন্ধ করিতে হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। সকাল বেলা রাজেন্দ্রলাল উঠিয়া পেন্টুন, চাপকান পরিলেন এবং পকেটে কতকগুলি কি পুরিয়া লইয়া আমাকে বলিলেন—'চল, বেড়াইয়া আসি। তোমার চাকুরীর জন্য পত্র তোমার হাতে দিব না, ডাকে তোমার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিব।' রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাহার পর বেড়াইতে বাহির হইলাম। তিনি অনেকের বাটীতে গেলেন। বাটীতে ছোট ছেলে দেখিলেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং পকেট হইতে একটা পাখী বা অন্য কোনও খেলনা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে খেলনা পাইয়া আহ্লাদে খুব হাসিতে লাগিল, তিনি তাহার গাল টিপিয়া দিলেন। এইরূপে পাঁচ ছয় বাটীতে দশ বারোটি খেলনা দিতে দিতে তাঁহার পকেট খালি হইয়া গেল। তিনি ছোট ছেলেপিলেকে এত ভালবাসিতেন এবং তাহাদিগকে পাইলে এত খুশি হইতেন তাহা পূর্বে জানিতাম না।

"আমি ত সেইদিনই বৈদ্যনাথ হইতে চলিয়া আসিলাম। চলিয়া আসিবার পর এবং আমার চাকুরীর জন্য রাজেন্দ্রলালের উপরোধপত্র লিখিবার পূর্বে তাঁহার কোনও বিশেষ বন্ধু শুনিলাম, পশ্চিম হইতে আসিয়া দেওঘরে পেঁছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলালের নিকট বিশেষ রূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, আমি একজন Good-for-nothing লোক। তাঁহার আদত মতলব ছিল এই যে, আমি যে কাজের প্রার্থী, সেই কাজের জন্য তাঁহার কোনও আত্মীয়ের হইয়া রাজেন্দ্রলাল উপরোধ করেন। রাজেন্দ্রলাল তাহাতে বলেন, 'সে কেমন

করিয়া হইবে ? আমি যে তাহাকে আশা দিয়াছি এবং সে আমার অনেক কাজ করিয়া দেয়। আমি তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের জন্য চিঠি কেন দিব ?'—যে চাকুরীর জন্য তিনি পত্র দেন, সে চাকুরী আমার হয় নাই, তাহার অর্ধেক মাহিনার আর একটা চাকুরী হইয়াছিল। কিন্তু এখানে খাটুনি ছিল কম, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইত এবং নানারূপ বহি পাওয়ারও সুবিধা হইত। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে একদিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি হইল ?'—আমি বলিলাম, 'সে চাকুরী হয় নাই কিন্তু আপনার পত্র ত অব্যর্থ, আর একটি হইয়াছে, ইহার বেতন তাহার অর্ধেক।'—এই চাকুরীর কি কি সুবিধা, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম, তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, 'তা বেশ হইয়াছে। ইংরাজীতে বলে, Half is often greater than the whole. তোমার পক্ষে সে কথাটি খুব খাটিয়া গেল।'

"১৮৮৯ সালে রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার পীড়ার সময় তুমি আমার এই Notice-এর কাজটা কর।'—অর্থাৎ তিনি যে Notice of Sanskrit Manuscript করিতেছিলেন, তাহার ভার আমার উপর দিলেন। আপীস তাঁহার বাটীতেই রহিল। আমি মাঝে মাঝে গিয়া পণ্ডিত মহাশয়দের কাজ তদারক করিয়া আসিতাম এবং প্রুফ্‌ও দেখিতাম। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলালের দেহত্যাগ হইল। সোসাইটির মেম্বরগণ তাঁহার নোটিশ ছাপাইবার ভার আমাকে দিলেন। একটি খণ্ড শেষ হইয়াছিল, সেটি বাহির হইল, আমার নামেই বাহির হইল। সেই নোটিসের একখণ্ড কেম্ব্রিজে পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার অফ্রেক্ট (Dr. Aufrecht)[৭] নিকট পৌঁছিলে তিনি আমায় যে পত্র লিখেন, তাহাত সেদিন তোমাকে দিয়াছি।"

কিছুদিন পূর্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের নৈহাটী বাটী হইতে ডাক্তার অফ্রেক্টের পত্র উদ্ধার করিয়াছিলাম। উহা ১৮৯৩ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে লিখিত। উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—"Trust you will successfully continue the work Late Lamented Rajendralala had done up to the end of the 9th Vol.

ন সাধবঃ কদাচিশ্মিয়ন্তে।"

৭. [Theodor Aufrecht (১৮২২-১৯০৭)]

রাধাগোবিন্দ বসাক

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত আমার ব্যক্তিগত সংযোগ যত

ভারতবর্ষে বহুমুখী প্রতিভা লইয়া যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বাঙলা প্রদেশের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তন্মধ্যে অন্যতম। নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও প্রখর স্মৃতিশক্তি লইয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ আরও পূর্বে ঘটিতে পারিলে আমি জ্ঞান ক্ষেত্রে অধিকতর লাভবান হইতে পারিতাম।

ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে তৎকালে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার এক বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি যেমন ছিলেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, তেমনি পূর্ব অঞ্চলে ছিলেন বাঙালী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই সব ব্যক্তিই ছিলেন ভারতীয় বিদ্যার গবেষণা কার্যের পথিকৃৎ। আমাদের স্কুল কলেজে পাঠ করার সময় হইতেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম শুনিতাম। তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণা দপ্তরের অন্যতম কৃতী কার্যকারী ভারত সন্তান—তাঁহাদের কার্যকেন্দ্র ছিল তাৎকালিক এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল। প্রাচীন স্বল্পজ্ঞাত গ্রন্থাদি তাঁহারা পাঠ করিয়া সেগুলির তাৎপর্য গ্রন্থাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতেন। প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিকে যাঁহারা লক্ষ্য রাখিতেন ও তদ্‌বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে প্রয়াস পাইতেন তাঁহারাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া উপকৃত হইতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্যতম প্রধান কার্য ছিল প্রাচীন পুঁথি সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ও অন্যান্য ছাত্র-পণ্ডিতদিগের সহায় লইয়া তৎকার্য করান। সে যাহা হউক, শাস্ত্রীর সম্বন্ধে এইসব কথা পরোক্ষভাবে জানিতাম ও শুনিতাম। তখন আমাদের বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক নয়।

এখন একটু অর্ধপরোক্ষ-জ্ঞাত বিষয়ে লিখিতেছি। আমি সংস্কৃতে এম. এ. পড়িতে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। ইং ১৯০৬-০৭ সালে আমাকে সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির সময়ে বাধ্য হইয়া কলিকাতা আসিতে হইল। কারণ, ঢাকা কলেজে অশোক অনুশাসন পড়াইবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কলিকাতায় অল্পকালের জন্য আসিয়া আমার প্রাক্তন অধ্যাপক ৺হরিনাথ দে মহাশয়ের নিকট বুইনারের ভারতীয় প্রাচীন অক্ষর তালিকা হইতে অশোকের সময়ের ব্রাহ্মীলিপি শিখিয়া লইলাম। এই সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদিগকে অশোক লিপিমালা পড়াইতেন এবং তৎবিষয়ে অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা টিপ্পনি লেখাইয়া দিতেন। সেই কলেজের এক ছাত্র-বন্ধুর অনুগ্রহে সেই সব লিখিত বৃত্তান্ত আমি নকল করিয়া ঢাকায় ফিরিয়া যাই। বলা বাহুল্য, সে সব টীকাদি আমার অশোক লিপি পাঠের অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল। স্বর্গীয় শাস্ত্রীর নিকট এই আমার প্রথম প্রচ্ছন্ন ঋণ।

তারপর যখন ইং ১৯০৮-১০ সাল পর্যন্ত আমি তাৎকালিক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আমার অধ্যাপক হরিনাথ দে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ইস্টবেঙ্গল ও আসাম গর্ভনমেন্টের রিসার্চ স্কলার নিযুক্ত হইয়া কাজ করি, তখন হইতেই অধিকতর ভাবে শুনিলাম যে পরবর্তী কালে মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কর্তা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি গবেষণাগোষ্ঠী তৈয়ার করিতেছেন। নানারূপ ভারতীয় ও বঙ্গীয় প্রাচীন ইতিহাস, তাম্রলিপি, প্রস্তরলিপি, প্রাচীন-পুঁথি প্রভৃতি লইয়া গবেষণার কেন্দ্র করিয়াছিলেন। গর্বমূলক একটা ভ্রান্তি এই গোষ্ঠীর ভিতর লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাঁহাদের ভ্রান্তিটি হইল যে, বিদ্যাবন্টনে তাঁহারা যেন অনেকটা বিমুখ ছিলেন। কাজেই দেশে প্রতিযোগিতার সূত্র দেখা না দিয়া পারে না। আমি স্বয়ং সেই গোষ্ঠীর সভ্য হই নাই। তৎপর আমি ইং ১৯১০ সালে ঢাকা কলেজে অস্থায়ী লেকচারার নিযুক্ত হইয়া এবং ইং ১৯১১ সালে রাজসাহী কলেজে পাকা লেকচারার হইয়া চলিয়া যাই। ইং ১৯১১ সালে রাজসাহীতে যাইয়া দেখি সেখানে পূর্ব বৎসর (ইং ১৯১০ সালে) 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি' নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছে। এই সমিতির কর্ণধার ছিলেন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (পরে সি. আই. ই.), ইহার সম্পাদক ছিলেন নির্ভীক লেখক রমাপ্রসাদ চন্দ (পরে রায়বাহাদুর) এবং ইহার সভাপতি ও অর্থসহায়ক ছিলেন দিঘাপতিয়ার রাজকুমার, শরৎকুমার রায়। ইং ১৯১১ সালে আমি রাজসাহী কলেজে গেলে পর সমিতি আমাকে গ্রন্থরক্ষক

নিযুক্ত করিয়া সমিতির সভ্য করিয়া লইলেন। বন্ধুবর ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল কিছু পরে ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া রাজসাহী আসিলে তিনিও সমিতির একজন কর্মী সভ্য হইয়া উঠিলেন। বাঙলার ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন যে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে সমস্ত প্রাচীন বাঙলা ভাষার নিদর্শন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ ছিল সংস্কৃতে লেখা—ইহার নাম বারেন্দ্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত প্রসিদ্ধ "রামচরিত" গ্রন্থ। ইহা একটি দুরূহ শ্লিষ্ট কাব্য—কবির বিদ্যাকৌশলে ইহার প্রতি শ্লোকই দ্ব্যর্থক। রামচরিতের 'রাম' দুইটি রামকে বুঝায়, রঘুপতি রামচন্দ্র ও পাল রাজবংশের গৌড়াধিপ রামপাল। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে Memoirs ইং ১৯১০ সালে প্রকাশ করিয়া ইহার ক্লেশসাধ্য পাঠসমূহ বিদ্বৎসমাজে প্রকাশিত করেন, তদবলম্বনে বহু সমসাময়িক মাসিক পত্রিকাতে ইহার আলোচনা হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ডিরেক্টর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় রামচরিতের স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া পাল রাজগণের ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কার পূর্বক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎকালিক ভাইসচ্যান্সেলর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া সিনেট হলে বক্তৃতা করেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের গোষ্ঠী তাহাতে তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হইয়াছিলেন। দুইটি কেন্দ্রের প্রতিযোগিতা যেন তখন উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পরিচালিত 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকাতেই উভয় দলের প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তদানীন্তন বাঙলা দেশে উত্তরে রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও দক্ষিণে কলিকাতায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরিচালিত গোষ্ঠী—এই দুই প্রতিষ্ঠানই প্রাচীন ইতিহাসের চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া ভারতের ও বিশেষতঃ বাঙলা দেশের প্রাচীন ইতিহাসের নব নব সব তথ্য প্রকাশ করিয়া শিক্ষা-জগতে একটা ইতিহাসের আলোচনার প্রবর্তক দলের সৃষ্টি করেন।

এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগের বিষয় কিছু জানাইতেছি। অনেকেই হয়ত জানেন যে, ইং ১৯২১ সালের ১লা জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। কয়েকটি বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক প্রায় ১৫ই জুন হইতেই নিযুক্ত হইয়া বিভাগীয় কাজকর্মের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এইচ. ই. স্টেপলটন সাহেব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির প্রাথমিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষক। আমিই রাজসাহী কলেজ হইতে ১৫ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র লেকচারার নিযুক্ত হইয়া ঢাকাতে যাই।

সেই ১৫ দিনের মধ্যেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরকারী অধ্যাপনা হইতে ইতিপূর্বে অবসরপ্রাপ্ত হইলেও, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব বুঝিয়া তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙলা বিভাগের প্রফেসর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা হইতে আসিলেন পণ্ডিত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, এম. এ. লেকচারার রূপে এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আসিলেন সহকারী লেকচারার রূপে। আমি ছিলাম বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভ্য, আর অপর দুইজন ছিলেন শাস্ত্রীর স্বগোষ্ঠী-ভুক্ত। কিন্তু ঢাকার এই মিলনক্ষেত্রে শাস্ত্রীর মহানুভবতায় পূর্ব বিরোধের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিল। শাস্ত্রী তখন আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষুতে দেখিতেন। এই সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি যে-যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছিলাম তাহাও এই স্থানে লিখিব। শাস্ত্রীর নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়। এখন আমার বয়স ৯১ বৎসর চলিতেছে, কিন্তু এখনও শাস্ত্রীর স্নেহ ও লেখাপড়ায় প্রোৎসাহন আমি ভুলি নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও এম. এ. সংস্কৃত বিষয়ক পাঠ্য-তালিকাতে শাস্ত্রী মহাশয় বহুদর্শিতার ফলে আনিলেন কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক শাসনলিপি, পালি ও প্রাকৃতের পাঠাবলী। এই সব বিষয় পড়াইবার ভার পড়িল এই লেখকের উপর। বাস্তবিকই এইসব ভাষার ও প্রাচীন ঐতিহাসিক লিপিসমূহের বিবরণ না জানা থাকিলে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যাসমূহের ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিষ্কার জ্ঞান হয় না। আমি যথাসাধ্য শাস্ত্রীর আদেশ মান্য করিয়া সে সব ভাষার ভিতর একটু অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বকর্তব্য পালনে অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষাকার্যে মনোযোগী হইয়াছিলাম। ভবিষ্যতে যদি আমি কোনো কোনো বিশিষ্ট বিষয়ে আমার অবসর সময়ে কার্য করিয়া থাকি, তবে সেসব কাজের ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শাস্ত্রী মহাশয় এক বৎসর আমাকে অধ্যাপক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ইতিহাস বিভাগে এম. এ. শ্রেণীতে প্রাচীন অনুশাসন লিপি পড়াইতে অনুমতি দেন। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে ক্লাসে ছাত্রদিগকে যে সব টীকা-লক্ষ্মী বলিতাম— সেগুলিই পরে আমার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর মূলীভূত তথ্য। কাজেই শাস্ত্রীর বিহিত অনুগ্রহে উৎসাহিত হইয়া তখনকার নবীন বয়সে আমি জ্ঞান সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলাম। অতঃপর শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অল্পকাল পরে অবসর নিলেই—তাঁহাকে সেই বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট্ উপাধি দ্বারা ভূষিত করিবার জন্য ঢাকায় নিমন্ত্রণ করিয়া নেন। আবার ইং ১৯২৮ সনে পঞ্জাবের লাহোরে প্রাচ্যবিদ্যার যে সম্মেলন হয়—সেখানে আমরা কয়েকজন বাঙালী শিক্ষক সমবেত হই এবং শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যের জয় ঘোষণা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

পূর্বে উল্লেখিত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যের প্রথম সংস্করণ যেন ছিল ইং ১৯১০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত Memoirs। ইহার পরে সংঘটিত বাগবিতণ্ডার কথা বাদ দিয়া বলিতেছি যে ইং ১৯৩৯ সালে রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি শাস্ত্রীর গোষ্ঠীর পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভ্য এই লেখক এবং নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বারা একটি ইংরেজী-সংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরে ইং ১৯৫৩ সালে আমি রামচরিতের একখানা বাঙলা সংস্করণ কলিকাতা হইতে প্রকাশ করি। আবার আমার ভাগ্যচক্রের ঘূর্ণনে ইং ১৯৬৯ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি আমার ৮৩ বৎসর বয়সের সময়ে আদেশ করেন যে শাস্ত্রীর রামচরিতের উপরিলিখিত সেই প্রাচীন Memoirs ('1910) আমাকে একটি নূতন সংস্করণরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই যেন রামচরিতের চতুর্থ সংস্করণরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। ইহা একটি ইংরেজী সংস্করণ এবং ইহা বহু কষ্টে ইংরেজীতে লিখিত টিপ্পনী-বহুল সংস্করণ। স্বর্গীয় শাস্ত্রীর আশীর্বাদে আমি কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সোসাইটির আদেশ উদ্‌যাপন করিয়াছি।

স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকে প্রণাম করি। একটি কথা লিখিতে ভুলিয়াছি—শাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত রসিকতা-প্রিয় ছিলেন—তিনি গল্প করিয়া সন্নিহিত লোকদিগকে হাস্যরসে আপ্লুত করিতে পারিতেন।

৬. ৪. ১৯৫৭

রমেশচন্দ্র মজুমদার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হই তখন ইতিহাসের পাঠ্য-সূচীর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। সে সময় এম. এ-তে আটটি পেপার ছিল, এর মধ্যে দুটি ছিল ঐচ্ছিক। এই ঐচ্ছিক পেপার বিশেষ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। আমাদের সময়েই সর্বপ্রথম এই তালিকায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়।

সেবার ভাল ছাত্ররা বড় কেউ এই পেপারটি নিল না, কারণ এটি সম্পূর্ণ নতুন। আমি এটি বেছে নিই। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জে. এন. দাশগুপ্ত মশায় এই বিষয়টি পড়াতেন। তিনি নিজেই বলতেন যে তিনি অক্সফোর্ডের ছাত্র, এ বিষয়ে কিছু জানেন না। ক্লাসে এসে কেবল তিনি ভিনসেন্ট স্মিথের লিখিত অশোকের লিপির অনুবাদ পড়ে যেতেন। ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে। তাঁরা তখন নীলমণি চক্রবর্তী নামে সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপককে এই বিষয়টি শেখানোর জন্যে নিযুক্ত করেন। সপ্তাহে দুদিন তিনি ক্লাস নিতেন। নীলমণিবাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁর অধীনে গবেষণা করতেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে যা শেখবার তা এই নীলমণিবাবুর কাছেই আমি শিখি। তাঁর নির্দেশমত কয়েকখানি বই পড়ে যা-কিছু জ্ঞান অর্জন সম্ভব তা করেছিলুম। আমার পরীক্ষার ফলও খুব ভাল হয়। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। পরীক্ষার ফল বেরুবার পর বললেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে তুমি কিছুদিন গবেষণা কর। শাস্ত্রী মশায়কে আমি চিনতাম না। তিনি আমাকে একদিন পটলডাঙ্গা

স্ট্রীটে শাস্ত্রী মশায়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় ইজি-চেয়ারে বসে একখানা সংস্কৃত পুঁথি থেকে কি বলে যাচ্ছেন আর একজন পন্ডিত (ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ) তা লিখে নিচ্ছেন। পরে শুনি তিনি নেপাল থেকে যে পুঁথি এনেছিলেন তার বিস্তারিত তালিকা এভাবে তৈরি করছেন। তিনি বলে যান, পন্ডিত তা লিখে নেন।

নীলমণিবাবু আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, এ খুব ভাল ছেলে। আপনি একে গবেষণায় সাহায্য করুন। শাস্ত্রী মশায় কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আশুর ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছ? উত্তরে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার গবেষণা করে কিছু লাভ হবে না। ওখানে গবেষণার কোনো আদর নেই। তুমি চাকরির চেষ্টা কর। এই রকম অনেক কথা বলার পর অবশেষে নীলমণিবাবুর বিশেষ অনুরোধে তিনি আমাকে কতকগুলি বই-এর নাম বললেন, আমি লিখে নিলাম। এগুলি পড়ে আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি এই কথা বলে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। এরপর কিছুদিন আমি শাস্ত্রী মশায়ের কাছে যাতায়াত করতাম। বইগুলি ঠিকমত পড়েছি কিনা তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন।

১৯১৩-১৪ সালে চাকরি পেয়ে আমি ঢাকায় চলে যাই। কাজেই ঐ গবেষণা কাজ আর বেশি দূর এগোয়নি, নিজের চেষ্টায় যেটুকু পেরেছি পড়াশোনা করেছি। এর বছর দুই পরে আমি লেকচারার হয়ে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলাম। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা করতেন এমন আরও কয়েক-জনের সঙ্গে মিলে আমরা একটি দল গঠন করি। ডঃ রামকৃষ্ণ দেবদত্ত ভাণ্ডারকর কারমাইকেল প্রফেসার হয়ে এলেন। অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালও এলেন। কাজেই আমাদের দলটি বেশ ভারি হয়ে উঠল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের কাছে পড়াশোনা করতেন। কি কারণে জানিনা শেষে দুজনের মধ্যে আর সদ্ভাব ছিল না।

এই সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের খুব আধিপত্য ছিল দুটি জায়গায়—এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। তাঁর দু'জন প্রধান সহযোগী ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। এঁদের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রণালী ছিল একটু প্রাচীন ধরনের। এঁরা হস্তলিপিতে বেশি বিশ্বাস করতেন, শিলালিপি বা তাম্রশাসন ভাল জানতেন না, এর উপর খুব নির্ভরও করতেন না। এই নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধে। প্রধান উপলক্ষ্য ছিল—কুল শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা।

বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে আদিশূর নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ এদেশে এনেছিলেন। এঁদের বংশধরেরাই নাকি এখানকার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থ। কিন্তু রাজা আদিশূর বা এই কাহিনীর কোনো বিশ্বস্ত পরিচয় তখনও জানা ছিল না, আজও জানা যায় নি। এই বিষয়টি নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের দলের সঙ্গে আমাদের দলের বেশ বিরোধ ছিল। নগেন বসু অনেক পুঁথি সংগ্রহ করতেন, লোকে বলত এর অনেকগুলি জাল বা কৃত্রিম। আদিশূরের ব্যাপার নিয়ে যখন তর্ক আলোচনা প্রবল আকার ধারণ করেছে তখন হঠাৎ একদিন নগেন বসু ঘোষণা করলেন যে কোটালিপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তিনি একখানি পুঁথি দেখেছেন তাতে রাজা আদিশূরের কাহিনী বলা আছে। আমরা বললাম ঐ পুঁথি দেখতে চাই। নগেনবাবু বললেন যে সেটির মালিক এক ব্রাহ্মণ বিধবা, তিনি কিছুতেই সেটি হাতছাড়া করতে রাজি নন।

এই সময় রাজসাহীতে কয়েকজন ঐতিহাসিক—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক দীঘাপতিয়ার জমিদার কুমার শরৎচন্দ্র রায়ের আর্থিক সাহায্যে ও ব্যক্তিগত সহায়তায় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি[১] গঠন করেন। এই সমিতি অনুসন্ধান করে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু মূল্যবান শিলালিপি ও মূর্তি সংগ্রহ করতেন। সমিতির সদস্যারা আধুনিক প্রণালীতে গবেষণা করতেন, সুতরাং তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। যখন রাজা আদিশূরের কাহিনী নিয়ে বিতর্ক চলছে তখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি গোপনে একজন অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণকে কোটালিপাড়ায় পাঠিয়ে ঐ পুঁথির প্রয়োজনীয় অংশ নকল করে আনবার ব্যবস্থা করেন। ঐ পুঁথিখানির নকল দেখে আমরা বুঝলাম যে নগেন বসু আদিশূর সম্পর্কে যে কটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তার কোনোটিই তাতে নেই। এই খবরটি গোপন রেখে আমরা দাবি করলাম যে একদিন একটি প্রকাশ্য সভা ডাকা হোক—তাতে রাজা আদিশূরের কাহিনী বিচার হবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় রাজি হলেন। সভার তারিখ স্থির হল। ইতিমধ্যে কেমন করে জানিনা আমাদের পুঁথি নকল করার গোপন খবরটি ফাঁস হয়ে যায়। তখন তাঁরা সভার অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

এর ফলে শাস্ত্রী মশায় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উপর ভয়ানক রুষ্ট হলেন এবং আমাদের দলের উপরেও ক্রোধ প্রকাশ করেন। তাঁর একটি উক্তি আজও আমার মনে আছে: রাখাল, রমেশ—এরা সব পাথুরে প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করবে না। ঐতিহাসিক তথ্য বের করলেই বলবে, প্রমাণ কৈ,

১. [১৯১০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।]

প্রমাণ কৈ। এদের জ্বালায় আমি ইতিহাস লেখা ছেড়ে 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস লিখতে শুরু করেছি। এবার প্রমাণ খোঁজ।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উপর তিনি কিরূপ বিরক্ত ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। একবার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচীন পুঁথির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। শাস্ত্রী মশায় নেপাল থেকে 'রামচরিত' নামে বিখ্যাত পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। এখন সকলেই জানেন বাঙলার ইতিহাসের পক্ষে এই পুঁথিখানি কত মূল্যবান। এতে রাম পালের রাজত্বের কথা বলা হয়েছে এবং প্রাচীন বাঙলার একটি অজ্ঞাত কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই গ্রন্থ থেকেই আমরা জানতে পারি। কিন্তু এই গ্রন্থের আর কোনো পুঁথি তখনও জানা ছিল না, আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই প্রদর্শনী শেষ হবার পর যখন জানা গেল রামচরিত পুঁথিখানি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন খুব সোরগোল পড়ে গেল। আমি তখন এশিয়াটিক সোসাইটি কাউন্সিলের সদস্য ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে শাস্ত্রী মশায় অম্লানবদনে বললেন—বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যে এই পুঁথি চুরি করেছে তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই এবং পুলিশের সাহায্য ছাড়া পুঁথি উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। সদস্যরা বললেন যে, কোনো প্রমাণ যখন নেই অযথা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ওপর দোষারোপ করা উচিত হবে না। শাস্ত্রী মশায়ের মতের কোনো পরিবর্তন হল না। তারপর একদিন অকস্মাৎ ঐ এশিয়াটিক সোসাইটির একটি ঘরের এক কোণে বই-এর স্তূপের মধ্যে ঐ পুঁথিখানি পাওয়া গেল। তারপরেও শাস্ত্রী মশায় বলে বেড়াতেন যে চুরি ঠিকই হয়েছিল, তবে পুলিশের ভয়ে তারা সেটি ফেরত দিয়ে গেছে। এইসব কারণে শাস্ত্রী মশায়ের দলের সঙ্গে আমাদের দলের বিশেষ বনিবনা হয় নি।

এরপর ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমি ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হই এবং শাস্ত্রী মশায় সংস্কৃতের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ঢাকায় আবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়। সে সময় ঢাকা শহরের বাইরে রমনার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে কয়েকটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছিল। তারই একটিতে শাস্ত্রী মশায় থাকতেন, আমিও থাকতাম কাছাকাছি আর একটি বাড়িতে। আমাদের পরস্পর প্রায়ই দেখা হত। শাস্ত্রী মশায় পুরনো বাদ বিসম্বাদের কোনো কথা তোলেননি। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই সম্প্রীতি ছিল। প্রায়ই আমি তাঁর বাড়িতে যেতাম। তিনিও মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসতেন।

আমার বাড়িতে তাঁর প্রথম দিনের আসার কথাটি আজও মনে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্যে তিনি কলিকাতা থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই গাড়ি চড়ে তিনি আমার বাড়িতে এলেন। বাড়িতে ঢুকেই খুব জোরে ডাক দিয়ে তিনি বললেন—তোমার বাড়িতে এত সজনে গাছ আমায় বলনি। কাল থেকে সজনে ফুল ও ডাঁটা মাঝে মাঝে আমায় পাঠাবে। এখানে এসে কোথাও এ গাছ খুঁজে পাইনি। বুড়ো বয়সে এক একটা জিনিসের প্রতি খুব লোভ থাকে। তুমি বাঙাল, এর মর্ম কি বুঝবে? যাই হোক তাঁকে সজনে ডাঁটা পাঠাতে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যাওয়ার ফলে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা খুব বৃদ্ধি পায়। দেখা হলে তিনি অনেক পুরনো কাহিনী—কতক ঐতিহাসিক, কতক নিছক গল্প—বলতেন। বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল, শুনতে খুব ভাল লাগত। একটি গল্পের কথা বলি। এক জনের বাড়িতে অনেক বই ছিল। তার এক বন্ধু সেই দেখে একদিন তাকে বলল—তোমার মত আমারও অনেক বই ছিল, বন্ধু বান্ধবদের বই দিয়ে আমি আর তা ফেরত পাইনি। তুমি এত ভাল লাইব্রেরী করেছ, আমার পরামর্শ শোনো—কোনো বন্ধুকেই বই ধার দিও না। প্রথম বন্ধুটি হেসে বলল—সে বিষয়ে কোনো ভাবনা নেই। আমার এখানে যত বই দেখছ এর প্রায় সবই বন্ধুদের কাছ থেকে আনা। সুতরাং আমি যে বই ধার দেব না বুঝতেই পারো। এই কাহিনীটি বলেই শাস্ত্রী মশায় মন্তব্য করলেন—দেখ, বই চুরি করলে কোনো পাপ হয় না। আমি বললাম—আপনার এই শাস্ত্র বাক্য শুনে খুব খুশি হলাম। এরপর আপনার বাড়ি থেকে দুচারখানা করে বই নিয়ে আসব। আমার তো কোনো পাপ হবে না। শুনেই শাস্ত্রী মশায় বলে উঠলেন—ও, তোমার গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে। তোমার কাছে এ কথা বলা উচিত হয়নি। এই রকম অনেক গল্পের মধ্যে গুলিখোরের গল্প, গাঁজাখোরের গল্প মনে আছে।

শাস্ত্রী মশায় তখন বৃদ্ধ, বয়স বোধহয় সত্তর বছর। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে ঢাকায় তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত কাব্য তিনি এমনভাবে পড়াতেন যাতে ছাত্ররা সহজে কাব্যের রস গ্রহণ করতে পারে, ব্যাকরণের কচকচি থাকত না। এ কারণে তিনি ছাত্রদের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনায় তিনি আমার উপর হয়তো ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে একজন ডীন নির্বাচিত হওয়ার কথা। প্রথম নির্বাচনের সময় আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে দুএকজন শিক্ষক প্রস্তাব করলেন—শাস্ত্রী মশায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ, অতএব ওঁকেই ডীন করা উচিত। আর একদল শিক্ষক বললেন—নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক আইন

কানুন তৈরি করতে হবে, এত পরিশ্রমের কাজ ওঁর মত একজন বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরা আমাকেই ঐ পদের জন্য নির্বাচন করলেন। শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমারই জয় হয়।

এর অল্প কিছুদিন পরেই আমি কলকাতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জ্ঞান ঘোষ মশায়ের সঙ্গে কোনো প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করি। জ্ঞানবাবু আমাকে দেখেই বললেন, আরে তুমি করেছ কি হে! সেদিন তো আমাদের সিন্ডিকেট মিটিং-এ কর্তা (অর্থাৎ স্যার আশুতোষ) টেবিল চাপড়ে উল্লাস প্রকাশ করে আধঘন্টা কাটিয়ে দিলেন। কর্তা বললেন, খবর শুনেছ, তোমাদের শাস্ত্রী মশায় আমার এক ছোকরা শিক্ষকের কাছে হেরে গেছেন। ছোকরার সঙ্গেই লড়তে পারেন না, আবার আমার সঙ্গে লড়তে আসেন। স্যার আশুতোষ ও শাস্ত্রী মশায়—দুজনের মধ্যে মনের ভাব কি রকম ছিল এটি তার প্রমাণ। বহুদিন পূর্বে দুজনেই গত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিরোধের কি—কারণ ছিল জানি না। তবে একজন যে অন্যকে দেখতে পারতেন না ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি।

এ কাহিনী শেষ করার আগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা মনে হলে তাঁর যে এ বিষয়ে কী বিশিষ্ট অবদান ছিল তা স্মরণ না করে পারা যায় না। তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথির বিবরণ দিয়েছেন, বহু সন্দর্ভে অনেক নতুন সংবাদ জানিয়েছেন। তাঁর গবেষণার ধারা হয়তো বিজ্ঞান সম্মত ছিল না, কিন্তু বহু তথ্য তাঁর জানা ছিল। কথায় কথায় তিনি তা আমাদের বলেছেন, সেগুলির বিবরণ জানিয়েছেন। একথা বাঙলাদেশের মানুষ কোনো দিনই ভুলতে পারবে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর শাস্ত্রী মশায়ের মত সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথির জ্ঞান বঙ্গদেশে আর কারুর ছিল না। রামচরিত পুঁথির আবিষ্কার তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি বলে বিবেচিত হবে। এ পড়ে পাঠকগণ উপকৃত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণা অব্যাহত ছিল বলেই আমি জানি। পুত্র বিনয়তোষ পিতার মতই গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। ঢাকায় বিনয়তোষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি যোগ্য পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন। আজ তাঁদের কথা স্মরণ করে এই কাহিনী শেষ করলাম।

২৬. ৪. ৭৫

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আচার্য হরপ্রসাদ

এক.

পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক, তদানীন্তন বঙ্গের তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পদপ্রান্তে আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য আমার এই নগণ্য জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য গণনীয় ঘটনা। কত শিলালিপির ও তাম্রশাসনের আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এর মত কত মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান ও সম্পাদন, নানাস্থানে ভ্রমণপূর্বক কত অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের উদ্ধার, তাঁহার সারাজীবনের সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে, বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসের বহু জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে। আপনার অপরিমেয় দিব্যাবদান-পারম্পর্যে বাঙলার ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। বঙ্কিম মন্ডলের এই সর্ব-কনিষ্ঠ মান্ডলিক আপন মহত্ত্বে অমরার বরণীয় আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রণাম, পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

এই মহামহোপাধ্যায়ের ভাষা কেমন সরল সাবলীল ও সর্বজন বোধগম্য ছিল, লিখনশৈলী কত সুন্দর ও স্বচ্ছ ছিল, তথ্য সংগ্রহ কত সুপ্রচুর এবং তাহা বিতরণে কেমন কার্পণ্যহীনতা ছিল, তথ্য বিশ্লেষণে কেমন নিপুণতা ও সমাধান কেমন প্রমাদশূন্য ছিল, সে সব কথা বলিবার যোগ্য ব্যক্তি এখনো বাঙলায় আছেন। তাঁহারা সে সব কথা নিশ্চয়ই বলিবেন। আমার মত একজন সর্বগুণহীন অশিক্ষিত পল্লীবাসী কোন্ জন্মার্জিত পুণ্যফলে তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছিল জানি না। আমি এই সুযোগে তাঁহার

সেই স্নেহ-নিদর্শনের দুই একটি কথা বলিয়া ঋষি ঋণের স্বীকৃতি দান করিব। এই ঋণ পরিশোধের আর তো কোনো উপায় নাই।

বাঙলা ১৩২১ সাল, শ্রাবণ মাস, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু আমাকে লইয়া কলিকাতা পটলডাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দর সে সময় পটলডাঙ্গায় বাস করিতেন। প্রথমে তাঁহার বাসায় গিয়া প্রণাম করিলাম। বসু মহাশয় বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির কথা বলিয়া আমার পরিচয় দিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের আশীর্বাদপূর্ণ উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ির দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম। আমাকে দেখিয়াই নগেন্দ্রনাথ বসুকে বলিলেন, 'এ আবার কাকে সঙ্গে নিয়ে এলে ?' আমার সর্বাঙ্গে পল্লী-গ্রামের ছাপ। দ্বিতলে চেয়ার ছিল না। পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়া গালিচায় বসিলাম। বসু মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি কাজ তো কিছুই করছে না। হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করতে চান। আপনি রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি, তাই তিনি আমাকে বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি ক'রে আপনাকে উপদেষ্টারূপে পাবার আশায় অনুরোধ জানিয়েছেন। নিজে সম্পাদক থেকে এঁকে (আমাকে দেখিয়ে) সহকারী সম্পাদক করবেন। ইনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াবেন।' অনেক অনুরোধের পর সম্মতি দিয়া বলিলেন, 'উপদেষ্টা লিখো। মহোপদেশক-টেশক লিখো না বাপু।' সেই আমার প্রথম দর্শন।

ফাল্গুন মাসে ৺সরস্বতী পূজা হইত হেতমপুরে বেশ ধুমধামের সঙ্গে। সেবার বোধ হয় ফাল্গুনের প্রথমে পূজা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বসু মহাশয় হেতমপুরে আসিলেন। এথোরা হইতে আসিলেন 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'-র লেখক নিখিলনাথ রায়। হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক এবং ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও আসিলেন।

সন্ধ্যায় পুরানো রাজবাড়িতে সভার অধিবেশন হইল, প্রবন্ধ পড়িলাম, 'কেন্দুবিল্ব কাহিনী'। দুই একজন কিছু মন্তব্য করার পর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'জয়দেব সম্বন্ধে আমার যা কিছু জানা ছিল সবই এই লেখায় পেলাম। কেন্দুলীর কথা নতুন কিছু শুনলাম। এমনি ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করলে তবেই কাজ হবে। ঘরে বসে গেজেটিয়ারের অনুবাদে ইতিহাস হবে না।' খুব উৎসাহ দিলেন। পরে আমাকে কাছে টানিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁরে তোর এমন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভাষা কেন ? সরল ভাষায় সোজা করে লিখবি।'

৩রা ফাল্গুন শাস্ত্রী মহাশয় বক্রেশ্বর দেখিতে চলিলেন। সেখানে স্নান আহ্নিক ও দেবদর্শনের পর হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কালী মন্দিরে বিশ্রাম করিলেন, বাজারে তৈরি সাধারণ দোকানের রসগোল্লা দিয়া জলযোগেও আপত্তি করিলেন না। হেতমপুরে হাজারদুয়ারী নাম দেওয়া বাড়ির দ্বিতলে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। হেতমপুরে ফিরিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হাত মুখ ধুইয়া আহারে বসিলেন। ভাত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পচা চাউলগুলি কাল রং ধরিয়া সাদা ভাতের থালা জুড়িয়া বসিয়াছে। বিচি সমেত লাউ-এর তরকারি। সাঁওতাল পরগণার কুন্ডহিতের দই ভাল লাগিয়াছিল গত দুই দিন। দই চাহিলেন, একজন তাড়াতাড়ি একটি দই-এর হাঁড়ির তলানি খানিকটা নীল জল আনিয়া থালায় ঢালিয়া দিল। ভাত মাখিয়া মুখে গ্রাস তুলিয়াই তিনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দারুণ ক্রোধে শরীর কাঁপিতেছে, মুখে কিন্তু কোনো কথা নাই। সঙ্গে সঙ্গে বসু মহাশয়ও উঠিয়া পড়িলেন। 'সাঁওতালদের দেশ, রাজাও সাঁওতাল আর কর্মচারীগুলো চন্ডাল!' প্রচুর গালাগালি দিলেন। বাড়ির নীচে তলায় একখানা ঘোড়ার গাড়ি সর্বদার জন্য প্রস্তুত থাকিত, বজ্রাহতের মতো জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি সেই গাড়ি লইয়া পুরানো রাজবাড়ি ছুটিলাম। সমস্ত শুনিয়া মহারাজকুমার নির্বাক বিস্ময়ে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, 'এখন গিয়ে কি করবো। ব্রাহ্মণ, দিনে তো আর অন্ন গ্রহণ করবেন না। আর অন্নই বা কোথায়? যেমন করে পার রাত্রে ভাল মাছ আনাও আর একটু পরেই বৈকালিক জলযোগের ভাল ব্যবস্থা কর। আমি সন্ধ্যার দিকেই যাব। আজই তো রাত্রের ট্রেনে ওঁরা যাবেন। কিছু মোরব্বা কিনে দুজনের সঙ্গে দিও, কলকাতার লোক বীরভূমের মোরব্বা ভালবাসেন। তিন চার রকমের মোরব্বা আনিয়ে পৃথক পৃথক দুটো হাঁড়িতে ঠিক করে রাখ।'

সন্ধ্যায় মহারাজকুমার আসিলেন এবং তাঁহাদের রাত্রের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাজারদুয়ারীতেই থাকিয়া গেলেন। রাত্রে কলিকাতায় ফিরিবার ট্রেন ছিল। আমি দুইজনকে দুবরাজপুরে লইয়া গিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর দুটি টিকিট কাটিয়া দিলাম এবং হাওড়া হইতে কলিকাতা ফিরিবার যানবাহনের জন্য নগেন্দ্রনাথের হাতে কিছু টাকা দিয়া হেতমপুরে ফিরিলাম।

দুই.

বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ মূল সভাপতি। আমি সন্ধ্যায় বর্ধমানে উপস্থিত হইলাম, কারণ দিনে সাঁইথিয়ায়

ব্রাহ্মণ সম্মেলনের অধিবেশন ছিল। কুন্ডনার অন্যতম জমিদার বিনয় মুখোপাধ্যায় ইহার উদ্যোক্তা। সৌজন্য বশতঃ তিনি মহারাজকুমার মহিমা-নিরঞ্জনকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। মহিমা-নিরঞ্জন প্রথমে এই সভায় উপস্থিত হইতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু আমার মৃদু তিরস্কারে সম্মতি দানে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলাম, 'বীরভূমের সর্ব-প্রধান ব্রাহ্মণ জমিদার বলে বিনয় মুখোপাধ্যায় আপনার নিকট লোক পাঠিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করেছেন। টাকা পয়সা চাই না। মাত্র সভায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই দুকথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন আপনাকে এটা আপনার মহা সৌভাগ্য।' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'কিছু যে বলবো, সে বলাটার ব্যবস্থা করবে কে?'

আমি সে ভার লইয়াছিলাম। একটা অভিভাষণ লিখিয়া, রাজাদের চেক দাখিলা ছাপাইবার খুব ছোট একটা হাতে চালানো মুদ্রাযন্ত্রে সারা রাত্রি জাগিয়া অভিভাষণটি ছাপাইয়াছিলাম। এবং ভোরে মহারাজকুমারকে সেই অভিভাষণ চারি পাঁচবার পড়াইয়া প্রায় মুখস্থ করাইয়া দিয়াছিলাম। সকলেই আমরা স্নান আহ্নিকের পর সাঁইথিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই সম্মেলনেই মৈমনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর এবং বাঙলার খ্যাতনামা পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম।

সন্ধ্যায় বর্ধমানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম সম্মেলনে প্রায় চৌদ্দশত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, অনেকেই কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন। বিছানা মশারি খুলিতে হইল না। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যেকের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। সন্ধ্যায় বোধহয় একটা উদ্যান সম্মেলন ছিল। সম্মেলনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, প্রতিনিধি সংখ্যা হাজারের কম হইবে না। তাছাড়া দর্শকগণ তো ছিলেনই। পরদিন স্নান আহ্নিকের পর শাস্ত্রী মহাশয়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। তিনি আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। নানান কথাবার্তায় সময় যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল জানিতেই পারিলাম না। আহারের অহ্বান আসিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'সেখানেও রাজার খাবি, এখানেও তো সেই রাজারই দেওয়া খাবার। চল্, খাওয়ার পর একসঙ্গে বৈকালের সভায় যাব।' পাশেই খাইতে বসাইলেন। দুই এক গ্রাস খাওয়ার পর চুপি চুপি বলিলেন, 'হেতমপুরেও রাজবাড়িতে খেয়ে এসেছি, বর্ধমানেও রাজবাড়িতেই খাচ্ছি। কিন্তু তোদের দইটা এখনও হাতে লেগে আছে।' আমার খাওয়া প্রায় মাথায় উঠিল। তিনি বাম হাতটা পিঠে দিয়া বলিলেন, 'খা, খা, তোর আর দোষ কি?'

কলিকাতার ও বাঙলার বাঘা বাঘা পন্ডিতদের অনেকেই এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। দুই পঙক্তিতে সারি বাঁধিয়া তাঁহারা সকলেই খাইতে বসিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্মুখেই দ্বিতীয় পঙক্তিতে ছিলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ব্যাপার মাস্টার মশাই ?' শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি 'মাস্টার মহাশয়' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'সে আর তোমাকে শুনতে হবে না।' পাশেই ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি টিপ্পনি কাটিলেন, 'সে এক সাঁওতালের দেশের কথা।'

এই বর্ধমান সম্মেলনে বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। যদুনাথ সরকার ছিলেন ইতিহাস শাখার সভাপতি। আমি মহারাজকুমারের নাম দিয়া এই শাখায় একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। প্রবন্ধের নাম বোধহয় 'শ্যামারুপার গড়'। কুমুদরঞ্জন মল্লিককে দেখিলাম—'কপিঞ্জল' ছদ্মনামে একটা কবিতা পড়িলেন, 'নর্মা এবং কর্জনা ও গর্দান মারির দেশে', 'বেগম সমরু'-র লেখক ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সম্মেলনেই দেখিলাম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বহু বিদ্বানের সঙ্গে বর্ধমানে পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই সম্মেলনেই বিখ্যাত কীর্তনীয়া প্রেমদাসের কীর্তন প্রথম শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কীর্তনের আসরেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়।

তিন.

বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বেড়াই। 'বীরভূম বিবরণ' প্রথম খন্ড প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এইবার মুরারই হইতে লাভপুর পর্যন্ত গ্রামের কাহিনী 'বীরভূম বিবরণ' দ্বিতীয় খন্ডের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছি। সেদিনও বীরভূমের গ্রামে আতিথেয়তার অভাব ছিল না। ক্বচিৎ কোনোদিন কোনো গ্রামের ব্রাহ্মণ যদি বলিতেন, 'বাড়িতে স্ত্রীর অসুখ' আমি কোনো জলাচরণীয় গৃহস্থ বাড়িতে উপস্থিত হইলে সাদরে অভ্যর্থিত হইতাম। খাঁটি দুধ, খাঁটি ঘি এবং ঘরে-পাতা দই প্রায় প্রতি সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতেই প্রচুর মিলিত। ভাতটাই কেবল নিজে হাতে রাঁধিয়া লইতাম। তাহার পর ঘি, দুধ ও বীরভূমের প্রিয়বস্তু পোস্ত পাওয়া যাইত।

ঘুরিতে ঘুরিতে মুরারই স্টেশনের ক্রোশ খানেক পূর্বদিকে পাইকোড় গ্রামের 'নারায়ণ চত্বর' নামক পুষ্করিণীর ঘাটে একটি ইষ্টক নির্মিত বেদীতে কতকগুলি ভগ্নমূর্তির সঙ্গে একটি শিলালিপি পাইলাম। লিপির পাঠোদ্ধার করিতে

পারিলাম না। কিন্তু কর্ণদেব নামটা পড়িয়াই কলিকাতায় ছুটিলাম। নগেন্দ্রনাথকে লইয়া আসিলাম, কিন্তু তিনিও পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেন না। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয়ের শরণ লইলাম। তিনি এই সময় বাড়ির নীচ-তলায় বসিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থমালার ক্যাটালগ প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার গণেশ-কর্ম করিতেন ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। আমি গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। তিনি কথাই বলিলেন না। একদিন গিয়া দেখি, এক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমি গিয়া বসিবার কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, 'তাহলে বেদের বয়স কত?' শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, সর্বনাশ সমুপস্থিত। কোনো উত্তর না পাইয়া ভদ্রলোক পুনরায় বলিলেন, 'অবিনাশ দাশ বলেছেন, বেদের বয়স দশ হাজার বছর।' শাস্ত্রী মহাশয় ফাটিয়া পড়িলেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'দশ হাজার বছর? নিজের বাপের বয়স জান? কে তোমার অবিনাশ দাশ? উঠে যাও এখান থেকে। দশ হাজার বছর?' সেদিন আমিও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রথম দিন গিয়াই শিলা-লিপির কথা বলিয়াছিলাম। পরদিন পুনরায় প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিতে বলিলেন, 'কে তোর কর্ণদেব, কোথায় ধাপধাড়া গোবিন্দপুর পাইকোড়, তোর সাঁওতাল রাজা থাকবে হেতমপুরে বসে, আর আমি যাব দেশোদ্ধার করতে?' সেদিনও পলাইয়া আসিয়াছিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় মহিমানিরঞ্জন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। আমার কথামত তিনিও একদিন আমার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি পাইকোড়ে আসিবার সম্মতি দিলেন এবং নগেন্দ্রনাথকে লইয়া দিনস্থির করিতে বলিলেন। সময়টা ছিল বর্ষাকাল, কলিকাতা হইতে কিছু জিনিষ কিনিয়া লইব, তাহার একটা ফর্দ করিলাম এবং ফর্দটি লইয়া পটলডাঙায় গিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখাইলাম। ফর্দে মকরধ্বজ, মধু ও খলনুড়ি ছিল। তিনি ফর্দটি দেখিয়া বলিলেন, 'মকরধ্বজ কি হবে?' আমি বলিলাম, 'বর্ষাকাল, কি জানি যদি ঠাণ্ডা লাগে।' তিনি আমার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'তোকে আমি চিনতে পারিনি, যাব বলা আমার ঘাট হয়েছিল। তুই মানুষ খুন করতে পারিস। রাজবাড়ির খাতাপত্র যখন অডিট হবে তখন অডিটার লোককে বলবে, মকরধ্বজ খেয়ে শাস্ত্রী মশাই পাইকোড়ে শরীর সারাতে এসেছিলেন।' ফর্দটি তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'যা যখন যাব বলছি, তখন যাব।' আমি পাইকোড়ে ফিরিয়া আসিলাম। নগেন বাবুর পত্র পাইয়া পাইকোড়ের কয়েকজন ভদ্রলোক ফুলের

মালা এবং গরুর গাড়ি লইয়া মুরারই স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। পরপর তিনদিন তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এদিকে সিউড়ি হইতে কেনা আমার জিনিষপত্র নষ্ট হইয়া গেল। পুনরায় ভালো মোরব্বা প্রভৃতি আনিতে সিউড়ি গিয়াছি, এমনি দিনে নগেন বসু শাস্ত্রী মহাশয়কে লইয়া মুরারই স্টেশনে নামিলেন। সেদিন আর পাইকোড়ের কোনো ভদ্রলোক স্টেশনে আসেন নাই। সে সময় মুরারই থানার দারোগা ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কিরীটী রায় চৌধুরী। বীরভূমের হেতিয়া গ্রামে তাঁহার বাড়ি ছিল এবং তাঁহার পিতা অম্বিকা পণ্ডিত মহাশয় হেতমপুর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিতেন। কিরীটী দুজনকে সমাদরে নিজের বাসায় লইয়া গিয়া রাখিয়াছিল এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘি-ভাত (পোলাও) খাওয়াইয়াছিল। ঘি-টা নাকি ভাল ছিল না। সুতরাং নগেন বসু দারোগাবাবুকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'ঘুষের ঘি আর কত ভাল হবে ?' কিরীটী রাত্রেই পাইকোড়ে সংবাদ পাঠাইয়াছিল। আমি তাঁহাদের থাকিবার সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছিলাম। তথাপি পাইকোড়ে গিয়া আমাকে না পাইয়া তাঁহারা উভয়েই বিরক্ত হইয়াছিলেন। জিনিষপত্র লইয়া সিউড়ি হইতে বৈকালে পাইকোড়ে ফিরিয়া দেখি, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে শাস্ত্রী মহাশয় এবং নগেন্দ্রনাথ দুইজনে শিলালিপিটি পরীক্ষা করিতেছেন। পাইকোড় গ্রাম বিদেশের কোনো মুসলমান ভদ্রলোকের জমিদারি ছিল। নায়েব ছিলেন প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি যথাসাধ্য যত্নের সঙ্গেই দুইজনের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া নগেন বসু দুইকথা শুনাইয়া দিলেন। এ যাত্রা শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় পাঁচ ছয় দিন পাইকোড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া এবং গ্রামের একটি মন্দিরে কতকগুলি অপরিচিত প্রস্তর মূর্তি দেখিয়া নানান জনশ্রুতি শুনিয়া তাঁহার পাইকোড়ে আরো কয়েক দিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নগেন বসু কোন্ মোকর্দমায় জাতি বিচারের সাক্ষী আছেন বলিয়া থাকিতে চাহিলেন না। অগত্যা শাস্ত্রী মহাশয়ও কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। মুরারই স্টেশনে আসিতে সেবার নৌকার প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ বৃষ্টির জলে পায়ে চলার পথ প্রায় অগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। পাইকোড়ে আমি নিকটবর্তী মুরলীডাঙা গ্রাম হইতে টাটকা ছানা আনাইয়া ময়রা বাড়িতে দিতাম এবং দুই তিন রকমের সন্দেশ ও রসগোল্লা আদি তৈরি করাইয়া রাখিতাম। গ্রামের টাটকা তাজা তরকারি মাছ ইত্যাদিও শাস্ত্রী মহাশয়কে তৃপ্তি দান করিয়াছিল। মোটের উপর আমার অকপট সেবায় তিনি এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, পাইকোড় হইতেই আমি তাঁহার একান্ত আপনার জন হইয়াছিলাম।

পাইকোড়েই তাঁহার প্রাণখোলা আশীর্বাদে ধন্য হইয়াছিলাম। আমার অক্লান্ত পরিশ্রমে ইতিহাসের এমন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে যাহা ভারতের ইতিহাসে দুই একটি পৃষ্ঠা পূর্ণ করিবে, শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ মন্তব্যও করিয়াছিলেন। অতঃপর পটলডাঙায় তাঁহার বাড়িতে গেলেই তিন-চারি দিন থাকিতে হইত। কোনো কোনো দিন তিনি আমাকে নৈহাটিতেও নিজ বাড়িতে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

চার.

আমি বিশ্বকোষ ছাপাখানার উপর তলায় থাকিতাম। সেখানে বীরভূম বিবরণ-এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতাম। বিশ্বকোষ প্রেসে লেখা ছাপা হইলে প্রুফ দেখিয়া দিতাম। কোনো কোনো বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশও লইতাম। দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা শেষ হইয়া গেল। আমি বীরভূমে ফিরিব। পৌষ সংক্রান্তি নিকট। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'চল্, তোদের কেন্দুলিতে বাউলদের দেখে আসি।' শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা ছিল এই বাউলের দল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়েরই অন্যতর শাখা। আমি হেতমপুরে পত্র লিখিয়া দিলাম। কেন্দুলিতে ঘর ঠিক করিয়া রাখিতে লিখিলাম। রাত্রের ট্রেনে রওনা হইয়া বেলা দশটার মধ্যে দুবরাজপুরে পৌঁছিব। মহিমানিরঞ্জন যেন অভুক্ত থাকেন, অর্থাৎ শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিবেন এ কথাও লিখিয়া দিলাম। এই যাত্রায় শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতী পুত্র বিনয়তোষ সঙ্গে ছিলেন। বিনয়তোষ শিক্ষা শেষ করিয়া বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের লাইব্রেরীয়ান হইয়া গিয়াছিল এবং আপন যোগ্যতায় 'রাজরত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল বিনয়তোষ। (আমার এই প্রিয় সুহৃদ অকালে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।) হেতমপুরে আসিয়া স্নান আহ্নিকের পর খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। তিনটি আসন, এক শাস্ত্রী মহাশয়ের, অপরটি বিনয়তোষের, আর একটি মহিমানিরঞ্জনের। যে ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার চৌকাঠে পা দিয়াই তিনটি আসন দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'হরেকেষ্টর কই?' মহিমানিরঞ্জন উত্তর দিলেন, 'এখানকার ব্যাপার তো দেখে গিয়েছেন। হরেকেষ্ট খেতে বসলে আমাদের আর খাওয়া হবে না। আমাদের খাওয়া হলে ও পরে খাবে।'

জয়দেবে উপস্থিত হইলাম। অজয়ের দক্ষিণে বিষ্ণুপুর গ্রাম রাজাদের জমিদারি। সেখান হইতে বনরক্ষক চৌদ্দজন কোটাল কেন্দুলিতে মোতায়েন

ছিল এবং তত্ত্বাবধানের জন্য ছিল একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। আমার মুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়া মহারাজকুমার তাহাকে একটি সোনার আংটি উপহার দিয়াছিলেন। জয়দেব কেন্দুলির মোহান্ত তখন ছিলেন দামোদর চন্দ্র ব্রজবাসী। ইনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রবল পৃষ্ঠপোষক ও দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। চাষবাড়ি দেখিয়া ফিরিবার পথে অজয় নদের মাঝখানে আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। তখন সন্ধ্যায় ব্রজবাসীর আবাসবাটীর প্রাঙ্গণে খুব বড় সভা হইত। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ব্রজবাসী বৈষ্ণব আসিতেন। দেশের দুইচারিজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমন্ত্রিত হইতেন এবং ভক্ত বৈষ্ণবগণকে লইয়া তিনদিন ধরিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। দামোদর চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া সভায় লইয়া গেলেন। হেতমপুররাজের প্রতিনিধি হিসাবে আমিও আমন্ত্রিত হইলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভায় জয়দেব সম্বন্ধে আমি কিছু বলিলাম, তিনিও কিছু বলিলেন। সভা শেষে বাসায় ফিরিয়া শুইয়া পড়িলাম। বিনয়তোষের জ্বর হইয়াছিল।

পরদিন একাদশী ছিল। মোহান্ত মহারাজ ফল মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিতেন না। আমিও একাদশী ব্রত করিতাম। কিন্তু হেতমপুরে থাকিবার সময় এবং পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিবার সময় রুটি খাইতাম। মোহান্ত মহারাজের লোক আসিয়া যথাসময়ে ডাকিয়া লইয়া গেল।

গিয়া দেখিলাম দুইটি বৃহৎ থালায় বাদাম পেস্তা আদির সঙ্গে কদলী মিষ্টান্ন সাজানো রহিয়াছে। দুইটি মাত্র আসন। একটি আসনে ঘুড়িসার পণ্ডিত রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থ দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—আসুন। দামোদর চন্দ্র দুয়ারে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বাহিরে দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরেকেষ্ট কোথায় বসবে ?' মোহান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম, 'থালার দরকার নাই, কলার পাতাতেই কিছু দিয়ে দিন।' মোহান্ত ব্যস্ত হইয়া একখানা কলার পাতা টানিয়া তাহাতেই কিছু ফল মিষ্টান্ন সাজাইয়া দিলেন। আমি একখানা আসন টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। আহারান্তে পথে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বড় থালাটায় বসে গেল লোকটা কে রে ?' আমি বলিলাম, 'মোহান্তের সভা পণ্ডিত। মোহান্ত বোধহয় দুই জনেরই ব্যবস্থা করেছিলেন।' শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'আর মামদোবাজি করতে হবে না, তোকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। ও থালাটাই আমার ছিল। আর একটা তোর। সভা পণ্ডিত তো আমাদের

তত্ত্বাবধান করবেন। আমাদের খাইয়ে পরে খাবেন।' আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈকালে শাস্ত্রী মহাশয়কে লইয়া বাউল দেখিতে বাহির হইলাম। আখড়ায় আখড়ায় ঘুরিয়া পরিচিত এক বৃদ্ধ বাউলের আখড়ায় গিয়া বসিলাম। বাউল দুই আঁটি খড় আগাইয়া দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন— তিনি উত্তর দিয়া চলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটি শ্লোক পড়িলেন—

যাবন্নো পততি প্রভাস্বরময়ঃ শীতাংশুধারাদ্রবো
দেবীপদ্মদলোদরে সমরসীভূতো জিনানাং গণৈঃ।
স্ফূর্জদ্বজ্রশিখাগ্রতঃ করুণয়া ভিন্নং জগৎকারণং
গম্ভীর্ধীকরুণা বলস্য সহজং জানীহি রূপং বিভোঃ ॥

বাউল উত্তর দিলেন, 'ঠিক বলেছেন বাবা—

টলে জীব অটল ঈশ্বর।
তার মাঝে খেলা করে রসিক শেখর ॥

ঊর্ধ্বরেতাভবেদ্ যস্তু স দেব নতু মানুষ—কিন্তু আমাদের তিনি তো সহজ মানুষ। দেবতা নহেন।' শাস্ত্রী মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া প্রায় আধঘন্টা নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, 'উত্তরটা পাওয়া গেল।' আসিবার সময় বাউলের প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, ঐ বাউল সাধক অনেক কিছু জানে।

মাটির ঘর, একখানি তক্তপোষ। শাস্ত্রী মহাশয় তক্তপোষেই শুইতেন। আমি ও বিনয় মাটিতে খড় বিছাইয়া শুইতাম। সেদিন রাত্রে একথা সে কথার পর বৌদ্ধদের কথায় বলিলাম, 'বৌদ্ধ গৃহস্থগণকে তো শ্রাবক বলিত। সন্ন্যাসীরা শ্রমণ। বীরভূমে একটা জাতি আছে সরাক। মাছ মাংস খায় না। তাঁত বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, চাষবাসও করে। সরাক কি শ্রাবক থেকে এসেছে?'

পরে অবশ্য আমি জানিয়াছি ইহারা জৈন ছিল। উপাধি ছিল সরওয়াগী। সরওয়াগীর অপভ্রংশে এখন নাম হইয়াছে সরাক। লোকে বলে সরাকী তাঁতি।

শ্রাবকদের কথায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'একথা তো আমি আমার Living Buddhism বইয়ে লিখেছি। তুমি পড়নি?'

আমি বলিলাম, 'আমি তো ইংরাজী জানি না। আপনার বই পড়িনি।' তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন 'তুমি ইংরাজী জান না?'

আমি বলিলাম, 'না'। শাস্ত্রী মহাশয় আবার বলিলেন, 'তু—মি—ইং—

রা—জী—জা—ন—না ?' বারবার তিনবার এই কথা জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, 'তোমাকে দেগে দেওয়া উচিত।' হেতেমপুরে ফিরিয়া আসিলাম। মহিমা-নিরঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁহার সংবর্ধনা সভার আয়োজন করিলাম। পরামর্শের পর স্থির হইল 'বীরভূম বিবরণ দ্বিতীয় খন্ড' তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিব। মুদ্রিত গ্রন্থখানি তাঁহার পায়ের তলায় রাখিয়া দিব। অনিলবরণ রায় তখন হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এবং অধ্যাপক ভূপেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি রাজবাড়ীতে গিয়া দেখা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রণাম পূর্বক বলিয়াছিলেন, 'আপনি যখন এসেছেন, আমাদের কিছু Inspiration দিয়ে যান।' সভাতেও কিছু বলিতে গিয়া অনিলবরণ পুনরায় ঐ Inspiration কথাটি উচ্চারণ করিলেন। আমি বীরভূম বিবরণ দ্বিতীয় খন্ড উৎসর্গ করার কথা বলার পর মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন দুইকথা বলিয়া বইখানি শাস্ত্রী মহাশয়ের পায়ের তলায় রাখিয়া প্রণাম করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির কাজের খুবই প্রশংসা করিলেন। 'এইভাবে যদি প্রত্যেক জেলার গ্রামগুলির কাহিনী সংগৃহীত হয় তাহা হইলে একদিন বাঙলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইতে পারে এইটি আমার নিশ্চিত বিশ্বাস'—এই ধরনের দুইচার কথা বলিয়া মহিমা নিরঞ্জনকে তিনি 'তত্ত্বভূষণ' উপাধি দিলেন। তাহার পর পকেট হইতে আর এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, 'এখানকার কয়েকজন অধ্যাপক আমার কাছে ইনস্পিরেশন চেয়েছেন।' আমার একটি হাত ধরিয়া পাশে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, 'এই তো মূর্তিমান ইনস্পিরেশন হরেকেষ্ট আপনাদের সামনেই বর্তমান রয়েছে, তাকে দেখেই আপনাদের শিক্ষালাভ করা উচিত। আমি তাঁকে চিহ্নিত করে দিয়ে গেলাম সাহিত্যরত্ন উপাধি দিয়ে। মহামহোপাধ্যায়রা উপাধি বিতরণ করে থাকেন বটে, অবশ্য সে অধিকারও তাঁদের আছে। কিন্তু আমার জীবনে উপাধি দেওয়া এই প্রথম এবং এই শেষ। হরেকেষ্টর কাজ দেখে আমি খুশি হয়েছি। পাইকোড়ে চেদীরাজ কর্ণের শিলালিপি আবিষ্কার তার অক্ষয় কীর্তি। আমি তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলাম।' এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া তিনি সভা ত্যাগ করিলেন। পুরানো রাজবাড়ীতেই তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলেজ হইতে তিনি হাঁটিয়াই রাজবাড়িতে ফিরিলেন। পথে আসিতে আসিতে আমাকে বলিলেন, 'ইনস্পিরেশন।…রা ইনস্পিরেশন চেয়েছেন। কেমন, হলো তো? কেমন ইনস্পিরেশন দিয়ে এলাম।' আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া চোখের জল ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, 'আমার পক্ষে আপনার

এই আশীর্বাদ রত্নের চেয়েও মূল্যবান। কিন্তু এতে আমার শত্রুসংখ্যা আরও বাড়বে। এমনিতেই লেখাপড়া জানিনা বলে এরা আমাকে দেখতে পারে না।' তিনি বলিলেন, 'যাঃ তোর ভয় কিসের? তুই যা করছিস করে যা। এটা একটা মস্ত কাজ।' কবিরাজ শরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া গোপনে সামান্য সংস্কৃত ভাষায় সংক্ষেপে দুইটি উপাধিপত্র লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। পরে আমি এই সংবাদ জানিয়াছিলাম।

পাঁচ.

আমি তাঁহার এমনই আপনজন হইয়াছিলাম যে, তাঁহার গৃহের প্রতিটি উৎসবে পার্বণে আমন্ত্রিত হইতাম। সেকালে অভিভাবকেরাই পাত্রী দেখিতেন। পাত্রের পাত্রী দেখার সাহস হইত না। বিনয়তোষের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এ সংবাদ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তাই বিনয়তোষের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া পাত্রীকে পাকা দেখার দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া ছিলেন এবং পাত্রী যেমন দেখিলাম সে কথা বিনয়তোষকে জানাইতে অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। বিবাহ রাত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষ এবং আমিই পাত্র পক্ষের কর্তা হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিলাম। টাকাকড়ি খরচ পত্র করা, দান সামগ্রী গুছাইয়া লইয়া আসা ইত্যাদি সব কাজ আমরাই করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য পাকস্পর্শের দিনও নৈহাটিতে উপস্থিত ছিলাম। নৈহাটি সাহিত্য সম্মেলনেও শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রগণের সঙ্গে, অর্থাৎ পরিতোষ, আশুতোষ, বিনয়তোষ প্রভৃতিকে লইয়া আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিলাম। নৈহাটির গজা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয় খাদ্য ছিল। নৈহাটি সাহিত্য সম্মেলনে বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ সভাপতি ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কয়েকজন লোক নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথকে সভাপতি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ায় একটা পাল্টা সম্মেলন ডাকিয়াছিল। সম্মেলনে লোকজন কেহই যায় নাই। তাই জগদীন্দ্রনাথ নৈহাটি আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিনয় এবং আমি রবীন্দ্রনাথকে জলযোগ করাইয়াছিলাম। 'বিশ্বনাথ চাটুজ্জ্যে আম' এবং 'নৈহাটির গজা' দিয়া একসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজ ও বড়লাটের কাউন্সিলের মেম্বার ভূপেন্দ্রনাথ বসুও জলযোগ করিয়াছিলেন।

কর্ণার্জুনের শততম রজনী অভিনয় পূর্ণ উৎসবে আমি শাস্ত্রী মহাশয়কে

অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন অপরেশচন্দ্রকে 'নাট্যবিনোদ' উপাধি দান করেন। শাস্ত্রী মহাশয় সভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'অর্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর উত্তরাধিকারী নাটোরের মহারাজা এখানে উপস্থিত আছেন। চিরকাল তাঁরা জ্ঞানীগুণী সজ্জনদের সমাদর করে এসেছেন। তিনি যদি সম্মত মনে করেন, আমি তাঁকে অনুরোধ করছি অপরেশচন্দ্রকে নাট্যবিনোদ উপাধি দিয়ে এই সভাকে সার্থক করুন।' মহারাজা আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়া বলিলেন, 'আমি অপরেশচন্দ্রকে নাট্যবিনোদ উপাধি দান করিলাম। কিন্তু উপাধি পত্রে শাস্ত্রী মহাশয়কেও স্বাক্ষর করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য উপাধি পত্রে দুইজনেই পাশাপাশি স্বাক্ষর দান করিলেন এবং মহারাজ উপাধি পত্রখানি অপরেশচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন।

আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের পাশেই দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি চুপি চুপি বলিলেন 'দেখ তুই বেশি চালাক না আমি বেশি চালাক। আমি তো বলেছি তোকে উপাধি দিয়ে জীবনে একবারই অপকর্ম করেছি। তা দেখ, তোর কথাও থাকল, উপাধিও দিলাম। কিন্তু কৌশলে সেটা মহারাজের মুখ থেকেই বার করে নিলাম।'

বহুদিন তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া মহাকবি কালিদাসের রঘু, কুমার, মেঘদূত ও শকুন্তলার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়াছি, ইতিহাসের কত গল্প কত কথা শুনিয়াছি। তাঁহার 'বেণের মেয়ে' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণে' ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল। 'বেণের মেয়ে' যখন বই-এর আকারে বাহির হইল, দেখিলাম একটা পরিচ্ছেদ বাদ পড়িয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়কে সেকথা জানাইলে তিনি প্রথমে খুব রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর 'নারায়ণ' হইতে সেই পরিচ্ছেদটি দেখাইয়া দিলে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার পিঠ চাপড়াইয়া এই তীব্র অনুসন্ধিৎসা ও খুঁটিনাটি দেখার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বাড়িতে কেহ গেলে শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন নৈহাটি যাইবার জন্য পটলডাঙার বাড়ি হইতে হাঁটিয়া শিয়ালদহ যাইতে ছিলেন। পথে পড়িয়া পা ভাঙিয়া যায়। তদবধি বাড়ির বাহির হইতেন না।

'হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা' বাহির হইয়াছে। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং নরেন লাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। কথা হইল, পটলডাঙার বাড়িতে গিয়া লেখমালা সমর্পণ করা হইবে। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত নিমন্ত্রণের ভার লইলেন। নির্দিষ্ট দিনে গিয়া দেখি মাত্র দশ বার জন লোক। এদিকে

শাস্ত্রী মহাশয় শতখানেক টাকার সন্দেশ রসগোল্লা ও নৈহাটির গজা আনাইয়া রাখিয়াছেন। দশ বার জন লোক দেখিয়া ভীষণ চটিয়া নলিনীরঞ্জনকে গালাগালি দিলেন। ফোটোগ্রাফার বলা হয় নাই। আশুতোষ গিয়া একজন ফোটোগ্রাফার ধরিয়া আনিল। বক্তৃতা হইল, শ্যামাদাস কবিরাজ একখানি 'গিনি' দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আপনি যতদিন আছেন আমরা একটা আশ্রয়ে আছি···ইত্যাদি।'

ফোটো তোলা হইল। জলযোগান্তে সকলে বিদায় লইলেন। বাসী সন্দেশাদি দোকানে ফেরৎ দেওয়া হইল। আমাকে বলিলেন, 'সব ফেরৎ পাঠাস্ না। দুদিন থেকে খেয়ে যা।' বলা বাহুল্য আমি আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলাম।

৬ বৈশাখ, ১৩৮১

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

পূজনীয় শাস্ত্রিমহাশয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, তথাপি তাঁহার যশঃসৌরভ অল্প বয়সেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি একাধারে সংস্কৃত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক এবং সমালোচক ছিলেন।

ভট্টপল্লীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল। তিনি তাঁহার বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আসিয়া পণ্ডিতপ্রবর জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করিতেন। জয়রাম ন্যায়ভূষণ এমন একজন পণ্ডিত ছিলেন যে, তিনি সমগ্র কাব্য বিনা টীকার সাহায্যে অনায়াসে পড়াইতে পারিতেন। তাঁহার ছাত্র-সম্প্রদায় বহু বিস্তৃত ছিল।

শাস্ত্রিমহাশয় তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিত সমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, কোনো কৃতবিদ্য ব্যক্তি অধ্যাপক হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে শাস্ত্রিমহাশয়ের কিছু না কিছু সাহায্য লইতেই হইত। তিনি ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়কে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে এবং পণ্ডিতপ্রবর তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহোদয়কে কাব্যের পদে গ্রহণ করেন। পরে পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয় নিজ প্রতিভাবলে দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নও ছিলেন সাহিত্যে এক অসাধারণ মেধাবী পুরুষ। সমস্ত সাহিত্যের মল্লিনাথের টীকা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। শাস্ত্রিমহাশয় পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রিমহাশয়কে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা দিয়াছিলেন। বৈয়াকরণ বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুল হইতে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে লইয়া আসেন। অধ্যক্ষের শক্তি অনুসারে তাঁহাকে

প্রায় এক বৎসর রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি খঞ্জ ছিলেন বলিয়া তখনকার ইংরাজ সরকার তাঁহার কর্ম নামঞ্জুর করিয়া দেন।

শাস্ত্রিমহাশয় সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখনও ভট্টপল্লীর পণ্ডিত গুরুপ্রসন্ন বেদান্তশাস্ত্রী তাঁহার সহায়তায় এক অধ্যাপক পদে গৃহীত হন।

ঢাকা হইতে অবকাশ গ্রহণ করিবার পর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সর্বাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমালী বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট সুধীবৃন্দে প্রায় পরিবেষ্টিত থাকিতেন। মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কেও তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন।

আমি তাঁহার নিকটে কিছু গবেষণা কার্যের জন্য ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। 'ন্যায় সূত্রের প্রাচীনতা' বিষয়ে অনেক উপদেশ তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। পূজনীয় শাস্ত্রিমহাশয়ের কতিপয় মতবিশেষ এখানে বিবৃত করিতেছি।

গৌতমের ন্যায়সূত্র প্রথমটি এবং দ্বিতীয় সূত্রের অর্ধেক এই দেড়খানি সূত্র প্রকৃত গৌতম প্রণীত। তাহার পর যত সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ ন্যায় হইতে গৃহীত। আমি ছাত্র, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, বৌদ্ধমতে অবয়ব সমষ্টিই অবয়বী, কিন্তু ন্যায়মতে অবয়ব সমষ্টি হইতে অবয়বী ভিন্ন। ন্যায়মতের যুক্তি এই যে, একটি ঘটের কপাল ও কপালিকা দুইটি অবয়ব—যতক্ষণ না ইহাদের সংযোগ হইয়া অবয়বী ঘটরূপে পরিণত হয়, ততক্ষণ আকর্ষণ বা জলধারণ হইতে পারে না। সূত্র হইল 'ধারণাকর্ষণানুপপত্তেঃ'—অবয়বের আকর্ষণ করিলে একটা খণ্ড উঠিয়া আসিবে, আর অবয়বীর আকর্ষণ করিলে সমস্ত ঘটটাই উঠিয়া আসিবে, সেইরূপ অবয়বী ঘটের মত অবয়বে জল রাখাও যাইবে না। কাজেই অবয়ব ও অবয়বী অভিন্ন নহে। কার্যভেদই স্বরূপভেদের হেতু।

শাস্ত্রিমহাশয় তাহার উত্তরে বলিলেন যে, এই সকল সূত্র অর্থাৎ বৌদ্ধমত খণ্ডনের সূত্রগুলি পরবর্তীকালে যোজিত হইয়াছে। আমি প্রাচীনতা বিষয়ে আমার মত বলিতেছি।

আমি বলিলাম—আত্মা বৌদ্ধমতে নিত্য নহে, ন্যায়মতে আত্মা নিত্য। আমাকে বলিলেন—তুমি আত্মা নিত্য এইরূপ একটা সূত্র ন্যায় দর্শনের গ্রন্থ হইতে দেখাও ত? আমার তখন স্মরণে না আসায় বলিতে পারি নাই।

শাস্ত্রিমহাশয় বলিলেন—আমি দেখাইয়া দিব, সূত্রগুলি কিরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে তেমন কৌতূহলী না থাকায় আর আলোচনা করি নাই।

আমার গবেষণার বিষয় ছিল—'নব্যন্যায়ের ক্রমবিকাশ' (Evolution of Modern Logic), সুতরাং ইহার উপযোগী উক্ত বিষয় না হওয়ায় আমি আর তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করি নাই।

এই সময়ে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাহার কিছু বৃত্তান্ত যতটুকু স্মরণ আছে, তাহা লিখিতেছি।

তিনি বৈদিক মন্ত্রের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখিতেন। তিনি সন্ধ্যাহ্নিক ও গায়ত্রী জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন যে, ওটা ত বৌদ্ধবাদের অনুবর্তন। বৌদ্ধতন্ত্রে যে সকল দেব দেবীর উপাসনা পদ্ধতি দেখা যায়, সেই বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর প্রভাব এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে আমি একদিন বলিলাম যে, আমাদের সভ্যতার প্রথম হইতে ত বৌদ্ধবাদ আবির্ভূত হয় নাই। তাহারা তন্ত্রবাদ ত আমাদের শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, আমাদের তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রে এমন জগাখিচুড়ি হইয়া গিয়াছে যে এখন আর কোন্‌টা আমাদের কোন্‌টা বৌদ্ধদের তাহা বাছা যায় না। দেখ, ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারই যথেষ্ট, আর তান্ত্রিক দীক্ষার আবশ্যকতা নাই। যাহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় না তাহাদের তান্ত্রিকদীক্ষা দেওয়ার সার্থকতা আছে। আমি আর তাঁহার সহিত তর্ক করি নাই। তিনি একাদশী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্যন্ত অন্ন ভোজন করিতেন না। তাঁহার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে দুই এক সের সন্দেশ রক্ষিত হইত। তিনি সময়ে সময়ে ক্ষুধা পাইলেই কিছু কিছু সন্দেশ খাইতেন। তিনি কোনোদিনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। তখনকার দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মদ্যপান তেমন দোষের মনে হইত না। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় একবার জীবন সংকট রোগ আক্রমণ সময়েও মদ্যপান করেন নাই। তখনকার দিনে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ঐরূপ সংকট অবস্থায় ভাইনাম গ্যালিসিয়া জাতীয় মদ্য দিবার নিয়ম ছিল। চুঁচুড়ার বিশিষ্ট ডাক্তার আসিয়া শাস্ত্রিমহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া মদ্যেরই ব্যবস্থা করিলেন। শাস্ত্রিমহাশয় কিছু চৈতন্য ও কিছু অচৈতন্য অবস্থায় থাকিলেও তাঁহাকে কেহ মদ্যপান করাইতে পারে নাই। তিনি কখনও অমেধ্য মাংস ভোজন করিতেন না। কোনো সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিহারের তাম্রখনিতে কার্য করিবার কালে ঐরূপ মাংস ভোজন করিয়াছে। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবা, শুনিলাম

তুমি নাকি পাখিটাকি খাইতেছ। শুন বাবা, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছ, তোমার একটা সহজাত অধিকার আছে যে অনেক জাতিকে তুমি পদধূলি দিতে পার। যদি একটু জিহ্বা সংযত করিলে সে অধিকারটা বজায় থাকে, তাহা করিবে না কেন? তাঁহার এই মধুর উপদেশ পুত্র মানিয়া লইয়াছিলেন।

শাস্ত্রিমহাশয়ের শ্বশুরের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবনে তিন-চার বৎসর মদ্যপান ত দূরের কথা একেবারে নিত্য হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। হবিষ্যে সোনামুগের ডাইল আবশ্যক হইত। শাস্ত্রিমহাশয়ের শ্বশুর তাহা নিজ দেশ হইতে যোগাইতেন। এই অবস্থায় 'কৃষ্ণচরিত' নিবন্ধটি লিখেন। ইহাও শাস্ত্রিমহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয়কে শাস্ত্রিমহাশয় অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাসও করিতেন। তিনি আমার পিতৃদেব মহাশয়কে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিভূষিত দেখিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ যাইবার ক্লেশ সহ্য করিয়া তখনকার সাহেব 'ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন্‌স্'কে বলিতেন যে, এটা তোমাদের সরকারের কলঙ্ক যে পঞ্চানন তর্করত্নকে আজও 'মহামহোপাধ্যায়' করিলে না। আমার পিতৃদেবকে তখনকার সরকার সুনজরে দেখিতেন না। তিনি স্বদেশী করিতেন বলিয়া তাঁহার নামের পার্শ্বে কাল দাগ দেওয়া ছিল এবং একবার এই কারণে তাঁহাকে আলিপুর হরিণবাড়ির জেলে আটক করা হইয়াছিল। তিনি জেলে উপবাস করিয়াছিলেন চারদিন, সেই হেতু তিনি মুক্তি পাইলেও তাঁহার উপর সরকারের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। আমাদের একটি শিষ্য এবং শাস্ত্রিমহাশয়ের চেষ্টায় ঐ কাল দাগ উঠিয়া যায়। তাহার পরও তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রত্যাখ্যান করিবেন, এ ভয়ও সরকারের ছিল। শাস্ত্রিমহাশয় আমাকে বলিলেন—'তোমার বাবা ত এখন কাশীতে থাকেন, তুমি টেলিগ্রাম পাইলে একটা স্বীকৃতি পত্র টেলিগ্রামে জানাইয়া দিও।' আমি তাহাই করিয়াছিলাম এবং প্রায় দুই বৎসর পরে সর্দা আইনের প্রতিবাদে পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করেন।

শাস্ত্রিমহাশয়ের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব বাঙলা সরকারের উপর বিশেষ ভাবে ছিল। সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগের সময়ে সরকার তাঁহার মতামতকে বিশেষ মূল্য দিতেন। আমার অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির প্রধান অধ্যাপক পদের প্রার্থী হন, তখন আর একজন 'স্মৃতিতর্কতীর্থ' পণ্ডিত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শাস্ত্রিমহাশয় গোপনে মদীয় পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নারায়ণচন্দ্র কিরূপ পণ্ডিত? পিতৃদেব অকপটে বলিলেন—উত্তম পণ্ডিত।

শাস্ত্রিমহাশয় তাহার অভিমতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রধান পদে এবং স্মৃতিতর্ক-তীর্থকে দ্বিতীয় পদে নিয়োগের অভিমত প্রদান করেন। আর একবার শাস্ত্রি-মহাশয় কোনো একটা জাতি ঘটিত ব্যবস্থায় লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পিতৃদেব তাহা প্রত্যাখ্যান করায় তাঁহার উপর শাস্ত্রিমহাশয়ের বিশ্বাস আরও প্রগাঢ় হইয়াছিল। শাস্ত্রিমহাশয় যে আমাদের এই অঞ্চলের কতবড় পুরুষ ছিলেন তাহা তাঁহার কার্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুল তিনিই সর্বপ্রযত্নে স্থাপিত করেন, নিজ নামের কোনোরূপ প্রত্যাশা না রাখিয়া মহেন্দ্রবাবুর নামকেই চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

১৩৩০ সালে তিনি নৈহাটিতে সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন। নৈহাটির বিশিষ্ট সুধী বরদাবাবুকে এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিয়া এবং মদীয় পিতৃদেবকে দর্শন শাখার সভাপতি করিয়া 'গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না' এই প্রবাদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন এই সম্মেলনের সর্বময় কর্তা, অথচ থাকিতেন অন্তরালে। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুল এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বহু কর্মের অনুরোধে তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইলেও নৈহাটিতে প্রায়ই আসিতেন। শেষ বয়সে তিনি হস্ত চালিত কাঠের ছোট গাড়ীতে বসিয়াও কলিকাতার বাটী হইতে শিয়ালদহ স্টেশন এবং নৈহাটি স্টেশন হইতে বাটী যাতায়াত করিয়াছেন। নিজ গ্রামের প্রতি এমনই মমতা ছিল। তাঁহার কর্মময় জীবন সত্যই বাঙালীর আদর্শ জীবন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শাস্ত্রিমহাশয়ের বহু তথ্য ও তত্ত্ববিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল ইহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন ভূস্বামিবর্গ, পণ্ডিতসমাজ ও আচার-বিচার বিষয়ে এত অভিজ্ঞতা ছিল যে তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলে শুনিতে শুনিতে বিস্মিত হইতে হইত। তাই কেহ কেহ তাঁহাকে "Encyclopaedia of informations" এই আখ্যায় অভিহিত করিত।

মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য

আমার জ্যাঠামশাই

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমাকে অনেকেই অনুরোধ করেছেন। কিন্তু এতে আমার একটু কুণ্ঠা আছে। প্রথম কারণ,—তাঁর জ্ঞানের পরিধি অগাধ। যে সব দুরূহ বিষয় আলোচনা করে তিনি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সে সব বিষয়ে আমার জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ,—তাবচ্চ শোভতে বললেই যথার্থ বর্ণনা হয়। দ্বিতীয় কারণ ব্যক্তিগত। আমার জন্ম রাজস্থানে। সেখানে একটানা ১৮ বৎসর কাটে। হরপ্রসাদ তখন প্রায় আমার অচেনা। তারপর হরপ্রসাদের আশ্রয়ে আসি। তিনি তখন পৌঢ়, ৫ বৎসর পূর্বে পেনসন্ নিয়েছেন।

১৯১১ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত তাঁরই পটলডাঙার বাড়িতে থেকে বি. এ. এম. এ. পাশ করি। তখন তাঁর বড় ছেলেরা বাড়িতে নেই। বিনয়তোষ এবং কালীতোষ স্কুলে পড়ে। এই পাঁচ বছর খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই তাঁকে দেখি এবং অনেক সময় তাঁর গণেশের কাজ করি। এরপর চাকরি সূত্রে আমাকে কলকাতা ত্যাগ করতে হয়।

তবে একসময় আবার তাঁকে খুব নিকটে পাই। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং বাঙলার প্রধান অধ্যাপক, আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে কাজ করি। এক বছর তাঁর নীলক্ষেতের বাড়িতেই থাকি। বাড়িটা একতলা, ঘর বেশি নেই। তাঁকে সর্বদা কাছে পেয়েছিলাম বটে তবে ঘনিষ্ঠভাবে নয়, কারণ দুজনেই নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকতাম এবং সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে বেশ একটি বিদ্বজ্জন সমাগম হত।

এরপরও অবশ্য মধ্যে মধ্যে গরমের কিংবা পূজার ছুটিতে তাঁর গণেশের

কাজ করতে হত। এই গণেশগিরি করার সময় তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হয়ে যাই। দীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি বলে যাচ্ছেন, তখন কোনো আকর গ্রন্থ, বা প্রবন্ধ দেখার দরকার বোধ করতেন না। প্রবন্ধটি ঠিকভাবে সাজানোর জন্য কখনো কোনো খসড়া করতেন না। এমন কি Catalogue গুলির সুদীর্ঘ ভূমিকা লেখবার সময়ও বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ বিশেষ কোনো পুঁথির জন্য প্রায়ই Catalogue-এর শরণাপন্ন হতেন না।

শরীর খুব বলিষ্ঠ না হলেও অত্যন্ত সংযম ও নিয়মে থাকায় কখনো বিশেষ অসুখে পড়েননি। লেখা পড়ার কাজ করবার অসাধারণ শক্তি ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে কাজ করে যেতেন। তাঁর সাহায্যকারীরা ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়েছেন (আমি নিজে ভুক্তভোগী) কিন্তু তাঁর শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না।

তাঁর জীবনযাত্রা অতি সরল এবং অনাড়ম্বর ছিল। কোনো বিলাস বা ব্যসন তাঁর ছিল না। একটি বিষয়ে কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল। লোক-জনকে পরিতোষ-পূর্বক খাওয়াতে তিনি বড়ই ভালবাসতেন। এ ব্যাপারে আড়ম্বরের অভাব দেখিনি। বাড়িতে সরস্বতী পূজা, বিবাহ, উপনয়নাদিতে আয়োজনের বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য থাকত। নিমন্ত্রিত, রবাহূত, অনাহূতদের দীয়তাং ভুজ্যতাং বেলা ১২টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলত। আমরা রাত ২টার আগে ছুটি পেতাম না।

শরীর শেষের দিকে অপটু হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত শীত-কাতুরে ছিলেন। অগ্রহায়ণেই কলকাতার শীতে কাবু হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে রাস্তায় পড়ে গিয়ে ball and socket joint-এর ball-টি ফেটে গিয়েছিল। সুতরাং, চলতে পারতেন না। ক্রাচ-এর সাহায্যে বাড়িতে একটু একটু চলা ফেরা করতেন। একটা ঠেলা গাড়ি ছিল। কোথাও যেতে হলে সেটায় বসিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই অবস্থাতেও লাহোরের দুর্জয় শীতে ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স-এর (১৯২৮ খৃ.) সভাপতির কাজ করেছেন। মনের জোর ছিল অসাধারণ।

তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলা সাজে না। সুতরাং সে কাজে বিরত হলাম। তার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য, ধর্ম একান্ত ভাবে নিজস্ব জিনিস। অপরের কাছে জাঁক করে এটা প্রকাশ করা যায় না। তবে বহু বৎসর তাঁর কাছে থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে তিনি অন্তরে অন্তরে প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন। তবে তিনি বলতেন, 'হিন্দুর আচারগুলি মেনে চলা

উচিত, তা না হলে হিন্দুর বিশেষত্ব থাকে না। যাঁরা বলেন, পৃথিবীতে একটি জাতি, সেটি মনুষ্য জাতি, আমরাও সেই জাতি,—তাঁরা ভ্রান্ত। কারণ সব দেশে এবং সব জাতির মধ্যেই স্বতন্ত্র আচার বিচার, স্বতন্ত্র সামাজিক বিধি,—এমন কি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা আছে। এইগুলিই তাদের প্রকৃত পরিচয়। আমারা যদি আমাদের বিশিষ্টতাগুলি পরিত্যাগ করি, তাহলে জাতি হিসাবে আমাদের কোনো মর্যাদা থাকবে না। শুধু Homo sapiens বলে গণ্য হব।'

সেইজন্য তিনি ব্রাহ্মণোচিত সব রকম ক্রিয়াকর্ম করতেন। তবে সেগুলি Law of Medes বা Persians-এর মত অবশ্য পালনীয়, না করলে অধর্ম হয়, এ কথা তিনি স্বীকার করতেন না। শেষ বয়সে তিনি প্রায় সবই ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু বংশে বহু পুরুষ ধরে চলতি ৺সরস্বতী পূজা বরাবর খুব ধুমধামের সঙ্গে চালু রেখেছিলেন। বাহ্যত সামাজিক বিধি নিষেধগুলি তিনি পালন করতেন। আহারাদি সম্বন্ধে তাঁর জাত বিচার ছিল। 'Improper food' এবং 'food prepared and served by improper persons' কখনো গ্রহণ করতেন না। এ বিষয়ে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের বিধি সবই তিনি মানতেন। তবে আচমনীয় খাবার বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম দেখেছি। ক্বচিৎ-কখনো নিয়মভঙ্গ করেছেন। শেষ বয়সে একান্তে নিত্যপূজা, জপতপ, এমন কি সন্ধ্যা আহ্নিকও তিনি করতেন না। তীর্থ ভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, দেবস্থানে মানত, মাদুলী ধারণ—এসব কিছুই তিনি করতেন না। তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, 'ওর কিছু হবে না। ও চার ঘন্টা পুজোয় নষ্ট করে।'

তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মত গভীর জ্ঞান অল্প লোকেরই ছিল। কিন্তু কিমুরা নামে এক জাপানি ভদ্রলোক যখন তাঁর কাছে তন্ত্রশাস্ত্র শেখার জন্য এসেছিলেন তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'Why do you want to study Tantra? It is hideously obscene'. তন্ত্র চর্চায় বিপদ আছে—হয়ত সেইজন্য এই বিদেশী যুবককে সাবধান করার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন। তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তন্ত্র তাঁর বিচারশক্তির উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। এবিষয়ে তাঁর একটা intellectual detachment ছিল। সবই তিনি নিজের প্রখর বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতেন। যেটা যুক্তিসিদ্ধ নয়, সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

দীর্ঘজীবনে হরপ্রসাদ, বহু বিশিষ্ট মানুষের সংস্রবে এসেছেন। এঁদের সম্বন্ধেও কিছু লিখতে আমার ওপর হুকুম হয়েছে। যা দেখেছি এবং যা

শুনেছি (এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করছেন হরপ্রসাদের একমাত্র জীবিত পুত্র পরিতোষ ভায়া) তাই সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করছি।

বিভিন্ন সময়ে হরপ্রসাদের কাছে তিনজন জাপানি ছাত্র এসেছিলেন। প্রথম জন ওমিয়া। এঁর বয়স খুব বেশি ছিল না। তখন জেঠাইমা বেঁচে ছিলেন (মৃত্যু ১৯০৮ খৃ.)। ওমিয়ার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ কোনো রান্না হলে ওমিয়ার ডাক পড়ত। মাটিতে আসন পেতে বসতেন। একটা জলচৌকির ওপর ভাত বাড়া হত। দুটো কাঠি দিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভাত মুখে পুরতেন। তার জন্য স্বতন্ত্র একপ্রস্থ বাসন থাকত। আহারের পর নিজেই বাসন মেজে এক জায়গায় রেখে দিতেন। আম খেতে খুব ভালোবাসতেন—তবে দিশি টক আম। মিষ্টি জাতআম পছন্দ করতেন না।

দ্বিতীয় ছাত্র য়ামাকামি। ইনি সুপুষ্ট দেহের লোক ছিলেন। গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। রুশ-জাপান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—সমস্ত বুক এবং পিঠ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এঁকে শুধু একবার দেখেছি।

তৃতীয় ছাত্র কিমুরা—এর কথা আগেই বলেছি। ইনি যখন এলেন তখন আমি কলকাতায় এসে গেছি। পড়াশুনা কতদূর এগিয়েছিল তা বলতে পারিনে। তিনি খুব আমুদে লোক ছিলেন। আমাদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গিয়েছিল। ভাঙা বাঙলায় মোটের ওপর একরকম ভাব প্রকাশ করতে পারতেন। জাপানিদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এইজন্য হরপ্রসাদ তাঁকে একটি সোনার মেডেল দেন।

ওয়ান হুই নামে এক চীনা সাধু হরপ্রসাদের কাছে এসেছিলেন। এঁর বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে কিছু জ্ঞান ছিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন, অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার ইচ্ছা ছিল। এঁর বিবরণ অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন। ইনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন। দুধের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন, 'আমি দুধ খাই, তবে চীন দেশে এমন সাধু আছেন যাঁরা দুধও খান না।'

অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল Macdonnel যখন ভারতে আসেন তখন সরকার হরপ্রসাদকে তাঁর সঙ্গী করে দেন, দুজনে ভারতের বহু জায়গায় ঘুরেছেন। হরপ্রসাদ সঙ্গে থাকায় ম্যাক্‌ডোনেল-এর অনেক সুবিধা হয়েছিল। হরপ্রসাদ শেষবার যখন নেপালে গিয়েছিলেন তখন সিলভ্যাঁ লেভি Sylvain Levi সেখানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়। লেভি হরপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন সেখানে বসেছিলেন ত্রিভুবন

কলেজের অধ্যক্ষ বটুকলাল মৈত্র মহাশয়। তিন জনকে নিয়ে ফটো তোলা হয়। মৈত্র মহাশয় ইতস্ততঃ করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রুপ ফটো তোলা হয়। মৈত্র মহাশয় বলেছিলেন, 'আমি immortalized হয়ে গেলাম।'

বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে নৈহাটিতে একটি বাড়িতে আসতেন। হরপ্রসাদের পিতা রামকমল ন্যায়রত্নের তখন খুব নাম (বিদ্যাসাগরের কথাতেই One of the most distinguished Pandits of Bengal)। হরপ্রসাদ ভয়ে ভয়ে দূরে থেকে দুজনের আলাপ একবার দেখেছিলেন। সে বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তখন তিনি খুব ছোট। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বৎসর। রামকমল মারা যান ১৮৬১ সালে। জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু তখন কান্দি স্কুলের হেডপণ্ডিত। তিনিও মারা যান এক বৎসর পরেই। সংসারে দারুণ দুরবস্থা। তখন বিদ্যাসাগর সংসারের ভার কিছুদিন নিজহাতে নিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একথা স্মরণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের দানশীলতা ছাড়াও তিনি তাঁর সাহিত্যে রসবোধের অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। বঙ্গদেশে চলিত শকুন্তলার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা পাশাপাশি রেখে তুলনা করে তিনি দেখিয়ে দিতেন তাঁর শকুন্তলা কত শ্রেষ্ঠ। তিনি বলতেন, বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত শকুন্তলাই প্রকৃত কালিদাসের শকুন্তলা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদের যোগাযোগের ইতিহাস আছে। কেশবচন্দ্র সেনের পরামর্শ মতো হোলকার মহারাজ একটি পাঁচশত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা ভাল প্রবন্ধ লিখবে, তাকেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য বি. এ. এই পুরস্কারটি পান। তখনও হরপ্রসাদের সঙ্গে বঙ্কিমের দেখা হয়নি। কেমন করে 'ভারত মহিলা' নামে এই প্রবন্ধটি বঙ্গ-দর্শনের চতুর্থ বর্ষের শেষ তিন সংখ্যাতে স্থান পেল তার ইতিহাস হরপ্রসাদ নিজেই দিয়েছেন। এই আরম্ভ। তারপর বঙ্গদর্শনে তিনি নিয়মিত ভাবে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। যখন তাঁর 'বাল্মীকির জয়' প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে এর একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) এই চমৎকার সমালোচনাটি হরপ্রসাদ বইটির প্রথমে ছেপে দেন। বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'গ্রন্থখানি অতিক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোনো বাঙলা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এমন আমাদের স্মরণ হয় না।'

অমৃতলাল বসু মধ্যে মধ্যে বাড়িতে আসতেন এবং অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে যেতেন। তিনি বলতেন, শুধু পার্ট মুখস্থ করলেই অ্যাক্টর হয় না,

সমস্ত মনপ্রাণ এতে ঢেলে না দিলে অ্যাক্‌টিং ফিকে নীরস হয়ে যায়। যখন হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন তাঁর খেয়াল হল একটা সংস্কৃত নাটক মঞ্চস্থ করবেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকটি নির্বাচন করলেন। এরজন্য পুরাকালের উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি করা হল। পার্টও ঠিক হয়ে গেল। অ্যাক্‌টিং ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শের জন্য তিনি অমৃতলালের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। নাটক অভিনয়ে অমৃতলালের বিরাট অভিজ্ঞতা থাকলেও এ-জিনিস তাঁর কাছে একেবারে নতুন। কালিদাসের সংস্কৃত নাটক, তাতে পুরাকালের সাজসজ্জা—এ তিনি কখনও দেখেনওনি, শোনেনওনি। খুব আগ্রহের সঙ্গে তিনি এগিয়ে এলেন। বল্লেন, তাঁরও একটা নতুন শিক্ষা হল। নাটকটা খুব জমেছিল। এই পোষাকগুলি কিছুকাল পরে যখন ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক হয় তখন দরকার হয়েছিল। মালবিকাগ্নিমিত্রে স্ত্রী-চরিত্র কিছু বেশি আছে। যাঁরা কলেজ থিয়েট্রিক্যাল্‌স নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁরা জানেন স্ত্রী-চরিত্র পুরুষদের দিয়ে অভিনয় করানো কী বিড়ম্বনা। অবশ্য এখন অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাও অভিনয় করে। তবে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পড়ত না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ছেলেদের চেহারা মোটের উপর মন্দ হত না। স্ত্রী ভূমিকায় তাদের মানিয়ে যেত। বহুদিন পরে (বোধহয় ১৯১৭ সালে) ইরাবতীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি তখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। আমার মনে হয়েছিল, তখনও যদি মেক-আপ করে রানী সাজিয়ে তাঁকে স্টেজে দাঁড় করানো যেত ত খুব বেমানান হত না।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাণ্ডিত্যের জন্য হরপ্রসাদকে শ্রদ্ধা করতেন। অবশ্য শ্রদ্ধা উভয় পক্ষেই ছিল, এটা বলাই বাহুল্য। একবার হরপ্রসাদ পরিতোষকে নিয়ে গুরুদাসের বাড়িতে সকাল বেলায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। পরিতোষের বয়স তখন ১৭/১৮। অনেকক্ষণ নানা কথার পর গুরুদাস হরপ্রসাদকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরিতোষকে ছাড়লেন না। সেখানেই স্নানাহার করে এবং বিকেলে জলখাবার খেয়ে তবে পরিতোষ ছাড়া পায়।

দুঃখের কথা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হরপ্রসাদের মনান্তরের কথাটা বেশ ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অতটা খারাপ ছিল না। কোনো কোনো বিষয়ে অবশ্য তাঁদের মধ্যে মতের মিল ছিল না, কিন্তু 'মুখ দেখাদেখি ছিল না' এরকম ব্যাপার কখনো হয় নি। উনি নিজেই বলতেন, 'লোকে এটা দেখে না যে আমার ছেলেদের নাম কেমন ভাবে রেখেছি। আমার ছেলেরা সব 'তোষ' আর তার ছেলেরা সব 'প্রসাদ'।

আশুতোষ ভোজনবিলাসী ছিলেন। তাঁর একটি প্রিয় খাবার ছিল নৈহাটির নন্দ ময়রার গজা। যতদিন আশুতোষ বেঁচে ছিলেন হরপ্রসাদ নিয়মিতভাবে তাঁকে এই গজা পাঠাতেন। বেশি দেরি হলে আশুতোষের দিক থেকে অনুযোগ আসত নৈহাটির গজার আস্বাদ প্রায় ভুলে যাচ্ছেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর সাহিত্য পরিষদে তাঁর স্মৃতিসভায় অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় হরপ্রসাদ মনের ব্যথা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং সরাসরি তাদের মনোমালিন্য সম্পর্কে বিচার করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, এমন কি ঘটেছিল যে এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বে ফাটল ধরে গেল? ব্যাপারটা বোধহয় দুচার জন ছাড়া কেউই জানেন না। যাঁরা এই ব্যাপারে জড়িত ছিলেন তাঁরা সকলেই লোকান্তরিত হয়েছেন। সম্ভবত আশুতোষের বিধবা কন্যা কমলার বিবাহ উপলক্ষেই দুই বন্ধুর মনান্তরের সূচনা হয়েছিল। সে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আড্ডায় মুখরোচক কেচ্ছার খোরাক যোগানোতে আমার রুচি নেই। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাঁদের কাজের সমালোচনা করার কোনো যুক্তিও নেই। De mortuis nil nisi bonum (Of the dead nothing but good.)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ—দুজনেই সাহিত্য পরিষদের কর্ণধার ছিলেন। সুতরাং সব সময়েই দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হত। শেষ জীবনে দুজনে পটলডাঙা স্ট্রিটে প্রতিবেশীই হয়েছিলেন। ত্রিবেদী মহাশয় একবার হরপ্রসাদের বড় উপকার করেছিলেন। হরপ্রসাদ চিরদিন কবি কালিদাসের ভক্ত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ধারাবাহিকভাবে কালিদাসের প্রত্যেক রচনায় অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করবেন। প্রথম বই 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' ছাপা হল ১৩০৯ বঙ্গাব্দে। অত্যন্ত নিপুণভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেঘদূতের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে বইটি তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ হওয়া মাত্র ঝড় উঠল —অত্যন্ত অশ্লীল বই। প্রায় তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানির উপক্রম হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু বললেন, 'অতি চমৎকার বই হয়েছে। তবে বইটি কালিদাসের বশে লেখা। আজকালকার স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে বিচার করলে অন্যায় হবে।' সরকারের কাছে হরপ্রসাদকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। সে কৈফিয়ৎ সরকার গ্রাহ্য করেন। বিপদ কেটে গেল, কিন্তু হরপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনো বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবেন না। বাস্তবিকই বাঙলা ভাষায় সাহিত্যের রসচর্চা তিনি বহুকাল করেন নি। পুনরায় তাঁকে এই কাজে প্রবৃত্ত করানোর কৃতিত্ব চিত্তরঞ্জন দাশের। চিত্তরঞ্জন কয়েকবার পটলডাঙায় এসে তাঁর মত পরিবর্তনে কৃতকার্য

হন। 'নারায়ণ' পত্রিকায় কালিদাস সম্বন্ধে হরপ্রসাদের অপূর্ব প্রবন্ধগুলি চিত্তরঞ্জনের চেষ্টার ফল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হরপ্রসাদের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি প্রায়ই হরপ্রসাদের বাড়িতে আসতেন, অনেকটা বাড়ির ছেলের মতোই ব্যবহার পেতেন। ফটোতে তাঁর হাত খুব পাকা ছিল। জোঠাইমা-সহ বাড়ির সকলের অনেক গ্রুপ ফটো নিয়েছিলেন ; পরে যখন তিনি ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ হিসাবে নাম করেছেন, তখন তাঁর প্রথম বই 'পাষাণের কথা' প্রকাশিত হল। হরপ্রসাদ এর ভূমিকা লিখে দেন। রাখালদাস চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে হরপ্রসাদের 'পদপ্রান্তে উপবেশন করে প্রত্নবিদ্যার বর্ণমালা শিক্ষা' করেছেন। হরপ্রসাদের ছেলেদের সঙ্গে রাখালদাস বড়ভাই-এর মতো ব্যবহার করতেন।

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীও হরপ্রসাদের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৯ (?) সালে হরপ্রসাদের বড় জামাতা ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা খুব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগে। তখন অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন একটা মেজর অপারেশন বলে গণ্য হত। তাছাড়া ভুবনবাবুর রোগ বেশ জটিল হয়ে পড়েছিল। সুরেশপ্রসাদ পটলডাঙার বাড়িতে এসে অস্ত্রোপচার করেন, ভুবনবাবু সেরে ওঠেন। এত বড় অপারেশনে সুরেশপ্রসাদ ফি নেন নি।

হরপ্রসাদের বাড়িতে শুধু জ্ঞানপিপাসুরাই আসতেন তা নয়, নানা বিচিত্র রকমের লোক মধ্যে মধ্যে আসত। কুলকর্ণী সেইরকম একজন মানুষ ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশীয় এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি বলতেন, যাবতীয় রোগ বিবেচনা করে লবণ প্রয়োগে সেরে যায়। বেশ বাক্‌পটু ছিলেন। বলতেন, 'Ever since we gave up our national occupation আমরা আমাদের intellect and energy অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ করছি।' হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'What was your national occupation?' উত্তর, 'Shastriji আপনি historian, আপনি একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? Our national occupation was plundering people.' ইনি পরে লবণানন্দ-স্বামী নাম গ্রহণ করেছিলেন।

হরবিলাস সর্দা যখন কলকাতায় আসতেন তখন হরপ্রসাদের সংগে দেখা করতেন। হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তার খুব গর্ব ছিল। একটু উচ্ছ্বাসের আধিক্য এবং কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর Hindu Superiority বইটির হরপ্রসাদ বিশেষ প্রশংসাই করতেন। হরবিলাস রাজস্থানের লোক ছিলেন। তাঁর সময়ে রাজস্থানে, উত্তরপ্রদেশে, বিহারে উচ্চবর্ণ বিত্তশালী এবং

শিক্ষিত সমাজেও বাল্যবিবাহ অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। পাছে এই বাল্য বিবাহের জন্য Hindu Superiority নষ্ট হয়ে যায় এবং জাতিটা হীনবীর্য হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় হিন্দুদের বিবাহের বয়সের lower limit স্থির করার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হন। হরপ্রসাদ কিন্তু Sarda Act সম্পূর্ণরূপে মেনে নেননি। তিনি এবিষয়ে একটু পুরাতন পন্থী ছিলেন। তাছাড়া এই নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারে আইনের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নি। তবে এ বিষয়ে মতের অমিল সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মনের অমিল হয় নি।

শরৎচন্দ্র দাস মধ্যে মধ্যে হরপ্রসাদের বাড়িতে আসতেন এবং দুজনে তিব্বত ও তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা চলত। শরৎচন্দ্র প্রাণ হাতে করে সর্বদা মৃত্যুভয় থাকা সত্ত্বেও ছদ্মবেশে বহুদিন তিব্বতে কাটিয়েছিলেন এবং অনেক অজানা খবর তিব্বত থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তিব্বতে একজন লামা তাঁকে গোপনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে যখন জানাজানি হয়ে যায় তখন শরৎচন্দ্র দেশে চলে এসেছেন। কিন্তু বিদেশীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে লামাটিকে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। অসম সাহসের জন্য এবং বিদ্যানুরাগের জন্য হরপ্রসাদ শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। যদিও চেহারায় এবং কথাবার্তায় শরৎচন্দ্র নিতান্ত সাদাসিধে সুজলাং সুফলাং বঙ্গের বাঙালির মতই ছিলেন।

পরিশেষে নরেন্দ্রনাথ লাহার কথা উল্লেখ করি। ইনি হরপ্রসাদের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে Indian Historical Quarterly, March 1933-তে ইনি হরপ্রসাদের গুণ বর্ণনার সঙ্গে কালানুক্রমিক ভাবে তাঁর রচনাগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। পরে তাঁরই সম্পাদিত Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri Memorial Volume-এ হরপ্রসাদের জীবনব্যাপী সাধনা ও কীর্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস এবং বিশদভাবে সমস্ত রচনার তালিকা ও সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন।

হরপ্রসাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতদের তালিকা আরও বাড়ানো যেত। তবে এখানেই থেমে গেলাম।

● ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। হরপ্রসাদ যদি সদ্য পিতৃহীন এই ভাইপোটিকে তখন কোলে টেনে না নিতেন তাহলে কোথায় যে ভেসে যেতাম তা বলতে পারি নে। এই শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ দিয়ে উদ্যোক্তারা আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আমি ধন্য হলাম।

মে ১৯৭৫। সংযোজন : অক্টোবর ১৯৭৭॥

বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য

আমার দেখা শাস্ত্রী মহাশয়

শাস্ত্রী মহাশয় নৈহাটিতে ১৩৩০ সালে (১৯২৩ খৃ.) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশন আহ্বান করেন। সম্মিলন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া নৈহাটি ও গরিফার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। স্বয়ং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ অধিবেশন উপলক্ষে নৈহাটিতে এসে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। গ্রামে এক প্রবল উত্তেজনা। অভ্যর্থনা সমিতির সভায় একদিন আলোচ্য বিষয় ছিল সম্মিলনের স্থান নির্বাচন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নৈহাটি পৌর প্রতিষ্ঠানের তদানীন্তন পৌরপতি রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর। কাঁটালপাড়া ও ভাটপাড়ার সভ্যগণের এক বৃহৎ অংশ সম্মিলন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবনের সম্মুখস্থ মাঠে অনুষ্ঠিত হবার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু রায়বাহাদুর সেখানে স্থান সংকুলান হবে না—এই কারণ দেখিয়ে তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নৈহাটি পৌর-প্রতিষ্ঠানের উত্তর দিকে নৈহাটি মৌজায় অবস্থিত একখণ্ড খালি জমি নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই নিয়ে সভায় ঘোর বাদবিতণ্ডা হয়। এর ফলে কাঁটালপাড়া ও ভাটপাড়ার অধিকাংশ সভ্য সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে আসেন। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে বঙ্কিম ভিটেয় সম্মিলন অনুষ্ঠান করতে কৃতসংকল্প হন। এঁদের সমর্থন করেন কলকাতার সাহিত্যিকদের এক বিপুল ও প্রভাবশালী অংশ। এই বিরোধের সমাধান কল্পে নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনারায়ণ কাঁটালপাড়ায় আগমন করেন। কিন্তু রায় বরদাকান্ত মিত্র মহাশয়ের জেদের জন্য তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন যাতে তিক্ততা বৃদ্ধি না

হয় তার জন্য স্থির হয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হবার এক সপ্তাহ আগে 'বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন'—এই নামে এক সাহিত্য সম্মিলন বঙ্কিম ভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তী কালে প্রতিবৎসর দুইদিন ব্যাপী এই সম্মিলন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। যে সভায় এটা স্থিরীকৃত হল সেই সভাতেই বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে প্রথম অধিবেশনের সভাপতির আসন অলংকৃত করার জন্য অনুরোধ করা হবে স্থির হয়। কাটালপাড়া এবং ভাটপাড়ার জনগণের বিপুল সমর্থন পাওয়া গেল এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও সংগৃহীত হল। আমরা তখন যুবক। যুবজনোচিত আবেগে পরিচালিত। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে চন্দননগর থেকে সভার জন্য প্রয়োজনীয় হোগলা ও অন্যান্য দ্রব্য আনা ও কলকাতার সাহিত্যিকদেব সঙ্গে যোগাযোগ করার কাজে ব্যস্ত। তখন আমার পূর্বতন শিক্ষক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষাধিকারের পূর্বাঞ্চলীয় কর্মাধ্যক্ষ, ভারতীয় সংগ্রহশালায় তাঁর কার্যালয়। যেহেতু তিনি এক সময়ে আমার শিক্ষক ছিলেন, এই অধম আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম, তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার ভার পড়ল আমার উপর। বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী সকল কাজ হত। সেজন্য আমাকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হত।

একদিন বিকেলের দিকে আমার বন্ধু মনোতোষ সান্যালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলে নানা কথা পৃষ্ঠে তিনি বললেন, 'বিভূতি, একবার আমাদের শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করার জন্যে যাওয়া উচিত। তিনি কি বিদ্যাবত্তায়, কি চরিত্র মাধুর্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁকে এই বিরোধের জন্য দায়ী করা উচিত নয়। অথচ নায়ক পত্রিকায় তাঁকে আক্রমণ করা হচ্চে। এটা আমার ভাল লাগছে না। শাস্ত্রী মহাশয় যদিও ভাষার দিক বিবেচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেন নি, তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস রচনায় মন দেন। এ বিষয়ে আমাদের তিনি গুরু ও পথ প্রদর্শক। তাঁকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, তাই তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমাদের উচিত। তোমরাও চল আমার সঙ্গে।' আমরা তৎক্ষণাৎ রাজি হলাম এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের পটলডাঙার বাড়ির দিকে রওনা হলাম। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, যদিও তিনি তখন জানতেন আমরা তাঁর বিরুদ্ধ দলীয়। আমরা তাঁর কাছে যাবার উদ্দেশ্য জানিয়ে আমাদের সাফল্যের জন্য আশীর্বাদ

ভিক্ষা করলাম। তিনি আমাদের কাজের জন্য কোনো রকম ক্ষোভ প্রকাশ না করে আমাদের উৎসাহিত করলেন এবং তিনি যে এ বিষয়ে বরদাবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেকথাও বললেন। সেই সঙ্গে কেন নৈহাটিতে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার কারণও বুঝিয়ে দিলেন। কথার শেষে তিনি নায়ক পত্রিকা হাতে নিয়ে একটা ছবির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, 'বাবারা দেখেছো, পেঁচো আমাকে কী করেছে।' 'পেঁচো' হলেন হালিসহর নিবাসী স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি একজন রসিক পুরুষ ছিলেন এবং তখন নায়ক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পত্রিকায় সরস কার্টুন ছবি বার হত। ছবিতে আমরা দেখলাম, এক বৃহৎ বাঁশবন, সেই বাঁশবনে এক বাঁশগাছের ডগায় শাস্ত্রী মহাশয় হনুমান বেশে বসে আছেন। ছবিটা সত্যিই আপত্তিকর। আমরা তৎক্ষণাৎ একবাক্যে এই রকম আপত্তিকর বিদ্রূপাত্মক ছবি ছাপার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বললেন, 'দেখ বাবারা বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে আমাকে বর্ধমানের মহারাজ বিশেষ ভাবে সংবর্ধিত করেছিলেন। সেই জন্যেই আমি এই অধিবেশন নৈহাটিতে ডেকেছি বর্ধমানের মহারাজের সভাপতিত্বে। সব কাজের ভার কিন্তু দিয়েছি বরদাকান্তকে। অধিবেশনের স্থান নির্বাচন বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই। বরদাকে বলে দেব, তোমরা একত্রে বসে মীমাংসা করে নাও। যদি মীমংসা না হয়, তাহলে তোমরা যা মনে করেছ তখন তাই কোরো।'

আমরা দুই বন্ধু সকাল থেকে ঘুরছি সাহিত্যিকদের বাড়ি বাড়ি, সারাদিন স্নানাহার হয় নি। আমাদের শুকনো মুখ দেখে শাস্ত্রী মহাশয় বলে উঠলেন, 'তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে সারাদিন খাওয়া দাওয়া হয়নি। মুখটুখ ধুয়ে আমার এখানে খেয়ে নাও। নৈহাটি ফিরে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, আর খাওয়া হবে না।' তিনি এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। আমরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধ শিবির থেকে গিয়েছি, সুতরাং শত্রুপক্ষ। মনের উদারতা না থাকলে এমনভাবে আহার্য গ্রহণ করতে বলতে পারতেন না। অনেক কাজ করাবার ছিল বলে বিনীত ভাবে আমাদের অক্ষমতার কথা জানালাম এবং তাঁকে নমস্কার করে তাঁর গৃহ থেকে বার হলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের এক সপ্তাহ আগে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিপুল জন সমাগম হয় এবং বেশ কিছু সাহিত্যিকও

যোগদান করেন। বিপিনচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিম সাহিত্যের অনুরাগী সমালোচক। উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর বঙ্কিম সাহিত্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনও সার্থক হল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কষ্ট স্বীকার করে নৈহাটিতে এসে অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। সেকারণে নৈহাটির ইতিহাসে সেই দিনটি (৮ আষাঢ় ১৩৩০, ২৩ জুন ১৯২৩) বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কালীপদ দাস

আমার পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়

দেবতুল্য মানুষ শাস্ত্রী মহাশয়কে আমি খুব নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি ভাইসচ্যানসেলারের বেয়ারা ছিলাম। প্রথম দিন শাস্ত্রী মহাশয় ভাইসচ্যানসেলার হার্টগ সাহেবের বাড়িতে এসে উঠলেন। ইউনিভার্সিটির স্টুয়ার্ড মনোমোহন ঘোষ সেখানে এলেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে কোন বাড়ি দেওয়া যায় আলোচনা হল। মনোমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, ভি. সি-র বাড়ি আর জেনকিন্‌স সাহেবের বাড়ির মাঝখানের একতলা বাড়িখানা দিলে ওনার সুবিধা হবে। নীল খেতের সেই বাড়িতেই শাস্ত্রী মহাশয় বাস করেন। ভি. সি-র বাড়ি থেকে শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা। তিনি আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। বলতেন, তোদের দেশে এলাম, বুড়ো মানুষ, আমাকে দেখাশুনা করিস। দিনের মধ্যে অনেকবার, বিশেষ করে ভি. সি. শুতে গেলে রাত্রে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে চলে যেতাম।

সকাল বেলায় উঠে নিজে জলযোগ করতেন। বাড়ির কাজের লোকদের সবাইকে খাওয়াতেন। ঢাকায় তিনি একাই থাকতেন। ছেলেরা মাঝে মাঝে এলেও বেশিদিন কেউ থাকতেন না। রান্না করে দেবার জন্য ব্রাহ্মণ ছিল। ছাত্ররা তাঁর বাড়িতে প্রায়ই আসত। মুসলমান ছাত্ররাও খুব আসত। সকলকে তিনি আদর করে খাওয়াতেন। পড়াশুনার কথা আলোচনা করতেন। প্রফেসারদের মধ্যে সুশীল দে, রমেশ মজুমদার, শহীদুল্লা সাহেব—এ'দের তাঁর বাড়িতে আসতে দেখেছি। সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ এ'রা রাস্তায় শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখলে শ্রদ্ধা করে কথা বলতেন।

বেলা সাড়ে তিনটা চারটা পর্যন্ত তিনি ইউনিভার্সিটিতে থাকতেন। তিনি লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনা করতেন না। স্লিপ দিয়ে নিজের ঘরে বই আনিয়ে পড়তেন। অনেক সময়ে আমরা বই তাঁর গাড়িতে তুলে দিতাম। বাড়িতে নিয়ে যেতেন। বাড়ি ফিরে জলযোগ সেরে পড়াশুন্য করতে বসতেন। রাত্রি সাড়ে নয়টা দশটা পর্যন্ত পড়তেন। কখনো কখনো মশারির মধ্যে বসে পড়াশুনা করতেন। ঢাকায় খুব মশা ছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় খুব দয়ালু মানুষ ছিলেন। তিনি ছোট বড় সকলকে সমান ভাবে দেখতেন। বিপদে পড়ে তাঁর নিকটে আশ্রয় নিলে যতরকম ভাবে সাহায্য করা দরকার ততরকম ভাবেই তিনি সাহায্য করতেন। তিনি হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদ করেন নাই। ঢাকা ইউনিভার্সিটির মুসলিম হলের ছেলেদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল, এই দুই হলের ছাত্রদেরও তিনি সাহায্য করেছেন। উনার বাড়িতে কোনো চিঠি নিয়ে গেলে তখন যদি তিনি এক্কা গাড়িতে করে ইউনিভার্সিটিতে আসতে থাকতেন তা হলে 'আয় বাবা' বলে গাড়ির ভিতরে ডেকে নিতেন। প্রফেসার তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনেক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মত দয়ালু আর কোনো প্রফেসার দেখি নাই। তিনি আমাদের অন্যায় দেখে কখনো রাগ হতেন না। তিনি আমাদের ডেকে বুঝিয়ে দিতেন যাতে আমরা আর কোনো অন্যায় না করি।

তিনি ইউনিভার্সিটিতে কখনো জল খেতেন না। পিপাসা পেলে আমাদের দিয়ে ডাব কিনিয়ে এনে গ্লাস ছাড়া ঐ ডাব থেকেই জল খেতেন।

রাত্রে তাঁর কাছে গেলে ডেকে অনেক গল্প বলতেন। আমার বাঙাল ভাষা বুঝতে না পারলে দুবার তিনবার জিজ্ঞাসা করতেন। ধর্মের কথা, দেবদেবীর কথা জিজ্ঞাসা করতাম। উনি খুব ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এইভাবে উনার কাছে কত শিখেছি, কত ভালবাসা পেয়েছি এখন মনে পড়ে।

শাস্ত্রী মহাশয় মন খারাপ করে ঢাকা থেকে চলে আসেন। কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল শুনেছিলাম। উনি মাথা উঁচু করে চলা মানুষ ছিলেন। খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। সভা করে তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়। টিপার্টিতে তখনকার ভি. সি. ল্যাঙলি সাহেব ছিলেন। অনেক প্রফেসার ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কিছু খেলেন না। চলে আসবার সময় আমাদের বকশিস দিলেন। সেই সঙ্গে শিশুদের মতো ক্রন্দন করেছিলেন।

নিত্যধন ভট্টাচার্য্য

পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়ের পদপ্রান্তে

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে আমি হিন্দু স্কুলে মাস্টারিতে ঢুকি। আমার বয়স তখন ২৭ বছর। স্কুলের সব মাষ্টারমশাইদের মধ্যে আমিই ছিলুম সবচেয়ে ছোট। সৌভাগ্যক্রমে সকলেই আমাকে ছোট ভাই-এর মতন ভালবাসতেন। মাইনে পেতুম খুবই কম, কাজেই আমাকে একটা ভাল প্রাইভেট টিউশানি জুটিয়ে দেবার জন্যে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। এমন সময় আমার শুভানুধ্যায়ী করুণাকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (এখন তিনি আর নেই) আমাকে বল্লেন, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে কাজ করবেন? আহার-ঔষুধ দুই-ই হবে। মাসে ৪০ টাকা করে দেবেন। তাঁর কাছে থাকলে অনেক কিছু শিখতেও পারবেন।' আমি তখুনি রাজি হয়ে গেলুম। পরদিন স্কুলের ছুটির পর তিনি আমাকে নিয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের পটলডাঙার বাড়িতে গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তেতলার ওপরে একলাই থাকতেন। গিয়ে দেখি—তিনি একলা বসে কি একখানা বই পড়ছেন; জিজ্ঞেস করলেন করুণাবাবুকে, 'কি কর্তা! এটি আবার কে?' করুণাবাবু আমার পরিচয় দিলে তিনি বেশ খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন, পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন কাজ করবে?' আমি বল্লুম, 'যখন বলবেন। সকালে-বিকেলে দুবেলাই কাজ করতে পারি।' 'থাকবে কোথায়?' 'কেন, একটা মেস-টেস দেখে নেব।' তিনি হেসে বল্লেন 'চেহারাটিত দেখছি ভালই আছে। বাড়ির খেয়ে যাতায়াত করছ, মেসে থেকে এমন চেহারাটিকে আর নষ্ট করতে হবে না। স্কুলের ছুটির পরে এসে রাত ৮টা/৮৷৷টা পর্যন্ত কাজ করলেই আমার হবে।' কথা হলো—তার পরদিন থেকেই কাজ করবো।

পরের দিন ছুটির পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। শাস্ত্রী-মহাশয়ের মুখখানা খুব খুশি। রামলালের (তাঁর সব সময়ের চাকর) হাতে কিছু পয়সা দিয়ে বল্লেন 'যা, কিছু খাবার নিয়ে আয়।' আমি একটু আপত্তি করতে তিনি খুব স্নেহের সুরেই বল্লেন, 'তা হবে না। কিছু খেতেই হবে। বেলা নটার সময়ে খেয়ে বেরিয়েছ, আবার নটার সময়ে ফিরবে। কিছু না খেলে আমার কাজেই যে ফাঁক পড়বে হে।' আপত্তি টিকলো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই রামলাল একটা ঠোঙায় দুখানা কচুরি, দুখানা সিঙ্গাড়া, আর একটা রসগোল্লা নিয়ে এল। খেয়ে কাজ সুরু করবার আগেই বল্লেন, 'তোমার কাজ বুঝে নাও। এই চেয়ার টেবিলে বসে আমি যা বলবো তাই লিখবে।' আমি চেয়ার-টেবিলে আপত্তি করায় বল্লেন, 'তাহলে বসবে কোথায় ?' আমি বল্লুম, 'ওসব চেয়ার-টেবিল হটান। একখানা সতরঞ্চি পেতে তার ওপর চাদর বিছিয়ে নিয়ে আপনি একপাশে একটা তাকিয়া নিয়ে বসবেন, আর আমি একপাশে বসে লিখবো।' বল্লেন, 'কিসের ওপর লিখবে ?' বল্লুম, 'কেন ? একটা জলচৌকি পেতে টেবিল করে নেব।' বল্লেন, 'তা মন্দ বলো নি। আমিও মাঝে মাঝে একটু গড়িয়ে নিতে পারবো।' পরদিন বিকেলে রামলালকে খাবার আনার কথা বলতেই আমি বেশ একটু জোর আপত্তি জানিয়ে বল্লুম, 'না। ওসব সিঙ্গাড়া কচুরি রসগোল্লা খাবো না।' জিজ্ঞেস কল্লেন, 'তবে কি খাবে ?' বল্লুম, 'ওসব কি আমি রোজ খাই ? চার পয়সার মুড়ি মুড়কি আনান। তা হলেই হবে।' কথাটা শুনে মিনিট পাঁচেক গুম হয়ে থেকে বল্লেন, 'হুঁ। ছোকরা দেখছি চালাক বটে।' বল্লুম, 'এতে আর চালাকি কি দেখলেন ?' বল্লেন, 'হুঁ। ঐ সিঙ্গাড়া কচুরি আর কদিন দিতুম হে। ২/৪ দিন পরেই ত বন্ধ করতুম। এখন এই মুড়িমুড়কি আর কোন আক্কেলে বন্ধ করবো ? রোজই চালিয়ে যেতে হবে। যা-রে রামলাল মুড়িমুড়কি নিয়ে আয়।' রামলাল হাসতে হাসতে চলে গেল। মুড়িমুড়কি আসা মাত্রই বল্লেন, 'কই, দেখি, কি আনলি ?' রামলাল ঠোঙাটা এগিয়ে দিতেই একমুঠো গালে ফেলে দিয়ে বল্লেন, 'নাও হে। তোমার মুড়িমুড়কি খাও।' খাওয়া হলে বল্লেন, 'ঐ র‍্যাকের পেছনে একটা ভাঙা টিনের বাক্সে মুগের বরফি আছে। ওর থেকে দুখানা নিয়ে খেয়ে জল খাও।' এইভাবে তাঁর কাছে আমার কাজ শুরু হল।

প্রতিদিন স্কুলে যাবার পথে সকালবেলা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতুম। তারপর বিকেলে ছুটির পর এসে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কাজ করে ৮-৫০-এর ট্রেনে বাড়ি ফিরতুম। আমি ছিলুম বেলঘরে থেকে ডেলি

প্যাসেঞ্জার। একদিন স্কুলের পথে সকালবেলা গিয়ে দেখি—তিনি একখানা বেশ মোটা বই পড়ছেন, বাইরে একখানা বেতের হাতওলা চেয়ারে বসে। দেখলুম, আর একখানা পাতা হলেই বইখানা শেষ হয়ে যাবে। তিনি কানে খুবই কম শুনতে পেতেন, সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে তাঁর কোনো খেয়াল হত না। ভাবলুম—বইখানা শেষ হলে নিশ্চয় মুখ তুলবেন। কাজেই disturb না করে দাঁড়িয়েই রইলুম। ওমা!—বইখানা শেষ হওয়া মাত্রই তিনি আবার গোড়ার পাতা খুলে ফিরে ফিরতি পড়তে শুরু করলেন। অগত্যা সামনে গিয়েই দাঁড়ালুম। তখন তিনি মুখ তুলে একগাল হেসে বল্লেন, 'এসেছো কর্তা!' জিজ্ঞেস কল্লুম, 'ওখানা কি বই?' ভেবেছিলুম—কোনো গল্প বা ইতিহাসের বই হবে। উত্তর দিলেন, 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।' এটা একখানা অতি দুরূহ বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্র। জিজ্ঞেস করলুম, 'বইখানা বুঝি এই প্রথম পড়ছেন?' 'না। কয়েক বছর আগে ২/৪ বার পড়েছিলুম, এখন আর একবার ঝালিয়ে নিচ্ছিলুম মাত্র। আজ সকালে এই দুবার শেষ হল।' আমি ত শুনে অবাক!

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন Greater India Society-র প্রেসিডেন্ট। তাঁর পা ভাঙা ছিল বলে সোসাইটির মিটিং তাঁর বাড়িতেই হত। একদিন বল্লেন, 'আজ মিটিং আছে।' আমি বল্লুম, 'আমি তা হলে যাই?' বল্লেন, 'না-না। তুমি আমার কাছে থাকবে। যদি কোনো বই-টই পাড়তে হয়।' রয়ে গেলুম। এলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. কালিদাস নাগ, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, ও. সি. গাঙ্গুলি প্রভৃতি। তাঁরা নানা বিষয়েই তাঁদের ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, মুদ্রাতত্ত্ব, Fine arts প্রভৃতি। তিনিও তাঁদের উত্তর মুখে মুখেই দিতে লাগলেন। কি একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বল্লেন, তাতে যেন সুনীতিবাবুর ঠিক মন উঠল না। শাস্ত্রী মহাশয় তখন আমাকে বল্লেন, 'ওহে, ঐ বইখানা পেড়ে একবার সুনীতিকে দেখাও ত। ও, উনি ত আবার তোমার মাস্টার মশাই।' বল্লুম, 'নিশ্চয়ই।' বইখানা র‍্যাক থেকে পাড়লুম—প্রায় তিন চার শ' পাতার বই। বল্লেন, 'খুলে দেখিয়ে দাও।' 'কতর পাতা খুলব?' একটু ভেবে বল্লেন, 'ও, এই ২৫৭ কি ২৫৮-র পাতা। বাঁদিকে ওপরের দু তিন লাইনের পাশে লাল দাগ দেওয়া আছে।' ঠিক তাই-ই। ২৫৭ পাতার উপর দিকে দু তিন লাইনের পাশে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া। অবাক হলুম এই বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে! ওয়ারেন হেংস্টিস্ থেকে সেই সময় পর্যন্ত সমস্ত গভর্নর জেনারেলদের নাম—কে কবে এলেন, কবে গেলেন

—মাঝখানে কে acting গভর্নর জেনারেল হলেন—এ সমস্তই তিনি গড় গড় করে বলে যেতেন। কোনো বিষয়ে লেখার সময়ে ইংরেজি সাল, বাংলা সন, সংবৎ, শকাব্দ তিনি সোজা একটানা বলে যেতেন, একটুও থামতেন না। আমি হিসেব করার জন্যে একটু থামলে হেসে বলতেন, 'নাও হে কর্তা এতদিন ভুল হয় নি, আর আজকে হবে?' এমনিই ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি।

একদিন কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম 'বইপড়ার সময় note করেন না?' বল্লেন, 'না। note করা আমার অভ্যেস নয়। পড়ার সময়ে হাতে একটা লাল পেনসিল থাকে, তাই দিয়ে পাশে দাগ দিয়ে রাখি। বাস্—ঐ আমার note করা।' সত্যিই তাই দেখেছি। পড়ার সময়ে হাতে একটি ছোট্ট লাল পেনসিল, ছেলে মানুষের মতন লাইনগুলিতে আঙুল দিয়ে পড়তেন। গড়ে তিনি প্রতিদিন বারো চোদ্দ ঘণ্টা পড়তেন। যেদিন মারা যান, সেদিনও রাত ৮টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। বল্লেন, 'এক এক দিস্তে করে কাগজ আনলে বড্ড শিগ্‌গির ফুরিয়ে যায়, পরশু এসে এক রিম কাগজ আনিও।' তারপর দিন জগদ্ধাত্রী পুজোর ছুটি ছিল। হায়! সেই 'পরশু' আর এলো না। আমি চলে যাবার ঘণ্টা দুই পরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরে রামলালের কাছে যা শুনেছি—খাওয়ার পরেই বল্লেন, 'রামলাল! শরীরটে কেমন করছে। মেঝেয় একটা মাদুর পেতে দে; আর নীচে দেবী (দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়)-কে খবর দে।' দেবী তাঁর দৌহিত্র। দোতলায় থাকতেন—আমারই প্রায় সমবয়সী। দেবী এসেই দেখলেন—তাঁর আর সাড়া নেই। ডাক্তার এসে বল্লেন, 'কিছু আগেই মারা গেছেন।' তাঁর মৃতদেহ ট্যাক্সি করে নৈহাটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে করুণাবাবু (যিনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন) বলেছিলেন, 'বি. টি. রোড ধরে এঁড়েদার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে মনে হল—তোমার সঙ্গে আর দেখা হল না।' পরে খবরের কাগজে দেখলুম বড় বড় অক্ষরে, 'পরলোকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।'

একদিনের ঘটনা বলি। সেদিন শনিবার—শীতকাল। আড়াইটা নাগাদ যেতেই তিনি বল্লেন, 'আজ বড় ঠাণ্ডা হে! চল বাইরে বসা যাক। বেশ রোদের ঝাঁজটা আছে।' বাইরে তিনি বেতের চেয়ারটিতে বসলেন—আর আমি একখানা মাদুর পেতে জলচৌকিটা (আমার লেখার টেবিল) নিয়ে বসলুম। কাজ শুরু করব, এমন সময় এসে হাজির হলেন বেলেঘাটার গণপতি সরকার মহাশয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন, 'এখন ওসব রাখুন। আগে আমার কাজটা করে দিতে হবে।' শাস্ত্রী-

মহাশয় বল্লেন, 'এসো হে গণপতি ! তোমার আবার কি কাজ ?' গণপতিবাবু বল্লেন, 'আমাকে বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাস বলতে হবে, গোড়া থেকে শেষ অবধি।' আমার দিকে চেয়ে শাস্ত্রী মহাশয় হেসেই বল্লেন, 'নাও হে। এখন কলম রাখ। তুমিও শোন।' লোকে যেমন ব্রতকথা শুনতে বসে, ঠিক তেমনি ভাবেই আমি আর গণপতিবাবু বসে শুনতে লাগলুম, তিনি বলে যেতে লাগলেন। সেই বৈদিক যুগে বুন্দেলখণ্ডের কি নাম ছিল—কি অবস্থা ছিল থেকে আরম্ভ করে পর পর ধারাবাহিকভাবে বলে যাচ্ছেন, আর আমরা শুনছি। বৈদিক যুগ—রামায়ণের যুগ—মহাভারতের যুগ—মৌর্য যুগ—গুপ্ত যুগ ছেড়ে এসে পড়লেন মুসলমান যুগে। সেই সময়ে দিল্লীতে কি অবস্থা—কে রাজা, বাংলায় কি অবস্থা—কে রাজা, দাক্ষিণাত্যে কি অবস্থা—কে রাজা,—সমস্তই টানা দিয়ে দিয়ে শেষ ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত ;—ঝাড়া দুটি ঘণ্টা। তিনিও অবিরল বলে যাচ্ছেন, আর আমরাও শুনে যাচ্ছি। আমরা যেন স্বপ্ন রাজ্যের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি যুগ থেকে যুগান্তরে। অবাক কাণ্ড! বুন্দেলখণ্ড আর কতটুকু রাজ্য। ইতিহাসে তাঁর importance-ই বা কি ? আর এই সমস্তইত সম্পূর্ণ হঠাৎ ! কোনো প্রস্তুতি নেই ! একেবারে extempore !

তখন হিন্দু স্কুলে মর্নিং স্কুল হত, এখন আর হয় না। আমি ভোরের ট্রেনে গিয়ে স্কুল করে শাস্ত্রী মহাশয়ের ওখানেই স্নানাহার করতুম। দুপুরবেলা তিনিও আমার সঙ্গেই খেতে বসতেন। বোশেখ মাসে নিমফুল ভাজা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। খেতে খেতে বল্লেন, 'এই নিমফুল ভাজা শুধু যে আমরাই খাচ্ছি তা নয়। সম্রাট অশোকও খেতেন। তাঁর খাদ্য তালিকার মধ্যে নিমফুলের কথা আছে।' খাওয়ার পর এক সঙ্গেই দুপুরের ঘুম সেরে কাজে বসতুম। যথারীতি ৮'৫০-এর ট্রেনে ফিরতুম। দেবীবাবু বলতেন, 'ঐ বুড়োর সঙ্গে এতক্ষণ সময় কাটান কি করে ?' আমার কিন্তু একটুও অসুবিধে হত না।

স্টারে শকুন্তলা নাটকের (এটি বাংলা নাটক, এর ৫০তম অভিনয় উপলক্ষে) জুবিলি হয়েছিল। এই সময়ে শকুন্তলা নাটকটি ছাড়া কালিদাসের কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশগুলির মূক অভিনয়ও হয়েছিল। কুমারসম্ভবের মদনভস্ম ব্যাপারটির মূকাভিনয়টি এখনও বেশ মনে পড়ে। জুবিলি উপলক্ষে স্টারের ম্যানেজার অপরেশ বাবু এসেছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে তাঁকে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ জানাতে। তিনি রাজি না হয়ে একটা ভাষণ পাঠাবেন বল্লেন ; আর আমাকে দেখিয়ে বল্লেন, 'এ-ই আমার হয়ে

সেখানে ভাষণটি পড়বে। তবে একে একটা family পাশ দিতে হবে, ওর বাড়ির লোকেরা আসবে।' সেই ভাষণটি (যার copy সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি) ছিল আমারই গণেশগিরি। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। এই প্রসঙ্গে বলি—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় চিরঞ্জীব শর্মা, কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, রত্নাকর শান্তি, বৃহস্পতি রায়মুকুট, বাগেশ্বর বিদ্যালংকার, পুরুষোত্তম দেব প্রভৃতি জীবনীপ্রবন্ধ ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ'-এর ভূমিকা—এগুলিও আমারই গণেশগিরি। তিনি বলতেন, 'বিদ্যাসাগর মশাই বিদেশী লোকদের কথা লিখেছেন তাঁর আখ্যানমঞ্জরীতে, আমি দেশী পণ্ডিতদের জীবনী লিখছি।'

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন কাজ-পাগল লোক, কাজ করে তাঁর মন পাওয়া খুব কঠিন ছিল। একবার ভাগ্যক্রমে কি-যেন কি একটা কাজে তিনি আমার ওপর খুব খুশি হলেন, বল্লেন, 'তোমায় কি বখশিস দেব, বলত?' আমি বল্লুম, 'কি আর দেবেন? ক-টা টাকা ত? তা আর আমার কদিন যাবে? তার চেয়ে আমায় বরং বাৎস্যায়নের কামসূত্রখানা পড়িয়ে দিন।' কথাটা শুনে একটু হেসে তিনি বল্লেন, 'ভাই, সে বয়স আমার আর নেই। কয়েকবছর আগে হলে হত।' (বলে রাখি—তিনি ছিলেন আমার শ্বশুরের শ্বশুর-মহাশয়ের বাল্যবন্ধু। সেই সম্পর্কে তিনি আমাকে নাত জামাই বলতেন, মাঝে মাঝে একটু আধটু আদিরসাত্মক ঠাট্টাও করতেন।) তার চেয়ে মেঘদূতটা পড়ে নাও। তখন ছিল বর্ষাকাল। মেঘদূত এর আগেও পড়েছিলুম কিন্তু তিনি যে কটা শ্লোক পড়ালেন, তাতে যেন ঐ কাব্যখানা সম্বন্ধে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী খুলে গেল। (তাঁর "মেঘদূত ব্যাখ্যা" পড়িনি—এখনও না)। শাস্ত্রী মহাশয় বল্লেন, 'এই মেঘদূত বুঝবো বলে পরপর তিন বছর গিয়েছি বর্ষাকালে রামটেক পাহাড়ে (এই রামটেকু পাহাড়ই মেঘদূতের রামগিরি)। Guide বেটা সেই বর্ষাকালে জঙ্গলভরা পাহাড়ে কিছুতেই উঠতে চাইল না। সে রইল নীচে,—আমি একলাই উঠে গেলুম পাহাড়ে। এইভাবে বুঝেছি মেঘদূতকে, মেঘদূতের এক একটা শ্লোক এক একটা landscape view।'

আর এক দিনের ঘটনা। সেদিনও শনিবার। স্কুলের পথে সকালে তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি বল্লেন, 'ওহে, আজ একটু সকাল সকাল এসো। আজ একজন international fame-এর লোক আসবেন।' স্কুলের পর গেলে বেলা ৩টা নাগাদ এলেন একজন university-র প্রফেসর (নামটা আর দিলুম না)। তিনি Later Buddhism সম্বন্ধে একখানা বই লিখে শাস্ত্রী

মহাশয়কে দিয়েছিলেন review করতে। প্রফেসার মহাশয় আসার আগেই শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের কথাবার্তাগুলো ভাল করে শুনো।' এ কথায় সে কথায় প্রাথমিক প্রশংসাগুলো সেরে শাস্ত্রী মহাশয় হঠাৎ প্রশ্ন কল্লেন, 'আচ্ছা, ঐ যে reference গুলো দিয়েছ, ঐ বইগুলো দেখেছ ত?' শুনে প্রফেসার মহাশয়ের মুখখানা একেবারে সাদা হয়ে গেল। শাস্ত্রী মহাশয় তখন বল্লেন, 'না। বইগুলো চোখে দেখেছ ঠিকই, কিন্তু ঐ জায়গাগুলো আর পড়ে দেখনি নিশ্চয়।' তারপর তিনি নিজেই বলে চল্লেন, 'দেখ আমরা এখন ও-পারের যাত্রী। আমাদের দেশের যা কিছু গৌরব, সব এখন তোমাদের হাতে। তোমরা যদি এই রকম blunder কর, তাহলে ত সব আশাই গেল। জিনিস গুলো খুঁটিয়ে দেখে তবে লিখো।' কিছুক্ষণ পরে প্রফেসার মহাশয় বিদায় হলে আমি আর থাকতে না পেরে বল্লুম 'আপনি আচ্ছা দুর্মুখ। ভদ্রলোককে ঐ রকম করে বল্লেন।' তাঁর মেজাজটা তখনো নাবেনি, তিনি বেশ ঝাঁজের সুরেই বল্লেন, 'বলবো না। বঙ্কিম থাকলে ওর কান মুলে হাত থেকে কলম কেড়ে নিত। ভুলটা কি রকম মারাত্মক দেখবে? আচ্ছা, পাড়ত ঐ দুখানা বই।' যতদুর মনে পড়ে একখানা বৌদ্ধ গ্রন্থ – মঞ্জুশ্রীমুলকল্পলতিকা, আর একখানা—তারই ইংরেজি অনুবাদ জাপানি পন্ডিত সুজুকির। মুল বইখানার একটা নির্দিষ্ট জায়গা খুলতে বল্লেন, আর তার অনুবাদটাও। দেখি—কি সর্বনাশ! সুজুকি পন্ডিত অনুবাদে একেবারে উলটো লিখেছেন। আর প্রফেসারটিও সেই ভুলেরই reference দিয়েছেন। আমার মনের ভাবটা বুঝে শাস্ত্রী মহাশয় শান্ত হয়ে বল্লেন, 'research করতে গিয়ে মুল বইটিই দেখতে হয়। সায়ের বাবাদের গুরু করতে নেই।'

আর একদিনের ঘটনা। সকালবেলা স্কুলের পথে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি একেবারে সমাধি মগ্ন। হাতে একখানা কার্ড। কোনো দিকে মন নেই। আমাকে দেখে বল্লেন, 'আজ তোমার ছুটি হে। আজ আর বিকেলে এসো না। এটার একটা কিনারা করতে হবে।' আমি জিজ্ঞেস কল্লুম, 'ওটা কিসের কার্ড?' তিনি কার্ডখানা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'দেখো।' দেখি—কার্ডের এক পিঠে ত নাম—ঠিকানা লেখা। আর এক পিঠে দুখানা ফটো। ওপরের আধ খানাতে—চাঁদ সুর্য তারা সমেত খানিকটা আকাশের মত, আর নীচের আধখানাতে একটা বাড়ির দেওয়ালে একটা বাঁ হাতের পাঞ্জার ছাপ। কার্ডখানা শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে ফেরৎ দিয়ে বল্লুম, 'কিছুই ত বুঝলুম না।' তখন তিনি বল্লেন, 'এখনই ঠিক বলতে পারছি

না। কাল এসো, বলবো।' তারপর দিন সকালে যেতে বল্লেন, 'ঠিক করে ফেলেছি। বিকেলে এসো, সব বলব।' বিকেলে যেতে তিনি বল্লেন, 'এ হচ্ছে—সেকলের সতীদাহ ব্যাপারের কথা। যে-নারী সতী হবে, সে যে কোন স্বর্গে যাবে, ওপরের ফটোয় তারই ইঙ্গিত। আর নীচেরটাতে সেই নারীর বাঁ হাতের পাঞ্জার ছাপ। মেয়েদের বাঁ হাতটাই প্রশস্ত কিনা। যে নারী সতী হবে, সে নববধূর মত কাপড় চোপড় গয়না গাটি পরে সেজেগুজে স্বামীর শবের অনুগমন করবে। শ্মশান পর্যন্ত পথের দুধারে যত বাড়ি পড়বে. সেইসব বাড়ির এয়ো স্ত্রী ও মেয়েরা একটা পাত্রে ফুল, চন্দন, সিঁদুর নিয়ে সতীর আসার অপেক্ষায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। সতী এসে পৌঁছলেই শাঁখ বাজিয়ে তাকে প্রণাম করবে, আর সেই সতী তার বাঁ হাতটি চন্দনে বা সিঁদুরে মাখিয়ে সেই বাড়ির দেওয়ালে এই রকম ছাপ দেবে। এই ছাপ গেরস্তর ভারি কল্যাণ চিহ্ন,—সে বাড়িতে কেউ বিধবা হবে না।' শুনে আমি বল্লুম, 'এ আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাও হতে পারে।' শাস্ত্রী মহাশয় হেসে বল্লেন, 'তা ত বটেই। সায়েব বাবাদের কথা না হলে কি বিশ্বাস হয়? বেশ খোলোত ভাই, ঐ Cunningham-এর report গুলির ঐ volume খোলা।' বইটা র‍্যাক থেকে পেড়ে তাঁর নির্দেশ মতন পাতাটা খুলে দেখি ঠিক ঐ ফটোই সেখানে দেওয়া আছে।

আর একদিনের মজার ঘটনা। ওঁর ওখানে গিয়ে জামাটা একটা পেরেকে টাঙিয়ে নিত্যকার অভ্যাসমত বাথরুমে যাবার পথে একটু দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে আর এক ভদ্রলোকের কথাবার্তাগুলো শুনছিলুম। উনি বলে উঠলেন, 'যাও না হে কর্তা! বৃন্দাবনটা সেরে এসো না।' আমি চলে গেলুম। ফিরে এসে দেখি ভদ্রলোকটি চলে গেছেন। জিজ্ঞেস কল্লুম, 'হঠাৎ বৃন্দাবন যাওয়ার কথা বল্লেন কেন?' উনি হেসে একটু অঙ্গভঙ্গী করে বল্লেন, 'হ্যাঁ, ঐ ভদ্রলোকের সামনে পাইখানা যাও বল্লেই বুঝি ভাল হত?'

আর একদিনের মজার কথা। আমি বিকেলে ঘরের ভেতর বসে মন দিয়ে কি একটা লিখছি, আর উনি বগলে crutch নিয়ে বাইরে ছাতে পায়চারী করছেন। হঠাৎ আচমকা আমার মনে হল, যেন দুটো বেড়াল ঝগড়া করতে করতে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখি—শাস্ত্রী মহাশয় দেওয়ালে crutchটা ঠেকিয়ে রেখে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে হাততালি দিচ্ছেন। বল্লেন, 'নাও। অনেকক্ষণ লিখেছ—একটু বাইরে বোস।' উনি তাঁর ফোকলা মুখে এমনই অদ্ভুত ভাবে বেড়াল ঝগড়ার অনুকরণ করতে পারতেন।

আর একদিনের ঘটনা। একদিন বিকেলে একজন লোক এসে তাঁর হাতে কি একখানা চিঠি দিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাকে বল্লেন, 'তা বেশ। তুমি একহপ্তা বাদে এস। আমি কাজটা করে রেখে দেব। আর নগেনকে বলবে, আমি যেন তার কাজ করেই দিলুম, সে আমার বন্ধুলোক। কিন্তু এ ছোকরাটিত সব লিখবে-টিখবে, ও কেন বৃথা খাটবে? নগেন যেন ওর জন্যে এক সের সন্দেশ পাঠিয়ে দেয়।' লোকটি ঘাড় নেড়ে চলে গেল। আমি তখন বল্লুম, 'কার কাছে আবার সন্দেশ বায়না দিলেন।' উনি বল্লেন, 'ও হচ্ছে নগেনের লোক (বিখ্যাত বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব)। কায়স্থরা যে একসময় বাংলাদেশের রাজা ছিল তার সপক্ষে কয়েকটা সংস্কৃত শ্লোক খুঁজে দিতে হবে।' আমি বল্লুম, 'সে কি! কায়স্থরা রাজা ছিল?' একগাল হেসে উনি বল্লেন, 'আরে, যেই কেন রাজা হোক না, তাতে আমাদের কি এসে গেল! আমাদের সন্দেশ নিয়ে কথা। ওরকম দু চারটে শ্লোক খুঁজে বের করা যাবে।' তখুনি একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেওয়া হল পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয়কে তাড়াতাড়ি দেখা করার জন্যে। উনি পূর্ণচন্দ্র বলতেন না,—বলতেন, 'পিদে বি এ' অর্থাৎ ঐভাবে P. De. B. A. বলেই পূর্ণবাবু নিজের নাম লিখতেন। উদ্ভটসাগর মহাশয়ের শ্লোক সংগ্রহ ছিল অগাধ। আগে কাব্যের আদ্য-মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় পূর্ণচন্দ্রের 'উদ্ভট সাগর' ১ম, ২য়, ও ৩য় তরঙ্গ যথাক্রমে পাঠ্য ছিল; এখন উঠে গেছে। পূর্ণবাবুর কাছ থেকে শ্লোকগুলো নিয়ে বেছে বেছে গোটা কতক একখানা কাগজে লিখে রাখা হল। এক সপ্তাহ বাদে বিকেলে যেতেই উনি ছেলে মানুষের মতন হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওহে! দিয়েছে হে! নগেন সত্যিই একসের সন্দেশ পাঠিয়েছে। আজ সকালে লোকটা সন্দেশ দিয়ে সেই শ্লোককটা নিয়ে গেছে। নাও, আজ আর মুড়ি মুড়কি আনাতে হবে না। আমাকেও দু চার খানা দাও, আর তুমি বেশ করে খেয়ে দেয়ে নাও, তোমার জন্যেইত আনা।' আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে বল্লেন—'আরে! ওরা বড়লোক। ওদের কাছ থেকে আদায় করে নিলে কোনো দোষ নেই।'

বাংলা শকুন্তলা নাটকের জুবিলির কথা আগেই বলেছি। ওই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বড় মেয়ে ও জামাই (রায়বাহাদুর ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ইনি পুরী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) এসেছিলেন তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে। একদিন বিকেলে কাজ করছি। এমন সময় তার বড় মেয়ে এলে উনি তাঁর কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বল্লেন—'এ হচ্ছে চন্ডীর (আমার শাশুড়ী

ঠাকরুনের নাম) জামাই।' আমার শাশুড়ী ঠাকরুন তাঁর বড় মেয়ের ছেলেবেলার খেলুড়ী ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মেয়ে জামাই একদিন শকুন্তলা নাটক দেখে এলেন। তারপর একদিন বিকেলে এসে তাঁর মেয়ে বল্লেন, 'না, বাবা! আমি মেয়ের বিয়ে দোব না। ঐ রকম করে ত মেয়ে পাঠাতে হবে!' শুনে শাস্ত্রী মহাশয় বল্লেন, 'তাহলে অপরেশবাবুর নাটক অভিনয়টা ভালই হয়েছিল বলতে হবে।'

লেখা অনেকখানিই হয়ে গেল। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলতে একটা আনন্দ আছে। কিন্তু আমারও বয়স হয়েছে (৭৫), অনেক ভুলে গেছি। তাঁর পদপ্রান্তে বসে পন্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি অনেক পন্ডিতদের চরণদর্শন ঘটেছে! সবকথা গুছিয়ে বলতে না পারলেও স্মৃতিগুলো এখনো বেশ মনে আছে। শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রণাম।

কালীপদ সেন

স্মৃতিচারণ

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি. আই. ই. ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। পিতৃদেব স্বর্গত পণ্ডিত কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র কবিচন্দ্র মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন-এর প্রিয় ও প্রধান ছাত্র ছিলেন। আমার শৈশবে আমাদের দর্জিপাড়ার বাড়িতে শাস্ত্রী মহাশয়ের যাতায়াত ছিল। পিতৃদেব শাস্ত্রী পরিবারের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। আমাদের বাড়িতে সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী কাগজ রাখা হত। একবার কী প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মশাই সম্পর্কে বঙ্গবাসী লিখেছিল, 'এবার শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার জাল গুটাইয়া লইতেছেন।' নয় দশ বৎসর বয়সেই আমি বঙ্গবাসী কাগজ পড়তে আরম্ভ করি। আমার বাঙলা ভাষা বোধের পক্ষে বঙ্গবাসী কাগজের দান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।—এর পরেই একদিন শাস্ত্রী মশায় আমাদের বাড়িতে এলে আমি বঙ্গবাসীর ঐ কথাটা উল্লেখ করি। বাবা আমার দিকে একবার কটমট করে তাকালেন, কিন্তু শাস্ত্রী মশাই-এর অট্টহাসি শুনে তিনিও শেষে হেসে ফেললেন। বাড়ির ভিতরে এসে বাবা আমার মাকে বললেন, 'তোমার ছেলের কাণ্ড শুনেছ? ন' বছরের ছেলে, অতবড় মানী লোকটার মুখের উপর বলে বসল,—এবার শাস্ত্রী মশায়ও তাঁর জাল গুটিয়ে নিচ্ছেন।' আমার শৈশব-স্মৃতিতে শাস্ত্রী মশাই সম্পর্কে আর কিছু মনে পড়ে না।

বাবাকে তিনি কয়েকখানি দামী শাল উপহার দিয়েছিলেন। নিষ্ঠাবান আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক হিসাবে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চিকিৎসার জন্য দর্শনী নিতেন না। শাস্ত্রী মশাই সেইজন্যই বোধ হয় শাল উপহার দিতেন। আমার পোনে-এগার বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, ১৯১১-র এপ্রিলে। বাবার মৃত্যুর

পর আমরা খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে কাকার আশ্রয়ে এসে বাস করতে থাকি। বাবা আমাকে ইংরাজী পড়ান নি—ছেলে ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে এই ভয়ে। কাকা আমাকে এ. বি. সি. ডি. শিখিয়ে সেনহাটী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেজন্য একটু বেশি বয়সে ১৯১৯ সালে আঠার অতিক্রম করে ম্যাট্রিক পাস করি। দৌলতপুর থেকে ১৯২১ সালে আই. এ. এবং বাঁকুড়া থেকে ১৯২৩ সালে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করি। পরীক্ষার ফল আমার বরাবরই খুব ভালো হত। কিন্তু ১৯২৩ সালে বি. এ. পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে মা-এর মৃত্যু হওয়ায় আমার পরীক্ষার ফল খুব ভালো হয় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ রকম ফল নিয়ে কোনো বৃত্তি পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই বুদ্ধি খরচ করে ঢাকায় শাস্ত্রী মশাই-এর কাছে একখানা চিঠি লিখি। আগেই কাগজে দেখেছিলাম যে, তিনি নবগঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙলা বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করছেন। অপ্রত্যাশিত স্বল্পকালে তাঁর কাছ থেকে জবাব পাই। তিনি লিখেছিলেন, 'তোমার চিঠি পাইয়া খুব খুশি হইয়াছি। তোমাদের ঠিকানা আমি জোগাড় করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। তোমার বাবাকে একশত টাকা দিবার একটা প্রতিশ্রুতি আমার ছিল। তুমি পত্রপাঠ এখানে চলিয়া আসিবে। তোমাকে সেই টাকা দিয়া আমি ঋণমুক্ত হইতে চাই। আর এখানে তোমার এম. এ. পড়িবারও একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিব।' আমি সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় রওনা হয়ে গেলাম। প্রথমে দক্ষিণ মৈসুণ্ডিতে আমার পিসিমার বাড়িতে উঠেছিলাম। সেখান থেকে খোঁজ করে এক সন্ধ্যায় ৪৪ নম্বর নীলখেত রোডে শাস্ত্রী মশাই-এর সরকারী বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমাকে আশীর্বাদ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের উপরে একশ টাকার একখানা চেক আমাকে লিখে দিলেন। তখন নীলখেত রোডের বাড়িতে বিনয়তোষ দাদা থাকতেন।

আমি সংস্কৃত শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর আমার দুটি সতীর্থ এসে গেল · শ্রীহট্ট থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী। আমি জগন্নাথ হলে (দক্ষিণ) থাকতাম। ওরাও এসে ওখানেই পাশাপাশি ঘর দখল করল। আমি বিশেষ পত্র হিসাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও পুরালেখ (Epigraphy ও Paleography) নির্বাচন করেছিলাম। ওরা দুজনেও বিশেষ পত্র হিসাবে তাই নিল। শাস্ত্রী মশাই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস আর অথর্ববেদের ১৫শ অধ্যায় পড়াতেন। অষ্টাধ্যায়ী পড়াতেন শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী। উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণ পড়াতেন গুরুপ্রসন্ন বেদান্তশাস্ত্রী। হর্ষচরিত পড়াতেন

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় পালি এবং পুরালেখ পড়াতেন। আমি যাতে একটি বৃত্তি পাই শাস্ত্রী মশাই সেজন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। আমার দুই সতীর্থ সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান লাভ করেছিল বলে দুজনেই বত্রিশ টাকা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েছিল। আমাকে বত্রিশ না হলেও অন্তত ষোল টাকার আংশিক বৃত্তি দেওয়া যায় কিনা তার জন্য শাস্ত্রী মশাই বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে খুব চেষ্টা করেন। কিন্তু উপাচার্য হার্টগ সাহেব বললেন, 'তোমার তিনটির মধ্যে দুটি তো বৃত্তি পেয়েছে। তাছাড়া আর যে তিনটি বৃত্তি আছে তা মুসলমান ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত।' আমি অবশ্য জগন্নাথ হল স্টাইপেন্ড হিসাবে পনের টাকা করে পাচ্ছিলাম। ১৯২৩ সালে গোটা তিরিশ বত্রিশ টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে আমি ঢাকাতেই থেকে যেতাম। বাড়ি থেকে আমার কোনো আর্থিক সাহায্য পাবার আশা ছিল না। কাজেই ২৩ সালের বড়দিনের ছুটিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ক্লাসে ভর্তি হব বলে আমি ঢাকা থেকে চলে এলাম। আগেই আমি স্নাতকোত্তর বিভাগের সেক্রেটারি গৌরাঙ্গবাবুকে চিঠি লিখেছিলাম এবং তিনি আমাকে আহ্বান করেছিলেন। আমি ঢাকা ছেড়ে চলে আসায় শাস্ত্রী মশাই খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন বুঝতে পারিনি, পরে তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম। ১৯২৭ সালে বাঙলায় এম. এ. পাস করার পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন, 'ঢাকাতে তুমি আমার বাসায় থেকেই পড়াশুনো করবে মনে করেছিলাম। কিন্তু যখন জগন্নাথ হলে চলে গেলে তখন মনে করেছিলাম, ওখানে থাকার খরচ নিশ্চয়ই তুমি জোগাড় করতে পারবে। ঢাকায় থাকলে তুমি যে ভালো ফলই করতে এটা আমি শ্রীশ, গুরুপ্রসন্ন, রাধাগোবিন্দ, ননী এদের কাছে জেনেছিলাম। যাক, কলকাতায় এসে তুমি ভালোই করেছিলে, অনেকগুলি সোনার মেডেল পেয়ে গেছ।'

ক্লাসে শাস্ত্রী মশাই কোনো বই ধরে পড়াতেন না। মুখে মুখেই বলে যেতেন এবং প্রসঙ্গত প্রচলিত অনেক মতের নিরসনও করতেন। অথর্ববেদের ব্রাত্যদের দেবতা ছিলেন মহাদেব, এই ব্রাত্যগণ আর্যবংশীয় হলেও মূল আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন একথা তিনি বলতেন। শংকরাচার্য সম্পর্কে একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, ভাষ্যকার অদ্বৈতবাদী শংকর এবং বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্র-রচয়িতা শঙ্কর সম্ভবত এক ব্যক্তি নন। পরবর্তী কোনো শংকর গঙ্গা-স্তোত্র প্রভৃতি লিখে থাকবেন। মেঘদূতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কালিদাস বর্ণিত ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা খুব মনে লেগেছিল। প্রবোধ, নরেন এবং আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর টীকা-টিপ্পনী লিখে রাখতাম।

১৯২৩ সালে বৎসরের শেষভাগে আমার বাঙলা ক্লাসে ভর্তি হওয়া হল না। ২৪ সালে বি. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্যে 'বন্য হংস তাড়না' করে বেড়ালাম। ২৫ সালের আগস্ট মাসে বাঙলা এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলাম। ১৯২৭ সালে পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে এবং কয়েকটি পদক লাভ করে ২৬ নম্বর পটলডাঙার বাড়িতে শাস্ত্রী মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শাস্ত্রী মশাইকে একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং শাস্ত্রী মশাইও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সেনেটর হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়কে পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমার পাদকগুলি দেখে তিনি আহ্লাদে ডগমগ হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির পাশেই সেকরার বাড়ি ছিল। সেখান থেকে সেকরা ডাকিয়ে এনে মেডেলগুলি ওজন করিয়ে বললেন, 'আরে বাবা! সাড়ে তের ভরি সোনা পেয়েছো। আমি এর চার ভাগের এক ভাগও পাইনি।' বাঙলায় পাঁচ পাঁচটি সোনার মেডেল পাবার কারণ, স্যার আশুতোষের 'এন্‌ডাউমেণ্ট' ব্যবস্থা। আমি ভারতীয় ভাষা বিভাগে সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ায় পাঁচটি সোনার এবং একটি রুপোর মেডেল, আর শ' তিনেক টাকার বই পুরস্কার পেয়েছিলাম।

এই সময়ে শাস্ত্রী মশাই ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক সম্পাদক। এখনকার অধ্যাপকেরা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, অত বড় বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হিসাবে মাত্র তিনশ' টাকা পেন্‌শন পেতেন। আর পেতেন এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তিনশ' টাকা। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে থেকে গবেষণা আরম্ভ কর। আর আমি যে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিতব্য পুরাণ সম্বন্ধীয় প্রাচীন পুথির বিস্তৃত বিবরণ যুক্ত তালিকা তৈরি করছি, সেটি লিখে নেবার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। আমি মুখে মুখে বলে যাব, তুমি লিখে যাবে। অর্থাৎ তুমি হবে আমার গণেশ।' এক মাস কাজ করার পর তিনি কড়কড়ে দশ টাকার পাঁচ-খানি নোট একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময়ে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে মৃদু প্রতিবাদ করাতে তিনি বললেন, 'তুমি বিয়ে করেছ, একটি ছেলেও হয়েছে। আমার এখানে কাজ না করে প্রাইভেট টুইশনি করেও তুমি কিছু আয় করতে পারতে। আমি তোমাকে ভোর থেকে সন্ধ্যোর পর পর্যন্ত খাটিয়ে নিচ্ছি। যেজন্য খাটাচ্ছি, সেজন্য এশিয়াটিক সোসাইটি আমাকে টাকা দেয়। তার থেকে সামান্য কিছু আমি তোমাকে দিলাম। তোমার হাত খরচ চালিয়ে নিও।'

শাস্ত্রী মশাই-এর কলকাতার বাড়িতে তেতলার ঘরে ছিল লাইব্রেরি। অতি

সমৃদ্ধ সে গ্রন্থশালা। এখানে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। স্যার যদুনাথ সরকার, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর আদিত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর বিমলাচরণ লাহা, অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার গোস্বামী, এঁদের অনেকের সঙ্গেই এখানে আমার পরিচয় হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির ক্যাটালগ লেখার ফাঁকে ফাঁকে দিন পনের-ষোল ধরে সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্বের যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল, সেটি সম্পাদনা করেন। এ বই ছাপার এবং প্রুফ দেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সাহিত্য পরিষৎ-এর পণ্ডিত মশাই তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের উপরে। শাস্ত্রী মশাই এর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। এটি তিনি মুখে মুখে বলতেন, আমি লিখে নিতাম। এই ভূমিকার শেষ দিকে কাশীরাম দাসের কালের বাঙলা ভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা এবং দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ লেখার দায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছিলেন এবং সেটি ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে আমার কথা ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি কমলা বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত তাঁর কয়েকখানি বই এর ভাষার পরিমার্জনা করার সংকল্প করেন। মোটামুটি বাঙলা শব্দ পেলে তৎসম শব্দ বাদ দেওয়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। 'দুর্গ অধিকার করিলেন' না লিখে তিনি লিখতেন, 'কেল্লা দখল করিলেন'। দুপুরে খাবার পরে তিনি একটু বিশ্রাম করতেন। তাঁর ভাষায়,—'রাজবৎ আচরণ' করতেন (ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ)। আমাকে বলতেন, তুমি এই অবসরে যেভাবে দেখিয়ে দিলাম সেই ভাবে ভাষা সংশোধন করে যাও। আমি হয়তো পনের-ষোল পৃষ্ঠা দেখে দিলাম। তিনি উঠে বলতেন, 'দেখি', বলে লেখা চেয়ে নিয়ে দেখে বলতেন, 'ও বাবা! তুমি যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরও উপর দিয়ে যাও।' অর্থাৎ আমার কাজ দেখে খুশি হয়েছেন বোঝা যেত। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটির শেষ দিকে একটি পরিচ্ছেদ ছিল, 'ভারতে ইংরাজ শাসনের সুফল।' তিনি বললেন, 'ইংরেজের স্তাবকতা অনেক করা গেছে এবং প্রসাদও কিছু মিলেছে। কিন্তু এই ৭৬ বৎসর বয়সে মিথ্যা কথা আর লিখতে পারব না। পারলে সুফল কেটে কুফল বসতাম। কিন্তু তাহলে আমার বইখানি আর চলবে না। জানো, এই বইখানি এ পর্যন্ত আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে দিয়েছে। পটলডাঙার বাড়ি এই বই-এর টাকাতেই কেনা। যাক, তুমি পরিচ্ছেদের নাম লেখ—ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ফল।'

তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিমাপ করা সে বয়সে কেন, এখনও আমার সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। একবার কথাপ্রসঙ্গে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি লিখেছ,—শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবত ভ্রমবশতঃ এই কথাটি লিখিয়াছেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কখনো ভ্রমবশতঃ কিছু লেখে না।'

২৭/২৮ বৎসর বয়সের যুবক আমি তাঁর কর্মশক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ভোর ছ'টা থেকে এগার-বারটা পর্যন্ত, আবার দেড়টা দুটো থেকে রাত্রি সাতটা-আটটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে কাজ করে যেতেন। আমার স্নানাহার ওখানেই হত এবং বিশ্রামেরও একটা নির্ধারিত সময় ছিল। আমি যুবক হয়েও যে কাজে হাঁপিয়ে উঠতাম,—সে কাজে প্রায় অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের কোনো ক্লান্তি দেখিনি। সকাল বেলায় বড় এক বাটি গরম দুধ চায়ের মতো সেবন করতেন। দুপুরে আহারের পর একটু 'রাজবৎ' করে নিতেন। একাদশী থেকে পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যা পর্যন্ত পাঁচদিন সাবুর খিচুড়ি খেতেন। পানিফলের ময়দা সংগ্রহ করে তাই দিয়ে লুচি কিংবা রুটি তৈরি করিয়ে খেতেন। অভ্যাসের মধ্যে নস্য নেবার অভ্যাস ছিল। আমিও ছিলাম নস্যখোর। দু-একবার আমার কৌটা থেকে নস্য নিয়ে নাকে ঠেকিয়ে বলতেন, 'ওরে বাবা, এ যে বেজায় কড়া। Please soften a bit' তাঁর খাস চাকর রামলাল দোক্তাপাতা কিনে এনে চুন মাখিয়ে ছাদের উপরে শুকিয়ে গুঁড়ো করে, ভালো করে ছেঁকে হরলিকস-এর বোতলে ভর্তি করে রাখত। সে নস্য আমিও দু-একবার টেনেছি। কোনো আনুষ্ঠানিক উপাসনা বা পূজা-অর্চনা তাঁকে করতে দেখিনি। তবে ভোরবেলায় বিছানার উপরে বসে কিছুক্ষণ জপ করতে দেখতাম। বোধহয় গায়ত্রী জপ করতেন। কিন্তু আচারে তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যেত।

এইখানে আমার পিতৃদেব প্রসঙ্গে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একদিন শাস্ত্রী মশাই আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ তোমাদের বাবা তোমাদের অতি অল্পবয়সে অসহায় অবস্থায় রেখে মারা গেলেন। চিকিৎসায় তাঁর যে হাতযশ ছিল তাতে কোনো রাজা রাজড়ার চিকিৎসার জন্যে আহূত হলে তিনি ঐ একান্ন বৎসর বয়সের মধ্যে তোমাদের জন্যে বেশ কিছু অর্থ রেখে যেতে পারতেন। আমরা জানতাম যে, তেমন সুযোগ তাঁর জীবনে নিশ্চয়ই আসবে। তখন তো জানতাম না যে, এসব ব্যাপারেও আবার দালালি চলে?' বললেন, 'কলকাতার একজন বিখ্যাত কবিরাজ এক বিশিষ্ট দেশীয় রাজার চিকিৎসা করতে গিয়ে একমাসে ৮০ হাজারের উপর টাকা নিয়ে এসেছিলেন। আমরা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কিছু দানের জন্যে তাঁকে অনুরোধ করতে গেলে

তিনি বললেন যে, রাজাবাহাদুর তাঁকে ৮০ হাজার টাকাই দিয়েছেন বটে, কিন্তু ওর শতকরা পঞ্চাশ টাকা কলকাতার একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তির। রাজ-রাজড়ার দূতেরা এসে তাঁর বাড়িতেই উঠত। তিনি যে চিকিৎসক নির্বাচন করে দিতেন, তারই কপাল খুলত। কিন্তু তার আগে নাকি এ সম্বন্ধে দলিল সম্পাদন করে নিতেন। তোমার বাবাকে যতদূর জানতাম তাতে এরকম শর্তে অর্থ উপার্জন করতে তিনি রাজি হতেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা নেপথ্যে তাঁর অজ্ঞাতে এঁর একটা ব্যবস্থা করতাম। হলে তোমাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হত।'

বাবার চিকিৎসা নৈপুণ্য সম্পর্কে একটি গল্প তিনি ঢাকাতে এবং কলিকাতার বাড়িতে কয়েকবার বলেছিলেন। শাস্ত্রী মশাই-এর দ্বিতীয়া কন্যা সুরবালাদিদির দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত আগে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। ১০৪/৫ ডিগ্রি জ্বর আর নামে না। সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষপর্যন্ত ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর শরণাপন্ন হলে তিনি এসে অস্ত্রোপচারের কথা বললেন। সেই অনুযায়ী পর দিন সকালে বাড়িতে অস্ত্রোপচারের সমস্ত ব্যবস্থা করা হল। শাস্ত্রী মশাই বললেন, 'হঠাৎ তোমার বাবা বিকালে এসে উপস্থিত। তিনি সুরবালাকে দেখতে চাইলেন। আমি মনে মনে একটু সংকুচিত হয়ে পড়লাম। পরদিন সর্বাধিকারী অস্ত্রোপচার করবেন ঠিক হয়েছে, এখন উনি দেখে আর কী করবেন? আমার পারিবারিক চিকিৎসক, কাজেই না-ও বলতে পারলাম না। তিনি নাড়ী দেখে, সব শুনে নিয়ে বললেন, কাল অস্ত্রোপচার বন্ধ করতে হবে। আমাকে একটা বেলা সময় দিন। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, সে কী করে হবে? ডাক্তার সর্বাধিকারীকে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তিনি নিজে সব স্থির করে গেছেন, সাড়ে আটটায় এসে অস্ত্রোপচার করবেন, এখন কী করে তা বদলানো যায়? তোমার বাবা নাছোড়বান্দা। বললেন, আমার অনুরোধে আপনাকে এ কাজটি করতেই হবে। আমি তাঁকে বসিয়ে তখনই সর্বাধিকারীকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম একদিন দেরি করা সম্ভব কিনা। সর্বাধিকারী রাজী হলেন। তোমার বাবা বললেন কিছু বিড়ালের শুকনো বিষ্ঠা সংগ্রহ করতে হবে। বিড়ালের বিষ্ঠার কোনো অভাব হল না। তোমার বাবা সেগুলি গুঁড়িয়ে ধুনোর মতো করে রাখতে বললেন। একটি নতুন ধুনুচিও সংগ্রহ করতে বললেন। অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে তাঁর কথা মতো সবই করালাম। তোমার বাবা সকাল বেলায় এসে আবার সুরবালার নাড়ী দেখে একখানা কম্বলে তার আপাদমস্তক ঢেকে দিলেন। ধুনুচিতে টিকে ধরিয়ে

গুড়োনো বিড়াল-বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং নিম্নাঙ্গ থেকে মাথা পর্যন্ত সেই ধোঁয়া তার গায়ে লাগাতে লাগলেন। সন্ধ্যার আগেই জ্বর বিরাম হল এবং সুস্থ পুত্রসন্তান প্রসব করল। আমি আশ্চর্য হয়ে তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—এই ওষুধ আপনি কোথায় পেলেন? তোমার বাবা বললেন,—একখানা হাতে লেখা পুঁথিতে পেয়েছি। এর দৃষ্টফল দেখার লোভেই আমি এত জেদ ধরেছিলাম।' সুরবালাদেবীর দ্বিতীয় সন্তান পুনে[১] হল সেই ভূমিষ্ঠ সন্তান। শাস্ত্রী মশাই হেসে বললেন, 'এ একেবারেই তোমার বাবার দান। এর এখন ২৪-২৫ বছর বয়স। এখনও এ আমার কাছে এলে আমি যেন এর গা থেকে বিড়ালের বিষ্ঠার গন্ধ পাই।'

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিরোধের মূল কারণটা কী? শুনেছি আগেতো আপনাদের দু জনের মধ্যে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল। আপনার পাঁচ ছেলের সকলেরই নাম আশুতোষের দ্বিতীয়ার্ধ নিয়ে 'তোষ' সংযুক্ত এবং আশুবাবুর ছেলেদের সকলের নাম আপনার নামের দ্বিতীয়ার্ধ 'প্রসাদ' সংযুক্ত। শাস্ত্রী মশাই বললেন, 'হ্যাঁ সম্প্রীতি খুবই ছিল। কিন্তু বিরোধ বাধল তার বিধবা মেয়ে কমলার বিবাহ দেওয়া নিয়ে। আমি তা কখনো সমর্থন করিনি, করবোও না। এই নিয়ে স্বার্থান্বেষী কতকগুলি লোক আশুর কাছে গিয়ে অর্ধসত্য মিথ্যা নানা কথা বলে তাকে একেবারে বিগড়ে দিয়েছে।'

আশুবাবু শাস্ত্রী মশাই-এর উপরে এত বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজেই তাঁকে ডাকতেন না। সরকার তাঁকে সেনেটের প্রতিনিধি মনোনীত করতেন বলে সেখান থেকে সরাতে পারেন নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজেই তাঁকে ডাকা হত না। যখন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কারমাইকেল অধ্যাপক পদটির সৃষ্টি হল, তখন ঐ পদটির জন্য প্রার্থী হতে তাঁকে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ইত্যাদি কয়েকজন অনুরোধ করেছিলেন। শাস্ত্রী মশাই বলেছিলেন, লিখিত আবেদন করতে পারবেন না। তবে যেচে দিলে নেবেন। অধ্যাপক নির্বাচনের সভায় শাস্ত্রী মশাইয়ের সমর্থকগণ তাঁর নামটি প্রস্তাব করলে স্যার আশুতোষ শুষ্ক হাসি হেসে বলেন, শাস্ত্রী মশায়ের যোগ্যতা বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বোম্বাই থেকে স্বয়ং ভাণ্ডারকর আসতে চাইছেন।

শাস্ত্রী মশাইয়ের সমর্থকেরা জানলেন যে, প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর অন্যতম প্রার্থী, তখন তাঁরা আর শাস্ত্রী মশায়ের নিয়োগ

---

১. [শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।]

নিয়ে বিতর্কে নামতে চাইলেন না। পরে শাস্ত্রী মশাই যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কে আসতে চান ? রামকৃষ্ণ গোপাল, না তাঁর ছেলে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ?' তাঁরা দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর যে কে তাই জানতেন না। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরকেই নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কাহিনীটি আমি স্বর্গত অশোকনাথ শাস্ত্রীর কাছে শুনেছি।

আগেই বলেছি, শাস্ত্রী মশাই এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগের সম্পাদক ছিলেন এবং এই পদের বৃত্তি ছিল মাসিক তিনশ টাকা। একবার আশুতোষ সোসাইটির সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী হলে শাস্ত্রী মশাই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়ান এবং আশুতোষকে ভোটে পরাস্ত করে সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। শাস্ত্রী মশাই এই প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি আশুকে বললাম,—তোমাকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যই আমি মাসিক তিনশ টাকার মায়া ত্যাগ করলাম।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। এঁদের উভয়ের কথা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বলতেন। বিদ্যাসাগরের কৌতুককর দু একটি কাহিনী বলেছিলেন। একদিন বললেন, 'ইষ্টুপিট্ (stupid) শব্দের ব্যুৎপত্তি জান ? বিদ্যাসাগর বলতেন, ইষ্টং পিনষ্টি যঃ স ইষ্টুপিট্— ইষ্ট— √পিষ্ + ক্বিপ্। বালন্টিয়ার (volunteer) শব্দের বিদ্যাসাগর নির্ণীত ব্যুৎপত্তি হল বাল √tear + খ। শাস্ত্রী মশাই বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে একসময়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। আচার অনুষ্ঠান এবং অন্য অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল বলে আমার মনে হয়।

আশুবাবুর মৃত্যুসংবাদ যখন শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে পেঁছুল তখন, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কালীতোষ ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছি, তিনি কোঁচার খুট্ তুলে অশ্রু মার্জনা করতে করতে বলেছিলেন, 'মানুষটা শেষে বিদেশে বিভুঁই-এ এভাবে প্রাণটা খোয়ালো!' কাজেই উভয়ের মধ্যে যে একটা গভীর সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল এক সময়ে, সেটা সম্পূর্ণ সত্য। আমার কাছে শাস্ত্রী মহাশয় এক সময়ে বলেছিলেন, 'এই বিরোধের জন্যে আমাকে কম ভুগতে হয় নি। বিশেষ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়তোষকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কাজ দেওয়া গেল না, শেষ পর্যন্ত বহু দূরে বরোদায় তাকে পাঠাতে হল। কিন্তু এর জন্য আশুবাবুকে পুরো দোষী করা উচিত হবে না। আশুবাবুর মন বিষিয়ে দিয়েছিল পূর্বে আমারই প্রসাদভোগী একদল স্তাবক। আশুবাবুর অনুগ্রহ লাভ করবে এই প্রত্যাশায় তারা আমার নামে অনেক মিথ্যা কথা তার কাছে রটনা করত।'

নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর সঙ্গে শাস্ত্রী মশাই-এর বেশ সম্প্রীতি ছিল। বাগবাজার এ. ভি. স্কুলে যখন ৭৫ বৎসর বয়স পূর্তি উপলক্ষে রসরাজকে সম্বর্ধনা জানানো হয়, সেই সভায় শাস্ত্রী মশাই সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং নিজে তাঁকে রুপোর দোয়াত কলম উপহার দিয়েছিলেন। এই সভায় তিনি রসরাজের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দেন। এর কিছুদিন বাদে মিনার্ভায় অমৃতলালের 'যাজ্ঞসেনী' অভিনয়ের প্রথম রজনীতে শাস্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে আমিও রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলাম। তিনি 'যাজ্ঞসেনী' নাটকের প্রশংসা করে সংবাদপত্রে একখানি পত্রও লিখেছিলেন।

প্রতি শনিবারে সন্ধ্যায় তিনি নৈহাটিতে যেতেন এবং সোমবার সকালে ফিরে আসতেন। এক সোমবারে গিয়ে দেখি যে তার পূর্ব শনিবারে তাঁর আর নৈহাটি যাওয়া হয় নি। শিয়ালদার মোড়ে হ্যারিসন রোডের উপর কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর এক পা ভেঙে যায়। তারপরের দিনগুলি এই বর্ষীয়ান অথচ সর্বদা কর্মচঞ্চল মানুষটিকে অত্যন্ত কষ্টে কাটাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি বলতেন, 'বাবা কালী, excruciating pain!' তার জন্যে ঘরে একটি চাকাওয়ালা চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই চেয়ারে বসে তিনি টেবিল থেকে বই-এর র‍্যাকগুলির কাছে সহজেই যেতে পারতেন। উপরের তাকে বই থাকলে আমাদের সাহায্য নিতে হত।

তাঁর সংগৃহীত বই-এর মধ্যে বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, অলংকার, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে বহু দুষ্প্রাপ্য বই ছিল। আর ছিল ইউরোপের এবং ভারতের সমস্ত বড় লাইব্রেরির বিভিন্ন Descriptive catalogue. একবার মাদ্রাজ catalogue-এর কয়েকখানি উই-এ নষ্ট করায় তিনি তিন-চারখানি catalogue আবার তিনশ টাকায় সংগ্রহ করেছিলেন মনে আছে।

অতবড় পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু আমাদের কাছে মোটেই রাশভারী ছিলেন না। অনেক সময় হাস্যকৌতুকে আমাদের উৎফুল্ল করে তুলতেন। কাজের চাপ বেশি হলে মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে আমাকে রাত্রিবাস করতে হত। আমার শোবার ব্যবস্থা হত দোতলায় কালীতোষের শোবার ঘরে। কালীতোষ অনেক সময়ে নৈহাটিতেই থাকতেন। একবার কলকাতায় এসে সে রাত্রে আর নৈহাটি ফিরলেন না। কাজেই আমার শোবার ব্যবস্থা হল একতলার বৈঠকখানা ঘরে। শাস্ত্রী মশাই তা জানতে পারেন নি। তিনি সকালবেলায় যথারীতি আমায় তলব করলে দোতালায় কালীতোষের ঘরে আমায় পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কাছে গেলে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি কি কালরাত্রে দমদমায় গিয়েছিলে?' আমি বললাম,—'কাল কালীতোষ এখানে থাকায়—'

অমনি পাশ থেকে তাঁর খাসচাকর রামলাল চাপা গলায় আমাকে বলল, 'ও কথা বলতে নেই।' আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। চতুর শাস্ত্রী মশাই সবই বুঝে ফেললেন। বললেন,—'ও, কাল কালীবাবু বুঝি এখানে রাত্রিবাস করেছেন? তাই তোমাকে একতলায় যেতে হয়েছিল! তাইত বলি কেলোর মা গুড় কেন মিঠে লাগে না! কালীর বিচুলি যে আমি এখানে রেখে দিয়েছি! বিচুলি কি জান? দুষ্টু গোরু যখন ছুটে যায় তখন তাকে বাগে আনবার জন্যে এক আঁটি বিচুলি সামনে ধরে নাড়লে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে, তখন তার গলায় আবার দড়ি পরানো হয়।' কালীতোষের কাছে এ গল্পটি হাসতে হাসতে বলায় সেও হাসতে হাসতে বলেছিল, ঠাট্টা তামাশা করার সময় বুড়োর আর পাত্রাপাত্র ভেদবোধ থাকে না।

একবার এক সাহিত্যসভায় অন্ধ কবি ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে শাস্ত্রী মশাই বললেন,—'অন্ধের প্রস্তাব খোঁড়ায় সমর্থন করছে।' আর একবার আমাকে বললেন,—'কালী, তুমি কলেজে যাবে তো?' তখন আমি হুগলি কলেজে কাজ করি। আমি যাব বলায় তিনি বললেন,—'ভেগো বৈরাগীকে কালই আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।' ভেগো বৈরাগীটি কে জানতে চাইলে বললেন,—'আহা তাও জানো না। তোমাদের মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী হলেন আমার ভেগো বৈরাগী।' ভাগবত শাস্ত্রীকে একথা বলায় তিনি বললেন, 'হ্যাঁ ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি আমাকে ঐ নামে ডাকেন।'

শাস্ত্রী মশাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করেই সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধিটি দিতেন। অব্রাহ্মণ কোনো পন্ডিত এই উপাধি লাভ করেন এটি শাস্ত্রী মশাই-এর অভিপ্রেত ছিল না। এ নিয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে তর্ক করার স্পর্ধা করেছিলাম। আমি বললাম,—'দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ, বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ এঁরা তাহলে এই উপাধি পেলেন কি করে?'

তিনি বললেন,—'দ্বারকানাথ আর বিজয়রত্নের কথা ছেড়ে দাও, সে অনেক আগের কথা। সম্ভবতঃ ভুলবশতঃ এটি হয়েছিল। আর হালে যে গণনাথ উপাধি পেয়েছেন, সেটি লাটসাহেবের একসিকিউটিভ কাউন্সিলর বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতবের অনুগ্রহে। তাঁর প্রত্যক্ষশারীরম্ ইংরাজী অ্যানটমির অনুবাদমাত্র। এতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাবার মতো পান্ডিত্য আছে কি না বলতে পারি না। তাছাড়া কবিরাজ মশাইদের পান্ডিত্যের জন্য বৈদ্যরত্ন উপাধিটির সৃষ্টি হয়েছিল।' আর একজন কবিরাজ মশাই নিজের

নামের শেষে এম. এ. ট্রিপল্ লিখতেন। তিনি একখানি চিকিৎসাগ্রন্থ লিখে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলেন। শাস্ত্রী মশাই ছিলেন অন্যতম বিচারক। ঐ গ্রন্থে সিফিলিস, অর্থাৎ ফেরঙ্গরোগকে ফিরিঙ্গিদের দ্বারা আনীত রোগ এই অর্থ না করে প্রিয়াঙ্গ>ফিরঙ্গ এইরূপ ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছিল। শাস্ত্রী মশাই নীলদর্পণের উড সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন', 'বড় পণ্ডিত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য থীসিসটি তাঁর অনুমোদন পায়নি।

একবার বর্ধমান থেকে গুপ্তযুগের অক্ষরে লেখা একখানি তাম্রলিপি পাঠোদ্ধারের জন্য তাঁর কাছে আসে। তিনি অ্যাসিড দিয়ে সেখানিকে ঝকঝকে পরিষ্কার করিয়ে এনে আমাকে বললেন, 'তুমি তো ঢাকায় প্রত্নলিপি নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করেছিলে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, রাধাগোবিন্দ বাবুর কাছে শিখে আমি ব্রাহ্মী লিপি একরকম রপ্ত করেছিলাম।' তিনি বললেন, 'এসো, এবার তোমাকে গুপ্তলিপি শেখাই।'

তিনি দুখানা গ্রাফ্ পেপারের খাতা আনালেন এবং তাঁর সংগৃহীত Buhlar সাহেবের গুপ্তযুগের অক্ষরের চার্ট বের করে আমাকে গুপ্তযুগের লিপি শেখালেন। তারপর ঐ তাম্রলিপির এক একটি অক্ষর ধরে ধরে গ্রাফ্ পেপারের ফাঁকে ফাঁকে অক্ষরগুলিকে ব্যুল্যার Buhlar সাহেবের নির্দেশিত পন্থায় আধুনিক বাঙলা হরফে রূপান্তরিত করে বসাতে লাগলাম। মোটের উপর তাঁর পাঠোদ্ধার এবং আমার পাঠোদ্ধার প্রায় মিলে গেল। কেবল একটি জায়গায় তিনি যে অক্ষরটিকে 'চ' ধরেছিলেন আমি তাঁকে 'ব' ধরেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, 'চেল্লকাগ্রহার'; আর আমি লিখেছিলাম 'বেল্লকাগ্রহার'। তিনি বললেন, 'এটি তোমারই ভুল। ওটি ব নয় চ-ই হবে কেননা আমার শ্বশুর বাড়ির কাছে চেল্লা বলে জায়গা এখনও আছে।' আমি বললাম, 'আপনি যাই বলুন ব্যুল্যার সাহেব যেভাবে অক্ষর পরিচয় দিয়েছেন তাতে এটা কিছুতেই চ নয় ব-ই হবে!' তিনি আবার সেই রসিকতা করে বললেন, 'বড় পণ্ডিত হইয়াছে। কাল তোমাকে অক্ষর শেখালাম, আর আজই আমার ভুল ধরছ!' হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি নাচার'। চার্ট নিয়ে দেখালাম —দেখুন 'ব' এবং 'চ'-এ এই তফাৎ। তিনি বললেন, 'কী বিপদ, চেল্লা বলে গ্রাম যে এখনও রয়েছে।' 'মাফ করবেন, ওটা আপনার—obsession,' আমি হাসতে হাসতেই বললাম। বর্ষাকাল এসে পড়েছিল। প্রায়ই মেঘলা থাকত। তিনি বললেন, 'বর্ষা যাক। এর পরে ধীরে সুস্থে আবার পাঠোদ্ধারের কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে।' ১৫-২০ দিন বাদে একদিন প্রখ্যাত

প্রত্নলিপিবিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সকালে এসে উপস্থিত হলেন। একথা সেকথার পর শাস্ত্রীমশাই বললেন, 'ভাল কথা, কালী, আমাদের সেই তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারের খাতা নিয়ে এসোতো। রাখালকে দেখিয়ে নিই। প্লেটখানাও নিয়ে এসো।' রাখালবাবু নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ দেখে বললেন, 'কবিরাজমশাই-ই correct। এটা চেল্লকাগ্রহার নয়, বেল্লকাগ্রহারই হবে।' ছাত্রাবস্থায় রাখালবাবু শাস্ত্রী মশাই-এর বাসাতেই আমার বাবাকে জানতেন। তাই তিনি আমাকে কবিরাজ মশাই বলে উল্লেখ করলেন। রাখালবাবু আমাকে বললেন, 'stick to your gun, ও'র আশ্রয় ছাড়বেন না। ও'র এই টেবিল থেকে আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি লোক ডক্টরেট পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছি।'

একবার কম্বোজের চম্পা সম্বন্ধে লেখা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ তাঁর কাছে এসেছিল। সরকারি খরচে অধ্যাপক মজুমদার কম্বোজ ভ্রমণে যান এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বই খানা নাড়াচাড়া করে শাস্ত্রী মশাই দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'এই বই বহুপূর্বে আমার কলম থেকে বের হবার কথা ছিল। কেননা সরকার আমাকেই এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন প্রমথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি এসে বাগড়া দিলেন যে, আমাদের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ্য আচারের প্রতিনিধি হয়ে আপনি যদি সমুদ্র যাত্রা করেন তবে বিরোধীদের কাছে আমাদের আর মুখ থাকে কই। ওদের সনির্বন্ধ অনুরোধেই আমি শেষপর্যন্ত সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বেণের মেয়ে গল্পে আমি যে সমুদ্র যাত্রার কথা বলেছি তা মনসামঙ্গল ইত্যাদি পড়ে। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যে সেকালে নাবিকেরা সমুদ্রের উপর গর্জন তেলের পিপে খুলে তেল ঢেলে দিত এবং তাতে অন্তত সেই জায়গাটা নিস্তরঙ্গ হয়ে যেত এও আমার পঠিত বিদ্যা থেকে আহৃত। আমি যদি সে সময়ে কম্বোজ যেতে পারতাম তবে সমুদ্র যাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার হতে পারত। প্রাচীন ভারতে সমুদ্র যাত্রা কখনো নিষিদ্ধ ছিল না। এ নিষেধ পরবর্তী পণ্ডিতদের মনগড়া ব্যাপার।'

শাস্ত্রী মশাই-এর সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছিল। একবার গরমের ছুটিতে আমার কাকার ৮০০ টাকার একটা ঋণ শোধ করার জন্য আমি তাঁর কাছে শ' ছয়েক টাকা ধার চেয়ে চিঠি দিলাম। ঐ ঋণ সময়মতো শোধ না করলে কট-কবলায় আবদ্ধ আমাদের একখানি দামী ধানের জমি হাত ছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। শাস্ত্রী মশাই কোনো টাকাও পাঠালেন না, চিঠিও দিলেন না। এতে

স্বভাবতই আমার মনে খুব দুঃখ হয়েছিল এবং আমি তাঁর কাছে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিলাম। তিনি মারা গেলে নৈহাটির বাড়িতে শ্রাদ্ধবাসরে অবশ্য আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। সেখানে সন্তোষদা থেকে কালীতোষ পর্যন্ত পাঁচ ভাই আমাকে অত্যন্ত সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং শাস্ত্রী মশাই-এর পুত্রবৎ প্রিয় ছাত্র বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েকমাস বাদে আশুতোষ দাদা আমাকে একখানি চিঠি লিখে জানান, আমি শাস্ত্রী মশাইকে যে চিঠি দিয়েছিলাম সেখানি আদৌ তাঁর হাতে পৌঁছয় নি। তাঁদের একতলার বৈঠকখানা ঘরে খান দুই পায়াহীন তক্তপোষের উপর ফরাস বিছিয়ে রাখা হ'ত। অসতর্ক মুহূর্তে চিঠিখানা দেওয়ালের পাশ দিয়ে কেমন করে তক্তপোষের মধ্যে ঢুকে যায়। ঐ ঘর পরিষ্কার করার সময় খাম না খোলা ঐ চিঠি আশুদার হাতে পড়ে। চিঠিখানা পড়ে আশুদা আমার হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণটা বুঝতে পারেন। আমাকে লেখেন,—'ভাই তুমি বাবার উপর কোনো অভিমান রেখো না। আমারই দোষে তোমার চিঠি বাবার হস্তগত হয় নি। তিনি হঠাৎ তোমার আসা যাওয়া বন্ধ হওয়ার জন্য অনেকদিন দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এদিকে তুমিও টাকা কিংবা চিঠির উত্তর না পেয়ে বাবার উপর অভিমান করে বসেছিলে। এর সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি সময় মত তোমার চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছে দিলে এটা ঘটত না। তুমি পত্রপাঠ আমার সঙ্গে দেখা করো।' আমি গেলে তিনি আমাকে পরিতোষ করে খাওয়ালেন এবং চিঠিখানি আমার হাতে দিলেন। আমার দুই চক্ষু তখন উদ্গত অশ্রুতে পূর্ণ। আমাদের শাস্ত্রমতে আত্মা অবিনাশী। মৃত্যুর পরে শাস্ত্রী মশাই নিশ্চয়ই আমার অভিমানের কারণ জেনেছেন। সেই অমরলোক থেকে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষমা এবং আশীর্বাদ আমার মস্তকে বর্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিপুস্তকের জন্য

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে এই রচনার পাণ্ডুলিপি আছে। রুলটানা প্যাডের কাগজে আড়াই পৃষ্ঠা জুড়ে কালীতে লেখা। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হল। 'হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা' দ্বিতীয়ভাগে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' নামক রচনা এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'নানাকথা' অংশে 'পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' শিরোনামে প্রকাশিত, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভার জন্যে প্রেরিত পত্রটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় পাণ্ডুলিপিটি ঐ দুটি রচনার খসড়া-রূপ। 'হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা' এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদুটিতে পাণ্ডুলিপির অতিরিক্ত যে অংশ আছে তা সংকলন করে দেওয়া হল। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এক.

বালককালে আমার সাহস যে কত ছিল তার দুটি দৃষ্টান্ত মনে পড়চে। মাণিকতলায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘরে আমার যাওয়া আসা ছিল, আর তার চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ করেচি পটলডাঙায় বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে যখন তখন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে।

একটা কথা মনে রাখা চাই তখন যাঁরা নামজাদা লোক ছিলেন তাঁদের কাজের জায়গা বা আরামের ঘর এখনকার মতো সকলের পক্ষেই এত সুগম ছিল না। তখন সাহিত্যে যাঁদের প্রভাব ছিল বেশি তাঁদের সংখ্যা ছিল কম, তাঁদের আমরা সমীহ করে চলতুম। তখনকার গণ্য লোকেরা সকলেই রাশ-

ভারি ছিলেন বলে আমার মনে পড়ে। সেকালে সমাজে একটা ব্যবহারবিধি ছিল, তাই পরস্পরের মর্যাদা লঙ্ঘন সহজ ছিল না।

রাজেন্দ্রলালের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, গাম্ভীর্য ও বিনয়ে মিশ্রিত তাঁর সহজ আভিজাত্যে আমি মুগ্ধ ছিলুম। তাঁর কাছে নিজের জোরে আমি প্রশ্রয় দাবি করিনি তিনি স্নেহ করে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের কথা সব প্রথমে আমি তাঁরই কাছে শুনেছিলেম। অনুভব করেছিলেম শাস্ত্রী মশায়ের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সে সময়ে এসিয়াটিক সোসাইটির কাজে তাঁর সঙ্গে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি যে বিশেষ ভাবে আদর করেছিলেন পরেও তার প্রমাণ দেখেছি। নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেচেন, 'I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my full satisfaction.'

এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলালের কথা আমাকে বলতে হোলো তার কারণ এই যে শাস্ত্রী মশায় দীর্ঘকাল যে রাস্তা ধরে কাজ করেছেন সে রাস্তা আমার পক্ষে দুর্গম। সেইজন্যে তাঁকে প্রথম চিনেছি রাজেন্দ্রলালের প্রশংসা বাক্য থেকে। আমার পক্ষে সেই যথেষ্ট।

তারপরে তাঁর সঙ্গে আমার যে পরিচয় সে বাংলা ভাষার আসরে। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাক তবু বাংলার স্বাতন্ত্র্য যে সংস্কৃত ব্যাকরণের তলায় চাপা পড়বার নয়, আমি জানি এ মতটি শাস্ত্রী মহাশয়ের। একথা শুনতে যত সহজ আসলে তা নয়। ভাষায় বাইরের দিক থেকে চোখে পড়ে শব্দের উপাদান। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষার বেশির ভাগ শব্দই সংস্কৃত থেকে পাওয়া। এই শব্দের কোনোটাকে বলি তৎসম, কোনোটাকে তদ্ভব।

ছাঁপার অক্ষরে বাংলা পড়ে পড়ে একটা কথা ভুলেচি যে, সংস্কৃতের তৎসম শব্দ বাংলায় প্রায় নেই বললেই হয়। 'অক্ষর' শব্দটাকে তৎসম বলে গণ্য করি ছাপার বইয়ে; অন্য ব্যবহারে নয়। রোমান অক্ষরে 'অক্ষর' শব্দের সংস্কৃত চেহারা *akshara* বাংলায় *okkhar*। মারাঠী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ

প্রায় সংস্কৃতেরই মতো, বাংলায় তা নয়। বাংলার নিজের উচ্চারণের ছাঁদ আছে, তার সমস্ত আমদানি শব্দ সেই ছাঁদে সে আপন করে নিয়েচে।

তেমনি তার কাঠামোটাও তার নিজের। এই কাঠামোতেই ভাষার জাত চেনা যায়। এমন উর্দু আছে যার মুখোষটা পারসিক কিন্তু ওর কাঠামোটা বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় উর্দু ভারতীয় ভাষা। তেমনি বাংলার স্বকীয় কাঠামোটাকে কি বলব? তাকে গৌড়ীয় বলা যাক।

কিন্তু ভাষার বিচারের মধ্যে এসে পড়ে আভিজাত্যের অভিমান, সেটা স্বাজাত্যের দরদকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। অব্রাহ্মণ যদি পৈতে নেবার দিকে অত্যন্ত জেদ করতে থাকে তবে বোঝা যায় যে, নিজের জাতের পরে তার নিজের মনেই সম্মানের অভাব আছে। বাংলা ভাষাকে প্রায় সংস্কৃত বলে চালালে তার গলায় পৈতে চড়ানো হয়। দেশজ বলে কারো কারো মনে বাংলার পরে যে অবমাননা আছে সেটাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নামাবলী দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা অনেক দিন আমাদের মনে আছে। বালক বয়সে যে ব্যাকরণ পড়েছিলুম তাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা দিয়ে বাংলা ভাষাকে শোধন করবার প্রবল ইচ্ছে দেখা গেছে; অর্থাৎ এই কথা রটিয়ে দেবার চেষ্টা, যে, ভাষাটা পতিত যদিবা হয় তবু পতিত ব্রাহ্মণ। অতএব পতিতের লক্ষণগুলো যতটা পারা যায় চোখের আড়ালে রাখা কর্ত্তব্য। অন্তত পুঁথিপত্রের চালচলনে বাংলা দেশে 'মস্ত ভিড়'কে-কোথাও যেন কবুল করা না হয় স্বাগত বলে যেন এগিয়ে নিয়ে আসা হয় 'মহতী জনতা'কে।

এমনি করে সংস্কৃত ভাষা অনেক কাল ধরে অপ্রতিহত প্রভাবে বাংলা ভাষাকে অপত্য নির্বিশেষে শাসন করবার কাজে লেগেছিলেন। সেই যুগে নর্ম্মাল স্কুলে কোনোমতে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্যন্ত আমার উন্নতি হয়েছিল। বংশে ধনমর্যাদা না থাকলে তাও বোধ হয় ঘটত না। তখন যে ভাষাকে সাধুভাষা বলা হোত অর্থাৎ যে ভাষা ভুল করে আমাদের মাতৃভাষার পাড়ায় পা দিলে গঙ্গাস্নান না করে ঘরে ঢুকতেন না তাঁর সাধনার জন্যে লোহারাম শিরোরত্নের ব্যাকরণ এবং আদ্যানাথ পণ্ডিতমশায়ের সমাসদর্পণ আমাদের অবলম্বন ছিল। আজকের দিনে শুনে সকলের আশ্চর্য লাগবে যে, দ্বিগু সমাস কাকে বলে সুকুমার মতি বালকের তাও জানা ছিল। তখনকার কালের পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা দেখলেই জানা যাবে সেকালে বালকমাত্রই সুকুমার মতি ছিল।

ভাষা সম্বন্ধে আর্য্যপদবীর প্রতি লুব্ধ মানুষ আজও অনেকে আছেন, শুদ্ধির দিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি—তাই কান সোনা পান চুনের উপরে তাঁরা

বহুযত্নে মূর্ধন্য ণয়ের ছিটে দিচ্ছেন তার অপভ্রংশতার পাপ যথাসাধ্য ক্ষালন করবার জন্যে। এমন কি ফার্সি 'দরুন' শব্দের প্রতিও পতিতপাবনের করুণা দেখি। 'গবর্নমেন্টে'র উপর নত্ববিধানের জোরে তাঁরা ভগবান পাণিনির আশীর্বাদ টেনে এনেচেন। এঁদের 'পরণে' 'নরুণ-পেড়ে' ধুতি। ভাইপো 'হরেনের' নামটাকে কোন ন-এর উপর শূলে চড়াবেন তা নিয়ে দো-মনা আছেন। কানে কুণ্ডলের সোনার বেলায় তাঁরা আর্য্য কিন্তু কানে মন্ত্র শোনার সময় তাঁরা অন্যমনস্ক। কানপুরে মূর্ধন্য ণ চড়েচে তাও চোখে পড়ল,—অথচ কানাই পাহারা এড়িয়ে গেছে। মহামারী যেমন অনেকগুলোকে মারে অথচ তারি মধ্যে দুটো একটা রক্ষা পায়, তেমনি হঠাৎ অল্প দিনের মধ্যে বাংলায় মূর্ধন্য ণ অনেকখানি সংক্রামক হয়ে উঠেচে। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় নতুন গ্র্যাজুয়েট এটার উদ্ভব তাঁদেরই থেকে, কিন্তু এর ছোঁয়াচ লাগল ছাপাখানার কম্পোজিটরকেও। দেশে শিশুদের পরে দয়া নেই তাই বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে চলেছে অথচ তাতে সংস্কৃত ভাষার নিয়মও পীড়িত বাংলার তো কথাই নেই।

প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা আমাদের চেয়ে সংস্কৃত ভাষা কম জানতেন না। তবু তাঁরা প্রাকৃতকে নিঃসংকোচে প্রাকৃত বলেই মেনে নিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে থেকে থেকে তার উপরে সংস্কৃত ভাষার পলস্তারা লাগান নি। যে দেশ পাণিনির সেই দেশেই তাঁদের জন্ম, ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের মোহমুক্ত স্পষ্টদৃষ্টি ছিল। তাঁরা প্রমাণ করতে চাননি যে ইরাবতী চন্দ্রাভাগা শতদ্রু গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সমস্তই হিমালয়ের মাথার উপরে জমাট করা বিশুদ্ধ বরফেরই পিন্ড। যাঁরা যথার্থ পন্ডিত তাঁরা অনেক সংবাদ রাখেন বলেই যে মান পাবার যোগ্য তা নয় তাঁদের স্পষ্ট দৃষ্টি।

যে কোনো বিষয় শাস্ত্রী মশায় হাতে নিয়েচেন তাকে সুস্পষ্ট করে দেখেচেন ও সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয় কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ করে তোলা ধী শক্তির কাজ। এই জিনিষটি অত্যন্ত বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পান্ডিত্য তার জন্যেও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন ; আমাদের আধুনিক শিক্ষা বিধির গুণে তার চর্চাও প্রায় দেখিনে। ধ্বনি প্রবল করবার এক রকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েচে তাতে স্বাভাবিক গলার জোর না থাকলেও আওয়াজে সভা ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই রকম উপায়েই অল্প জানাকে তুমুল করে ঘোষণা করা এখন সহজ হয়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্কা হয়ে উঠল বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল সেইটের অভাব ঘটেচে।

তাই আজ এই দৈন্যের দিনে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মশায় যে সঙ্গীবিরল সার্থকতার শিখরে আজও বিরাজ করছেন তারই অভিমুখে সসম্মানে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

দুই.

হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, দ্বিতীয় ভাগ:

এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে-কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না, তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেন নি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারি করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার-মুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,— অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশি মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

...তার রচনায় খাঁটি বাঙলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।....

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ অনেক দিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্র-লালের সহযোগিতায় এসিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য-পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি, কোনো মতে মনে করতে

পারি নে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেইজন্যে যে বয়সেই ত াঁদের মৃত্যু হোক, দেশ অকালমৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্বাণের মুহূর্তে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীতকালকে যিনি ধন্য করেছেন ভাবী কালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন।

তিন.

বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮ :

আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল। তারপরে তার পরিণতি দেখেছি রাজেন্দ্রলাল মিত্রে। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির প্রযত্নে প্রাচীন কাল থেকে আহরিত সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের উপকরণ অনেক জমে উঠেছিল। সেই-সকল অসংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সত্যকে উদ্ধার করবার কাজে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রধানত ইংরেজি ভাষায় ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাঁর মন মানুষ হয়েছিল ; পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর রচনা ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশ হত। কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্যাধারার জন্যে বাংলা ভাষার মধ্যে খাত খনন করার কাজে তিনি প্রধান অগ্রণী ছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত বিবিধার্থসংগ্রহ তার প্রমাণ। তাঁর লিখিত বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল নিরলংকার।

সে অনেকদিনের কথা—সেদিন একদা পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মাণিকতলায় বাড়িতে কী উপলক্ষে গিয়েছিলুম সেটা উল্লেখযোগ্য। বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বেঁধে দেবার উদ্দেশে তখনকার দিনের প্রধান লেখকদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপনের সংকল্প মনে ছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকেও টেনেছিলুম। বিদ্যাসাগরের কাছেও সাহস করে যাওয়া গেল। তিনি বললেন, তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি সাধন করতে চাও, তাহলে আমাদের মতো হোমরা চোমরাদের কখনোই নিয়ো না, আমরা কিছুতেই মিলতে পারি নে। তাঁর কথা কতক অংশে খাটল, হোমরা চোমরার দল কেউ কিছু করেন নি। যত্নের সঙ্গে

কাজ আরম্ভ করেছিলেন একমাত্র রাজেন্দ্রলাল। সমিতির প্রত্যেকের কাছে ফেরি করিয়ে নেবার জন্য তিনি ভৌগোলিক পরিভাষার একটি খসড়া লিখে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলুম সকলকে জোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে, তখনকার দিনের লেখকদের নিয়ে সাহিত্য-পরিষদ খাড়া করে তুলতে—পারি নি, হয়তো নিজেরই অক্ষমতাবশত। তখন বয়স এত অল্প ছিল যে, অনেক চেষ্টায় যাঁদের টেনেওছিলুম তাঁদের কাজে লাগাতে পারলুম না।

আজ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষে শোক-সভায় রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুজনের চরিতচিত্র মিলিত হয়ে আছে। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সংগে একত্রে কাজ করেছিলেন। …ভূয়োদর্শনের সংগে সংগে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সেই সংগে স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশের শক্তি আজ আমাদের দেশে বিরল। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

গোপীনাথ কবিরাজ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৩২৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'উত্তরা' পত্রিকায় 'মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' নামে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ (১৮৮৭ ১৯৭৬) এর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মাঘ সংখ্যা উত্তরায় 'ক্রমশ' নির্দেশ থেকে বোঝা যায় প্রবন্ধটি শেষ হয়নি। অনুসন্ধান করে এর পাণ্ডুলিপি আমরা পাইনি। শ্রীযুক্ত শশীশেখর কবিরাজ-এর অনুমতিক্রমে উত্তরা পত্রিকা থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হল। গোপীনাথ অকৈশোর হরপ্রসাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত ছিলেন। ভগবতীপ্রসাদ সিংহ রচিত গোপীনাথ-এর জীবনী 'মনীষী কী লোকযাত্রা' (বারাণসী ১৯৬৮) গ্রন্থে উদ্ধৃত গোপীনাথের উক্তি, 'ইন্‌কে (হরপ্রসাদের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রোফেসর মেঘনাথ ভট্টাচার্য্যহি মেরে জয়পুর জীবনকে প্রথম সময়কে আশ্রয়দাতা থে। ইসি মাধ্যমসে শাস্ত্রীজীকে প্রগাঢ় সম্পর্কমে আগয়াথা। মে কঈবার ইন্‌কে নঈহাটী তথা কলকাত্তাস্থিত আবাস স্থানপর গয়াথা। শাস্ত্রীজী জব কাশী জাতে তো মুঝসে সরস্বতী ভবনমে আকর মিলা করতেথে।' (পৃ. ১৮৫)—হরপ্রসাদের সঙ্গে এবং তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে গোপীনাথের প্রগাঢ় সম্পর্ক চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটি প্রতিভাশালী তরুণ লেখককে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এক সময়ে প্রবীন সাহিত্যিকের পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন ও সে পদগৌরব শেষপর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শাস্ত্রিমহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি বঙ্কিমপরিষদের অন্যান্য লেখকবর্গের মধ্যে বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন হইলেও

গুণগরিমায় কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রশেখর, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র—সকলেই বহুদিন হইল ক্রমে ক্রমে চলিয়া গিয়াছেন। উৎসবান্তে শতদীপোজ্জ্বল সুরম্য নাট্যশালা নির্ব্বাণ-প্রদীপ অন্ধকার কারাগৃহের ন্যায় পূর্ব্ব-স্মৃতির বিষাদময় নিদর্শন স্বরূপ পড়িয়াছিল—তাহাতে একটি মাত্র ক্ষীণ প্রদীপ প্রতিকূল বায়ুর তাড়না সহ্য করিয়াও পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষীরূপে এতদিন কোনো মতে আত্মরক্ষা করিয়া বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রিমহাশয়ের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমীয় যুগের সেই শেষ চিহ্নটুকুও লুপ্ত হইয়া গেল।

শাস্ত্রিমহাশয় প্রথমতঃ বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপেই জগতের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। 'ভারত মহিলা' নামে একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ তিনি প্রথম বয়সে রচনা করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে রচিত হইলেও এই গ্রন্থের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিতভাবে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁহাকে তখনকার প্রত্যেক সাহিত্যিকই বিশেষভাবে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার তীব্র সমালোচনার কশাঘাতে অনেক আত্মম্ভরী অযোগ্য লেখক সাহিত্য-চর্চা হইতে চিরদিনের জন্য বিরত হইয়া পড়িত। অপরপক্ষে, প্রতিভাশালী যথার্থ সুলেখক তাঁহার নিকটে কখনোই যথোচিত সম্মান ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইতেন না। তিনি গুণের আদর জানিতেন ও করিতেন—প্রকৃত গুণীকে কদাপি তিনি উপেক্ষা করিতেন না। সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময়ে যেমন তিনি কাহাকেও নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, তেমনি কাহাকেও সৎকার সহকারে আলিঙ্গন করিতেও সংকোচবোধ করিতেন না। বস্তুতই তিনি এক হস্তে পুষ্পাঞ্জলি ও অপর হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সাহিত্য কুঞ্জের দ্বারদেশে সতর্ক ও সাবধান দৃষ্টি লইয়া উপস্থিত থাকিতেন।

যখন 'ভারত মহিলা' প্রকাশিত হয় তখন শাস্ত্রিমহাশয় বয়সে নবীন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় কঠোর ও প্রবীন সমালোচকের নিকট হইতে প্রশংসাসূচক ও উৎসাহ বর্দ্ধক বাক্য শ্রবণ করিয়া একজন নবীন লেখক কি প্রকার উদ্যমশীল হইতে পারেন তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। যদিও নৈহাটীতে শাস্ত্রিমহাশয়ের পৈতৃক গৃহ হইতে কাঁঠালপাড়াস্থিত বঙ্কিমভবন অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না এবং যদিও উভয় পরিবার বহুদিন যাবৎ পরস্পর সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ

ছিল, তথাপি শাস্ত্রিমহাশয়ের ন্যায় একজন নব যুবকের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় রাশভারি সাহিত্যিকের সমক্ষে সাহিত্য প্রসঙ্গ করা অসমসাহসের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শাস্ত্রিমহাশয় বঙ্কিমের নিকটে স্বভাবতই একটু সঙ্কোচ করিয়া চলিতেন। সুতরাং বঙ্কিমের উৎসাহবাক্যে তিনি যে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের দিকে ক্রমশঃ অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য।

তখন 'বাল্মীকির জয়' নাম দিয়া তিনি একখানা গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে কিছু কিছু করিয়া এই গ্রন্থ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার পাঠক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িবার জন্য যেমন উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, এই নব প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্যও তেমনই আন্তরিকভাবে ব্যগ্র থাকিতেন। 'বাল্মীকির জয়' ঠিক উপন্যাস নহে, ধর্ম্মকথা নহে, তত্ত্বোপদেশ নহে, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আলোচনা নহে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানও নহে—ইহা যে কোন্ শ্রেণীর রচনা তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বঙ্গদর্শনে ইহার সমালোচনা করিয়াছিলেন।[১] বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা বঙ্গদর্শন সম্পাদকের পক্ষ হইতে করা ও বঙ্গদর্শনেই উহা প্রকাশিত করা সাহিত্যিক নীতি বিরুদ্ধ জানিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র শুধু গ্রন্থের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বশতঃই উহা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃই 'বাল্মীকির জয়' বঙ্গসাহিত্যের বহুমূল্য রত্নস্বরূপ। এখন ইংরাজী ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার ফলে উহা বিদেশে বহু রসজ্ঞ সাহিত্যিকের দৃষ্টি ও প্রশংসা আকৃষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর ডাউডেন, সিলভ্যাঁ লেভী[২] প্রভৃতি বহু সুধী সমালোচক এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ১৮৯০-৯১ সালের 'কলিকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকাতে 'Neoromantic Movement in Bengali Literaturc'[৩] নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ বাল্মীকির জয়ের সমালোচনা করিয়া পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।···

'বাল্মীকির জয়' প্রকাশিত হইবার পরেই শাস্ত্রিমহাশয়ের সাহিত্যিক

১. [বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।]

২. [এই গ্রন্থের ৬ ও ৯ পৃষ্ঠায় লেভীর চিঠি-দ্র.]

৩. এই প্রবন্ধ ১৯০৩ সালে প্রকাশিত শীল মহাশয়ের *New Essays in Criticism* নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে পৃ. ৫০-১০৫

যশঃপ্রভা বঙ্গদেশের চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন, তিনি বৌদ্ধযুগের একটি প্রাচীন চিত্র অবলম্বন করিয়া 'কাঞ্চনমালা' নামে একখানা অভিনব উপন্যাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই গ্রন্থও পূর্ব্ববৎ বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি আদরের সঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের পুত্র কুণাল ও পুত্রবধূ কাঞ্চনমালার ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের কল্পনারঞ্জিত প্রতিবিম্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, অবদানশতক প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রকাশিত অপ্রকাশিত বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তখন শাস্ত্রিমহাশয়ের হৃদয়ে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সুদূর অতীত যুগের একটি স্বপ্নমধুর চিত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই চিত্রকে কল্পনায় মন্ডিত করিয়া দেশ ও কালের উপযোগিভাবে ভাষার তুলিকায় অঙ্কিত করিতে তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন, সুতরাং 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনা প্রণালী এবং ভাবমাধুর্য্যে এমন একটি বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় যাহা ঐ যুগে সম্পূর্ণরূপে অভূতপূর্ব্ব বলিয়া বিবেচিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইহার গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণবশতঃ অগ্রজ সঞ্জীববাবুর দ্বারা তিনি শাস্ত্রিমহাশয়কে এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। এই কারণ কি তাহা জানি না—তবে ইহার কিছু কিছু বিবরণ তাঁহার নিজের মুখে এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর পূজ্যপাদ ৺মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে তাহা আলোচ্য নহে। শাস্ত্রিমহাশয় বঙ্কিমবাবুর মনোগত ভাব অবগত হইয়া যারপরনাই নিরুৎসাহ হইলেন এবং ভগ্নহৃদয়ে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। যাঁহার উৎসাহবাণী একদিন তাঁহার তরুণ অন্তঃকরণে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, যাঁহার শতমুখী প্রশংসা একদিন তিনি অযাচিতভাবে প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আজ তিনি স্বয়ংই যখন উৎসাহভঞ্জন করিতে অগ্রসর হইলেন তখন আর তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইল না।

শাস্ত্রিমহাশয় সাহিত্যমঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু এক হিসাবে তিনি ভালই করিলেন। কারণ যে ক্ষেত্রে তিনি নূতন কর্ম্মিরূপে প্রবেশ করিলেন সেখানে বহু কর্ত্তব্যকর্ম্ম অধ্যবসায় ও প্রতিভাশালী লোকের অভাবে অপূর্ণ পড়িয়া ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস, বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাস —সবই তখন একপ্রকার পতিতভূমির ন্যায় অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ আলোচকের

দৃষ্টির অগোচরে উপেক্ষিতভাবে পড়িয়া ছিল। তাঁহার বিদ্যা ও ধীশক্তি এই অভিনব রাজ্যেও কি প্রকার অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই।

বঙ্গদর্শনে শাস্ত্রিমহাশয় সমালোচনাত্মক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধও লিখিতেন। 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধ তাঁহারই রচিত। এই প্রবন্ধ তখনকার চিন্তাশীল পাঠকের কি প্রকার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাহা একবার পাঠ করিলেই অনুমান করিতে পারা যায়। ইহাতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, তুলনামূলক আলোচনার ক্ষমতা, রচনালালিত্য—সবই পরিদৃষ্ট হইবে, এই জাতীয় তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাঝে মাঝে বঙ্গদর্শনের কলেবরের শোভা বৃদ্ধি করিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনুকরণেও তিনি দুই একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস এখন অনেকেই আলোচনা করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথমবার প্রকাশিত হইবার পরে বহু লেখকই এই বিষয়ের আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু যখন শাস্ত্রি-মহাশয় ১৮৯১ সালে এই বিষয়ে বঙ্গীয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তখন খুব অল্প সংখ্যক সাহিত্যিকই ইহার বিবরণ অবগত ছিলেন। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে নানাস্থানে ইহার সুখ্যাতি হইয়াছিল। বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক সাহিত্যালোচনার এই ক্ষেত্রেও তিনিই একপ্রকার পথপ্রদর্শক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আবির্ভাব ও কার্য্যাবলীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ও প্রকাশন বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি প্রকার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য কীর্ত্তির মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবা ও সাধনা একটি মুখ্য কীর্ত্তি।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ শাস্ত্রিমহাশয়ের পাঠজীবন হইতেই পরিলক্ষিত হইত। তিনি অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র পত্রিকার তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী, জেনারেল কানিংহামের আর্কিওলজিক্যাল সারভে রিপোর্ট ও অন্যান্য গ্রন্থ, ফার্গুসনের ভারতীয় বাস্তু ও স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে গ্রন্থ—সবই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ তখন প্রচুর পরিমাণে পাইবার উপায় ছিল না। তবে যাহা তিনি পাইতেন তাহা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। ললিতবিস্তর, প্রজ্ঞাপারমিতার কিয়দংশ এবং এই জাতীয় আরও

কিছু গ্রন্থ তিনি নিপুণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বেই বার্নুফের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানা ফরাসী ভাষায় লিখিত হইলেও শাস্ত্রিমহাশয় পরিশ্রম করিয়া ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে ও হজসনের প্রবন্ধাবলী হইতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল। ফলে এই জ্ঞান পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ অবসর ঘটিয়াছিল। হজসন সাহেব বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। তিনি নেপাল হইতে সংগৃহীত ৮৬ বেষ্টন নেওয়ারী বা প্রাচীন নেপালী লিপিতে হস্তলিখিত বৌদ্ধ পুস্তক সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থালয়ে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট গ্রোট সাহেব এই গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া গ্রন্থসূচীসহ ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিবার ভার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের উপর অর্পণ করেন। পণ্ডিত হরিনাথ বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় এই কার্য্যে যথোচিত সহায়তার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ সংস্কৃতে নিবন্ধ করিতেন। মিত্রমহাশয় এইগুলি মূলের সহিত মিলাইয়া ও প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন ও সংযোজন করিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেন। তখন মিত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল—তিনি অনেক সময়ই রোগে কাতর হইয়া শয্যাশায়ী থাকিতেন। একজন সুযোগ্য পণ্ডিতের সহায়তা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে এই কঠিন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তখন শাস্ত্রিমহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার আনুকূল্য সম্পাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মিত্রমহাশয়ও তাঁহার সাহায্য আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুবাদগুলি 'H. P. S.' এই চিহ্ন দ্বারা সূচীপত্রে পৃথকভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। *'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal'* নামে মিত্রমহাশয়ের এই পুস্তকখানা ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ৮৫ খানা বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের বিবরণাত্মক সারসংক্ষেপ ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে পনেরোখানা বৃহৎ গ্রন্থের বর্ণনা শাস্ত্রিমহাশয়ের লেখনী প্রসূত। ইহাদের নাম—১. অবদানশতক, ২. ভদ্রকল্প অবদান, ৩. বোধিসত্ত্ব অবদান, ৪. দশভূমীশ্বর, ৫. দ্বাবিংশ অবদান, ৬. গণ্ডব্যূহ, ৭. গুণ কারণ্ডব্যূহ, ৮. কপিশ অবদান, ৯. কবিকুমার কথা, ১০. ক্রিয়াসংগ্রহ পঞ্জিকা, ১১. মহাবস্তু অবদান, ১২. রত্নমালা অবদান, ১৩. সমাধি-রাজ,

১৪. সুবর্ণ প্রভাস, ১৫. স্বয়ম্ভূপুরাণ। শাস্ত্রিমহাশয়ের কার্য্য সম্বন্ধে মিত্রমহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।...

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানা গ্রন্থ ইউরোপে ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।[৪] 'স্বয়ম্ভূপুরাণ'খানা শাস্ত্রিমহাশয় স্বয়ং বঙ্গীয় এসিয়াটিক সমিতির গ্রন্থমালায় সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়াছেন। 'পুরাণ' নামে অভিহিত হইলেও এই গ্রন্থখানা বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রের মাহাত্ম্যখ্যাপক। স্বয়ম্ভূ আদিবুদ্ধের নামান্তর। প্রসিদ্ধি আছে যে চীনদেশে পঞ্চশীর্ষ পর্ব্বতে[৫] বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তিনি একদিন দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন যে আদিবুদ্ধ জগৎগুরু স্বয়ম্ভূদেব নেপালরাজ্যে কালীহ্রদ মধ্যে[৬] পঞ্চরত্নময় কমলের কর্ণিকাতে কোটিসূর্য্য সমুজ্জ্বল ও কোটিচন্দ্র শীতল একহস্ত-পরিমিত চৈত্যরূপী দিব্যজ্যোতিঃ শিখারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। জানিবামাত্রই তিনি শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া নেপালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে আবির্ভাবস্থানটি অতি দুর্গম, সাধারণের পক্ষে সেখানে যাইয়া অর্চ্চনা করা অসম্ভব। তিনি হ্রদটি প্রদক্ষিণ করিলেন ও দক্ষিণদিকের পর্ব্বতপ্রাকার অসি দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াদিলেন। সেইপথে জল নির্গত হইতে লাগিল ও পশ্চাতে সমগ্র দেশ শুষ্ক হইয়া লোকের সঞ্চার ও নিবাসের উপযোগী হইয়া উঠিল। এই জলধারাই বাঙ্মতী নদীর প্রবাহ; যাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই শুষ্কভূমিই অধুনা প্রসিদ্ধ নেপালরাজ্য। মঞ্জুশ্রী পীঠস্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন ও নিকটেই একটি পর্বত-শিখরে নিজের আবাসস্থান রচনা করিলেন। শিষ্যগণের অবস্থানোপযোগী একটি বিহারও নির্ম্মিত হইয়াছিল যাহা মঞ্জুশ্রী-

৪. অবদান শতক প্রকাশিত হইয়াছে—ইহার সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর স্পায়ার। ফীয়ার সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা অতি প্রাচীন ও সম্ভবতঃ হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। নেপালে যে "নবধর্ম্ম" বলিয়া নয় খানা গ্রন্থের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় তন্মধ্যে দশভূমীশ্বর, গণ্ডব্যূহ ও সমাধিরাজ অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। মহাবস্তুও বাহির হইয়াছে।

৫. পঞ্চশীর্ষ পর্বত সম্বন্ধে লিখিত আছে—"মহাচীনস্ত বিষয়ে মঞ্জুশ্রী নাম পর্ব্বতনাম্না পুরা পঞ্চশীর্ষঃ সর্বলোকে প্রকীর্ত্তিতা।" (স্বয়ম্ভূপুরাণ পৃ. ১৪৭)। এই পর্ব্বতের বজ্র, ইন্দ্রনীল, মাণিক্য, মার্জ্জলমণি ও বৈদুর্য্যময় পঞ্চশৃঙ্গ ছিল। তাই ইহার নাম 'পঞ্চশীর্ষ'।

৬. কালীহ্রদের দৈর্ঘ্য সাত ক্রোশ ও প্রস্থও সাত ক্রোশ ছিল, এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা চারি দিকে পর্ব্বতাবলী দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

পত্তন নামে এখনও প্রসিদ্ধ। স্বয়ম্ভূপুরাণে এইরূপ বহু প্রাচীন কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত করিয়া শাস্ত্রিমহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের ও ইতিহাসের একাংশের আলোচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের দেহান্তে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের হস্তলিখিত পুস্তক অন্বেষণের ভার শাস্ত্রিমহাশয়ের উপরে অর্পিত হইয়াছিল। মিত্রমহাশয় ১৮৭০ হইতে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত ২১ বৎসরকাল স্বয়ং এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনজন পণ্ডিত, সহকারী কার্য্যকারকরূপে নিযুক্ত ছিল—তম্মধ্যে একজন দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিয়া হস্তলিখিত পুস্তকের সন্ধান নিত ও প্রত্যেকটি পুস্তকের আদি, অন্ত, পুষ্পিকা, আয়তন, লিপি, রচনাকাল, লিপিকাল, প্রাপ্তিস্থান, প্রতিপাদ্য বিষয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আবশ্যকীয় ও অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য লিখিয়া লইত। অপর দুইজন মিত্র-মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া ঐ সকল বিবরণ প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিত। ১৮৯১ সালের ২৬ শে জুলাই মিত্রমহাশয় পরলোকগমন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই এসিয়াটিক সমিতির কাউন্সিল এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের জন্য শাস্ত্রিমহাশয়কেই যোগ্যব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন ও তাঁহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিয়োজিত করেন। শাস্ত্রিমহাশয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে মিত্রমহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক বিবরণ তখনও কিছু অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। মিত্রমহাশয় *'Notices of Sankrit Manuscripts'* নাম দিয়া নয় খণ্ড বিবরণ পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিবরণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ভূমিকাতে বিস্তৃতরূপে তাঁহার পরিদৃষ্ট ও বিবৃত গ্রন্থমালার সমালোচনা-প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক ঐতিহাসিক আলোচনা করিবেন। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। শাস্ত্রিমহাশয় অভিনব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যকর্ত্তার অপ্রকাশিত বিবরণগুলি যথানিয়মে বিন্যস্ত করিয়া ১৮৯২ সালে 'Notices' এর দশম ভাগ বাহির করিলেন ও উল্লিখিত দশখণ্ড গ্রন্থের বৃহৎ সূচী নির্ম্মাণ করিয়া ১৮৯৫ সালে 'Notices'-এর একাদশ খণ্ড প্রকাশ করিলেন। এই একাদশ ভাগ গ্রন্থে রাজেন্দ্রলালের আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ হইল। তখন তিনি নিজের কার্য্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯০০ সালে তাঁহার আত্ম-লিখিত অভিনব বিবরণমালার (*Notices of Sanskrit Manuscripts' New series*) প্রথমভাগ, ১৯০৪ সালে দ্বিতীয়ভাগ, ১৯০৭ সালে তৃতীয়-ভাগ ও ১৯১১ সালে চতুর্থভাগ প্রকাশিত হয়। এই চারিভাগ বিবরণে

যথাক্রমে ৪২২, ২৬৬, ৩৬৬ ও ৩৫৯ খানা হস্তলিখিত পুস্তকের আলোচনা আছে। শাস্ত্রিমহাশয় প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থেই ভূমিকাতে[৭] ঐ খণ্ডে আলোচিত পুস্তকমালার একটি সংক্ষিপ্ত ও ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বিষয়ানুক্রমে নিবন্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক সমালোচকের পক্ষে অতীব মূল্যবান। ৺রামকৃষ্ণ গোলাপ ভাণ্ডারকরের হস্তলিখিত পুস্তকের রিপোর্টের বহুমূল্য ভূমিকার কথা অনেকেই অবগত আছেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের লিখিত ভূমিকা উহার প্রায় সমকক্ষ এবং কোন কোন বিষয়ে অধিক মৌলিক তথ্যপূর্ণ। এই পুস্তক অনুসন্ধান এবং আলোচনার ফলে বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের সকল অংশেই তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, কাব্যসাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম্ম—সকল বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ হইয়াছিল।

অধ্যাপক বেণ্ডাল ১৮৯৮-৯৯ সালে ইতিহাসের আলোচনা ও বৌদ্ধ গ্রন্থের অন্বেষণের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রিমহাশয়কে তাঁহার সংগে নেপাল যাইতে উৎসাহিত করেন। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার সংগে যাইতে সম্মত হন। বেণ্ডাল সাহেব বহুপূর্ব্বে ১৮৮৪ সালে একবার নেপাল গিয়াছিলেন ও দরবার লাইব্রেরী দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাববশতঃ সেবার ভাল করিয়া গ্রন্থাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই। তারপর শাস্ত্রিমহাশয়ও একবার গিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ১৮৯৭ সালের সোসাইটির পত্রিকায় (ভাগ ৩৬) প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ১৮৯৮-৯৯ সালের শীতকালে উভয়ে একযোগে যাত্রা করেন। বেণ্ডাল সাহেব আর্কিওলজী ও ইতিহাসের অংশ আলোচনা করিবেন এবং শাস্ত্রিমহাশয় সাহিত্যের গ্রন্থাদি অন্বেষণ করিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার পর্য্যটক পণ্ডিত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সহকারীরূপে সংগে নিয়াছিলেন। তখন শাস্ত্রিমহাশয়ের উপরেই সরকারী পুস্তক অন্বেষণের ভার ছিল। বলা-বাহুল্য নেপালযাত্রা সেই অন্বেষণ কার্য্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইল। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে তখন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র প্রাচীন পুস্তক সযত্নে রক্ষিত ছিল। ইহার মধ্যে অতি মূল্যবান বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক গ্রন্থও বহুসংখ্যক বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রিমহাশয় ১০১ বেষ্টনে বেষ্টিত ৪৪৮ খানা গ্রন্থের বিবরণ লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তালপত্রে লিখিত সকল পুস্তক ও কাগজে লিখিত অল্প সংখ্যক পুস্তকের বিবরণ অন্তর্গত ছিল। এই বিবরণ সম্বলিত সূচীগ্রন্থখানা তিনি '*A Catalogue of Palm-*

৭. ভূমিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৪০, ২২, ২৬ ও ৩৬

leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Darbar Library, Napal' নামে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত করেন। ইহা তাঁহার নেপালসূচীর প্রথমভাগ। অধ্যাপক বেণ্ডাল এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা (পৃ. ৩২) লিখিয়াছেন—তাহাতে নেপাল ও নেপাল রাজবংশের ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। এই সূচীগ্রন্থে বহু অপূর্ব্ব গ্রন্থের বর্ণনা আছে। শাস্ত্রিমহাশয়ের ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী স্বলিখিত ভূমিকা পাঠ করিলে নেপালের দরবার গ্রন্থালয়ের উৎকর্ষ ও ঐতিহাসিকমূল্য সাধারণ পাঠকবর্গও উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১৯০৭ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি পুনর্ব্বার নেপাল পরিদর্শন করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা গ্রহণ করেন। নেপাল দরবার একটি অভিনব পুস্তকসংগ্রহ কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে হয়ত অনেক অভূতপূর্ব্ব গ্রন্থ উপলব্ধ হইবে, এই আশায় শাস্ত্রিমহাশয় আবার নেপাল যাত্রা করেন। এবার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার পর্যটক পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও একজন ছাত্র।....

নেপাল দরবার কিছুদিন পূর্ব্বে যে পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ন্যায়বার্ত্তিকের একখানা পুস্তক ছিল। ইহা বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্‌নাগকৃত দার্শনিক গ্রন্থ মনে করিয়া শাস্ত্রিমহাশয় ইহার উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখিলেন, ইহা দিঙ্‌নাগের গ্রন্থ নহে, কিন্তু বাৎস্যায়ন-রচিত ন্যায়ভাষ্যের উপর উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের একাংশমাত্র। যাহা হউক এবারও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দরবার লাইব্রেরীর তালপত্রে লিখিত ও কাগজে লিখিত পুস্তকের বিবরণ সংকলন করেন। এই সংগ্রহে বৌদ্ধতন্ত্র-শাস্ত্রের গ্রন্থই বেশী ছিল—অধিকাংশই বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই বিবরণ সংগ্রহ তাঁহার দরবার লাইব্রেরীর গ্রন্থসূচীর (*A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Darbar Library, Nepal*) দ্বিতীয় ভাগরূপে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৭-৯৮ ও ১৯০৭ সালের নেপাল যাত্রায় এসিয়াটিক সোসাইটিতে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হয়। নেপাল হইতে তালপত্রের পুস্তক যাহাতে কোন উপায়ে বাহিরে না যায় সে জন্য নেপাল সরকার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। দরবার লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়ার পরেই এইরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। শাস্ত্রিমহাশয় সেইজন্য তালপত্রের পুস্তক ক্রয় করিবার সুবিধা পান নাই। তবে তিনি ভাল পুস্তক দেখিলেই

তাহা ব্যয় করিয়া নকল করাইয়া লইতেন। কাগজে লিখিত পুস্তক সম্ভবপর হইলে ক্রয়ও করিতেন। এই প্রকারে সোসাইটির গ্রন্থাগারে অনেক পুস্তক সংগৃহীত হয়। ১৯১৬ সালে তিনি সোসাইটির ১১৯ খানা বৌদ্ধগ্রন্থের বিবরণ সূচী প্রকাশিত করেন। ইহাতে এমন কোন কোন পুস্তকের বর্ণনা আছে যাহা চীন বা তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, অথবা হইলেও তাহার সংস্কৃত মূল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৯২২ সালে বৃদ্ধবয়সে শাস্ত্রিমহাশয় আরও একবার নেপাল যাত্রা করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষযাত্রা। এবার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য।····নেপালের ভিন্ন ভিন্ন বিহারে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্ত্তি সংরক্ষিত ছিল তিনি সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে আলোচনা করিবার জন্য তাহাদিগের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। তাঁহার 'বৌদ্ধমূর্ত্তি বিজ্ঞান'[৮] নামক গ্রন্থে এই সকল মূর্ত্তির যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

উদীচ্য বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে এখন চারিদিকেই আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার সূচনা এবং ঐতিহাসিক ক্রমবিস্তার বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রিমহাশয় একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহারথ ছিলেন। বহু মূল্যবান বৌদ্ধগ্রন্থ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, কিছু কিছু প্রকাশিতও করিয়াছেন। যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে পারেন নাই, তাহার সংখ্যাও কম নহে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল সাহিত্যে অনুশীলন করিয়া এবং নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার যোগ্য নিদর্শন তেমনভাবে রাখিয়া যাইবার সুযোগ পান নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহার সম্পাদিত 'Indian Historical Quarterly' নামক পত্রিকাতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, উভয় প্রবন্ধমালাই বিষয়ের বিপুলতা দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের বারিবিন্দুর ন্যায় তাঁহার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের খুব অল্প অংশই ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের '*Modern Buddhism*' নামক গ্রন্থের ভূমিকাতেও শাস্ত্রিমহাশয় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর্য্যদেবের 'চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ' ও 'চতুঃশতী', অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য, 'অন্তর্ব্যাপ্তি-প্রকরণ'

---

৮. [*The Indian Buddhist Iconography*, London, 1924]

প্রভৃতি ছয়খানা বৌদ্ধন্যায়গ্রন্থ, অদ্বয়বজ্রের সংগ্রহ পুস্তক ('কুদৃষ্টি নির্ঘাতন' প্রভৃতি ২১ খানা ক্ষুদ্র লেখের সংগ্রহাত্মক) এবং 'বৌদ্ধগান ও দোহা' ('চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়', সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ', কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণবে'র সংগ্রহস্বরূপ) নামক বিভিন্ন বৌদ্ধশাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রসংগেও প্রসক্তানুপ্রসক্তভাবে তিনি কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থের আবিষ্কার ও আলোচনা করিয়াছেন এবং উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত মত ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ নানা পত্রিকাতে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার মৌলিকত্ব ঐতিহাসিকগণ যথাসময়ে অবশ্যই নির্দ্ধারণ করিবেন। তবে ইহা নিশ্চিত যে উত্তর কালীন মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও তৎসম্বন্ধ মিশ্র তান্ত্রিকধর্ম্মের যে সকল উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্। প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাসবিষয়ে ক্রমশঃ যতই অনুসন্ধান হইতে থাকিবে ততই তাঁহার উপকরণের উপযোগিতা অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে একসময়ে বঙ্গদেশে সহজিয়া ধর্ম্ম বা সহজ-সাধনা নামে একটি গুহ্য সাধন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজনগণ সহজ-সাধক ছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে ধর্ম্ম প্রবর্তন করেন তাহার মধ্যেও সম্প্রদায় বিশেষের মতে অধিকারানুসারে সহজ-সাধনার সমাবেশ ছিল। সহজিয়াগণের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বৈষ্ণব গোস্বামীপাদগণের অনেকেই এই গুহ্য সাধনায় দীক্ষিত হইতেন। অনেকের বিশ্বাস, মহাপ্রভু স্বয়ং রূপগোস্বামীকে এই সাধনার নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। রঘুনাথ দাসগোস্বামী, লোকনাথ, নরোত্তম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, মুকুন্দ প্রভৃতি খ্যাতনামা অনেক আচার্য্যই সহজিয়া সাধনে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কেহ কেহ সহজ সাধনা সম্বন্ধে গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। এই সহজিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত আলোচনা এখনও কেহই করেন নাই।[১] যখন কেহ এই সুকঠিন কার্য্যে ব্রতী হইবেন তখন শাস্ত্রিমহাশয়ের আবিষ্কৃত ও আলোচিত মন্ত্রযান, বজ্রযান ও সহজযানের গ্রন্থাদির ঐতিহাসিক সার্থকতা

[১] মনীন্দ্রমোহন বসু *An Introduction to the Study of the PostChaitanya Sahajia Cult* নামে একটি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে চৈতন্তের পরবর্ত্তী সময়ের সহজিয়া ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে তবে অন্তরঙ্গ সাধনার রহস্তবিষয়ক উপপাদন ইহাতে নাই

ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। একদিকে তন্ত্রের কৌল ও বীর সাধনা, অপরদিকে নাথধর্ম্ম ও হঠযোগের সাধনা—উভয়ের সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিক ও রসসাধনার সংযোগ ফলে কালক্রমে মন্ত্র, বজ্র ও সহজযানের অন্তরঙ্গ সাধনা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্ত্ব ও সাধনার গূঢ় রহস্য এখানে আলোচ্য নহে। তবে ইহা সত্য যে উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উত্তরকালীন বিকাশের সঙ্গে সহজিয়াগণের সাধন পদ্ধতির মর্ম্মগত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

বজ্রযান ও সহজযানের গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সহজিয়া সপ্রদায়ের সাধন রহস্যের ঐতিহাসিক আলোচনার সুবিধা ছিল না। কেবলমাত্র অনুমান ও কল্পনা আশ্রয় করিয়া সকলেই আপন আপন সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেন। কেহ কেহ সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিতেন; কেহ কেহ—বস্তুতঃ অধিকাংশ অনুসন্ধানশীল পণ্ডিতই—ইহার নিন্দা করিতেন, এমন কি ইহার আলোচনাও শিষ্ট সমাজে অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, স্তুতিনিন্দার অতীতভাবে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত না। ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনাতে চিত্ত হইতে পূর্ব্বসংস্কাররূপ মল অপগত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেরূপ নিরপেক্ষভাবে আলোচনার প্রবৃত্তি বিদ্বৎসমাজেও খুব দুর্লভ ছিল। ইহার বহু কারণ ছিল। তন্মধ্যে প্রধান কারণ, সম্প্রদায়িক গ্রন্থের গোপনীয়তা, রহস্যবেত্তা সাধকের অভাব এবং সাম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ লোকের দুর্নীতিপরায়ণতা। এতদ্ব্যতীত তুলনামূলক আলোচনার সামগ্রীরও একপ্রকার অভাবই ছিল।...

বজ্র ও সহজসিদ্ধান্তের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইহা অবসর নহে। তবে ইহা সত্য যে শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রকাশিত উত্তরকালীন মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি অনুশীলন করিলে তান্ত্রিক ও সহজিয়া সাধকগণের বহু সিদ্ধান্তের রহস্য কতকটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। তাঁহার স্বকীয় বিচার ও উপপত্তি সকল সময়ে গ্রহণ না করিতে পারিলেও তাঁহার আবিষ্কারের ও আলোচনার মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে।

নাথ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও তিনি অনেক বিষয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন! মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণের জীবনচরিত ও সাধনা এখন লোকে প্রায় বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময় দেশে ইহাদের প্রভাব খুবই অধিক ছিল। সিদ্ধাচার্য্য যে কতজন ছিলেন তাহা বলা যায় না, তবে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্ণরত্নাকরের

তালিকা শাস্ত্রিমহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য স্থানেও ইহাদের নির্দ্দেশ আছে।···

যাঁহারা মধ্যযুগের সাধনা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবেন তাঁহাদিগকে শাস্ত্রিমহাশয়ের নিকট তাঁহার আবিষ্কার ও গবেষণার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। শাস্ত্রিমহাশয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিতেন, সেইজন্য তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা উপেক্ষণীয়।

শাস্ত্রিমহাশয় বলেন যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইন্দ্রভূতি নামে উৎকল (? দেশের একজন রাজা মন্ত্রযান হইতে বজ্রযান সাধনার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মসম্ভব ভোট দেশে এই মতের প্রচার করেন এবং তাঁহার জামাতা শান্তিরক্ষিত এই মত প্রতিপাদন করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কন্যাও বজ্রযানের প্রচার ও ব্যাখ্যানের জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধকগণের মধ্যে এই মহিলা 'ভগবতী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই বজ্রযান হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে সহজযানের উদ্‌ভব হয়। তিনি বলেন, সহজমার্গের প্রধান প্রচারক লুই নামক একজন রাঢ়দেশীয় বাঙ্গালী সাধক ছিলেন।[১০] যে দীপংকর শ্রীজ্ঞান একাদশ শতাব্দীতে ভোট দেশে (তিব্বত) বৌদ্ধমত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার গুরু বিখ্যাত দার্শনিক রত্নাকরশান্তি পর্য্যন্ত সহজযানের উপাসক ছিলেন। তিনি এক সময়ে বিক্রমশিলা বিহারের ধর্ম্মাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।····

বজ্রযান ও সহজযানে যে গভীর আধ্যাত্মিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা শুধু দুরধিগম্য বলিয়াই নিন্দার যোগ্য হইতে পারে না। যদি কোনদিন যোগ্যতা ও অধিকারসম্পন্ন কোন সাধক এই সকল ধর্ম্মমতের তথ্যানিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে ইহাতে এমন সব তত্ত্ব বিরাজমান আছে যাহা ধর্ম্মরাজ্যের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রি-মহাশয়ের প্রযত্নে এই সাহিত্য অনেকটা আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার জন্য সকলকেই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিতে হইবে।···

যখন অনেকেই মনে করিতেছিলেন, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত

---

১০. আদি সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ রচিত বজ্রসত্ত্বসাধন, বুদ্ধোদয়, শ্রীভগবদভিসময় ও অভিসময় এই চারিখানি সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া যায়। বাঙ্গালাতেও তাঁহার লিখিত কোন কোন গ্রন্থের কথা জানিতে পারা যায়।

জীবন্তভাবে বর্ত্তমান নাই, তখন শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার গবেষণার অপ্রত্যাশিত ফল লইয়া পণ্ডিতসমাজে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখাইলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম নামতঃ লুপ্তপ্রায় হইলেও ফলতঃ সমাজে বহুস্তরে, বহু অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মগত বহু আচারে এবং প্রকারভেদে জাতিবিশেষের বিশ্বাসে এখনও জীবিত রহিয়াছে।...

তাঁহার '*Discovery of Living Buddhism in Bengal*' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রকাশে ঐতিহাসিক সাহিত্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতেও ধর্ম্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ এবং তদ্‌জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ লোকলোচনের গোচর হইতে লাগিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যে আকারভেদে বহুদিন পর্যন্ত জীবিত ছিল, এবং কোন কোন রূপে সমাজের কোন কোন স্তরে এখনও আছে, তাহাতে আব সন্দেহ রহিল না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শাস্ত্রিমহাশয়েরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উৎকল দেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিবার ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল '*Modern Buddhism*' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ১৮৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ সালে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে (বাংগলা ১২৬০, ২২এ অগ্রহায়ণ—১৩৩৮, ১লা অগ্রহায়ণ)। এই সুদীর্ঘ আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তাঁহার জীবৎকালে বাংগলাদেশে ধীরে ধীরে একটি সাংস্কৃতিক ক্রান্তি বা যুগান্তর অথবা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। এই বিপ্লব একটি আকস্মিক ব্যাপার রূপে দেখা দেয় নাই। ইহার দ্বারা বাংগালীর চিন্তাধারার মধ্যে একেবারে একটা উলঠ-পালট ঘটে নাই। ইহাকে বরং বাংগালীর চিন্তাধারার একটি স্বাভাবিক বিবর্ত্তনই বলা যাইতে পারে। Violent Revolution অপেক্ষা ইহা ছিল Gradual Evolution-এর ব্যাপার। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজদের এদেশে রাজা হইয়া বসা পর্যন্ত বাংগালীর মনোভাব ধীর-মন্থর গতিতে, মধ্যযুগে যে পথ সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, সেই পথেই চলিতেছিল। অষ্টাদশ শতকে নবাবী আমলে বাংগালীর চিত্ত নিখিল ভারতের সংগে এবং বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের সংগে রাজনৈতিক যোগসূত্রে মিলিত হইলেও, তাহার জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এবং চিন্তারীতি বিশেষভাবে গ্রামীণ বা গ্রাম্যই ছিল। ভারতের অন্যান্য অংশে যে নাগরিক সভ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতেছিল, বাংগলাদেশে তাহার একান্ত অভাব ছিল। ভারতের অন্যত্র যে সমস্ত ক্রান্তিকারী-ব্যাপার ঘটিতেছিল, বাংগালী তাহার কোনো সংবাদ রাখে নাই বা রাখিবার সুযোগ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিবাজী-উৎসব' কবিতায় সংক্ষেপে এই অবস্থার ইংগিত করিয়াছেন।

সেদিন এ বংগদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে
পায়নি সংবাদ—
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শংখনাদ।

শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লিসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি ।।
তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকিদিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্র লিখা ।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা—
সেদিনও শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কী ছিল বারতা ।।

*　　*　　*　　*　　*

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন ।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে ;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে ।।

বাঙ্গালাদেশের সংস্কৃতি তখন উত্তর ভারতের সংস্কৃতিরই একটি অনুকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উত্তর ভারতের সংস্কৃতি তখন হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ও সংমিশ্রণের ক্ষেত্র এবং অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতে ও আংশিক ভাবে দক্ষিণাপথে যে মিশ্র হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি জগৎ অনেকটা গ্রাস করিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাঙ্গালার গ্রামীণ সংস্কৃতির উপর উত্তর ভারতের নাগরিক এবং রাজকীয় পরিবেশের প্রভাবের এক লক্ষণীয় উদাহরণ। নূতনের আগমনের জন্য যেন বাঙ্গালাদেশে এবং বাঙ্গালীর মনের মধ্যে একটা অজ্ঞাত আগ্রহ ও অশান্ত প্রতীক্ষা দেখা দিতেছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ইঙ্গিত, কবি ভারতচন্দ্র (যাঁহার রচনায় বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী জাতির মধ্যযুগের চিত্তের এবং নাগরিক

সংস্কৃতিময় ধ্যানধারণার চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল), এই অস্বস্তিময় প্রতীক্ষার কথা তাঁহার বিখ্যাত পদ—'ওহে বিনোদ রায়, ধীরে যাও হে। / অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥'—যেটী তিনি 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহারই শেষ দুই ছত্রের মধ্যে যেন বলিয়াছেন,

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে ॥

চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি অনুসারে, ভারতচন্দ্রের তিরোধানের (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসা সম্ভবপর হইল, সে পরিবর্ত্তন ভালোর জন্যই হউক বা মন্দর জন্যই হউক। কতকগুলি ভাল ও মন্দ প্রকৃতির দেশনেতার সাহচর্য্যে ও বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয় হইল ; এবং ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এই দেশের মধ্যে নূতন খেলা প্রবর্ত্তিত করিলেন।

কিন্তু এই নূতনকে বুঝিয়া উঠিতে আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি-গণের কিছুটা বিলম্ব হইয়াছিল। দেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা ইংরেজ শাসনকে মানিয়া লইলেন,—কলিযুগের অবশ্যম্ভাবী ম্লেচ্ছ রাজাদের শাসনেরই একটি রূপান্তর রূপে। ইংরেজ এদেশে আসিল, মুখ্যতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রে ও পরে শাসনক্ষেত্রে শোষকরূপে। তাহারা আসিত ভারতবর্ষে 'মোহরের গাছ নাড়া দিয়া' মোহর কুড়াইয়া জেবে ভরিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে —to shake the Pagoda tree and retire as Nabobs. যে ইংরেজ শাসকেরা আসিত, তাহাদের কাজ ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরূপে মুখ্যতঃ এ দেশের রাজস্ব আদায় করা। তাহারা ছিল collector 'কালেক্টর'। ১৭৬৫ সালে যখন মোগল সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ গ্রহণ করে, তখন তাহাদের মুখ্য কাজই ছিল এ দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া নিজেদের প্রাপ্য কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ দিল্লীর সরকারে পেশ করা। কোম্পানির নিযুক্ত ইংরেজ 'কালেক্টর' বা রাজস্ব আদায়কারীদের ম্যাজিস্ট্রেট বা শাসকের কাজ করিতে হইত— কাজী ও ফৌজদারের পদ ইহারাই দখল করিল। তখন দেশে আধুনিকতার প্রসার হয় নাই এবং শিক্ষা বিস্তার কোনও দেশে, এমন কি ইউরোপেও, সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। ইংরেজরা তাহাদের জ্ঞানগোচর মত এ দেশের পুরাতন রীতি বহাল রাখিয়া শান্তিপূর্ণ

উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছিল। কালেক্টর সাহেবকে যখন দেশী লোকের মধ্যে সম্পত্তির অধিকার লইয়া বিচার করিতে হইত, তখন তিনি এ দেশের চিরাচরিত হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্র অনুসারেই বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিতে চেষ্টিত হইতেন। তাঁহারা ফারসীর মাধ্যমে রাজকার্য্য চালাইতেন। ইংরেজী প্রচারের আকাঙ্ক্ষা বা তাগিদ তাঁহাদের ছিল না। বিচারকার্য্যে সাহায্যের জন্য আবশ্যকতা ছিল কোর্ট পণ্ডিতের ও কোর্ট মৌলবীর এবং টোলের পণ্ডিত, স্মৃতিতে যাঁহারা প্রবীণ এবং মক্তবের মৌলবী, যাঁহারা মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্রে প্রবীণ, তাঁহাদেরই কিছু কিছু ডাক পড়িত। ইংরেজ ইউরোপ হইতে যে সভ্যতা ও ভাবধারা এ দেশে আনিতেছিল, তাহা প্রথমটায় দেশের লোক বুঝিতেই পারে নাই এবং দেশের হিন্দু ও মুসলমান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সে সম্বন্ধে প্রথমটায় অবহিত হয়েন-ই নাই।

ইংরেজী শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল প্রথমটায় ব্যবসায়ী মহলে, যাঁহারা ইংরেজ সওদাগরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে মিলিত হইতেন; এবং একদিকে যেমন ইংরেজরা বাঙ্গলা শিখিত, তেমনই অন্যদিকে ইংরেজদের সাহচর্য্যে আসিয়া তাঁহারা দুই-দশটা ইংরেজী শব্দ শিখিয়া লইতেন ও তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। (ইংরেজরা বাঙ্গলাদেশে ও অন্যত্র কায়েমী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এক রকম ভাঙ্গা-ভাঙ্গা পোর্তুগীস ভাষা ইউরোপীয় বিদেশীয়গণের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত। সে ভাষা এখনও কিছু কিছু সিংহলে আছে, কিন্তু এক গোয়া ব্যতীত ভারতের অন্যত্র ইহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে)। ১৮০৮ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজী শিখাইবার জন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। শুনা যায় যে ঐ বৎসর একজন আর্ম্মানী সাহেব বাঙ্গালী ছেলেদের ইংরেজী পড়াইবার জন্য কলিকাতায় একটি ইস্কুল খুলিয়াছিলেন। দেশের মুসলমান ও অন্য মান্যগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে ইংরেজরা ফারসীর মাধ্যমে কথাবার্ত্তা কহিতেন। স্বয়ং রবার্ট ক্লাইভের ফারসী নাম ছিল 'সাবুত-জঙ্গ।' বাঙ্গালী দালাল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ শিখিয়া রাখিতেন; এবং সাহেবদের সহিত কাজ করিতে চাহে এমন অনেক উমেদার ইঁহাদের নিকট ইংরেজী শিখিবার আশায় গতায়াত করিতেন। অবশ্য যাঁহারা বাণিজ্য-সূত্রে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ মনে পোষণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট প্রথম হইতে ইংরেজী ছিল অর্থকরী বিদ্যা। প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষিত ব্যক্তি, অর্থাৎ হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী মুনশী মোল্লা, ইঁহাদের ইংরেজী শিখিবার গরজ বা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইংরেজদের প্রতাপ এবং

ইংরেজদের জ্ঞানবিজ্ঞান দুইই এক বিস্ময়কর ব্যাপার রূপে দেখা দেয় এবং তাঁহাদের মধ্যে ইংল্যান্ড তথা ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় জাতীর শক্তি, সভ্যতা ও বিদ্যার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব দেখা দেয়। কোন্ গুণে ইংরেজ এইরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জাতি হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাচাই বা নিরিখ করিবার কথা অনেকেরই মনে জাগিতে থাকে, এবং এই যাচাইয়ের একমাত্র পথ যে ছিল ইংরেজের ভাষা ও তাহার বিদ্যা আত্মসাৎ করার পথ এই চিন্তা অনেকেরই মনে উদিত হয়। ইহার ফলে, ১৮১৭ সালে কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতার প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় মতের হিন্দু অভিজাতগণ কর্ত্তৃক 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এইভাবে ইংরেজ সরকারের দ্বারা এ বিষয়ে কোনও চেষ্টা হইবার পূর্ব্বেই, বাঙ্গালী নিজের তাগিদে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিল। এ বিষয়ে একজন ইংরেজের সাহচর্য্য কলিকাতার অধিবাসিগণ পাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য David Hare ডেভিড হেয়ার। ইনি ব্যবসায় করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচারকেই তিনি নিজের জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ সম্পর্কে মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' পুস্তিকাতে (খ্রীঃ অঃ ১৮৭৬) বলিয়াছেন ঃ 'প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।......হেয়ার স্কুল আমাদিগের বর্ত্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথমে হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ...এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন হয়। তাঁহারা কলিকাতার কালীতলায় একটি বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তম্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী।...হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।...গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, ইঁহারা স্কুলের (হিন্দু কলেজের) গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' রাজনারায়ণ তাঁহার 'আত্ম-চরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ 'শম্ভু

[১ পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না।—সম্পাদক]

মাস্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম School Society's School ছিল।...স্কুলের প্রকৃত নাম School Society's School হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্তা ছিলেন। সাধারণ লোক হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া ডাকিত।' লোকের দেওয়া Hare School নামটাই উত্তরকালে পাকা স্বীকৃতি লাভ করিয়া, অদ্যাবধি সেই মহাত্মার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

তখন রাজভাষা ছিল ফারসী এবং যাঁহারা ইংরেজী শিখাইবার জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত করেন ব্যবহারিক ভাবে অর্থকরী বিদ্যার কথা না ভাবিয়া তাহারা উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন। এই আদর্শ ছিল—যে ইউরোপকে আর ঠেকাইতে পারা গেল না, তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া তাঁহার সহিত একটা আপস করিয়া নিজের দেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। অবশ্য কেহ কেহ পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, দুই একটি বিষয় ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার সামনে ভারতীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার উপযোগিতা বা মূল্য তাঁহারা দেখিতে পান নাই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার ১৮২৪ সালে কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপিত করেন। ইহার পূর্বেই, স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস-এর চেষ্টায় ১৭৮০ সালের শেষ দিকে 'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপিত হয়। এই দুই বিদ্যালয়ে প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শিক্ষা দেওয়া হইত। ভারতবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের কথা জোরের সংগে প্রচার করেন বিখ্যাত মনীষী Thomas Babington Macaulay টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। ইনি ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিংকের আমলে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ভারত সরকারের Law Member রূপে। ইঁহার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি Indian Penal Code বা 'ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন' প্রণয়ন। গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে ইঁহার যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, প্রাচ্য ভাষা ও তন্নিহিত বিদ্যা সম্বন্ধে ছিল তেমনই অজ্ঞতা আর অবজ্ঞা। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতবাসীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক, এবং ইংরেজীর মাধ্যমে তাহার সহিত পরিচয় তাহাদের পক্ষে সহজ ও সংগত হইবে। ইহাতে একসংগে দুই কাজ হইবে—একদিকে ইংরেজী শিখিয়া ভারতবাসী মানুষ হইবে, আবার অন্যদিকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহার ক্রমবর্ধমান রাজ্যের জন্য অল্প বেতনে মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী ভারতীয়দিগের মধ্য হইতেই পাইবে। বেশী মাহিনা দিয়া ইংল্যাণ্ড হইতে ইংরেজদের আনিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। এই সম্বন্ধে

মেকলের প্রস্তাব ১৮৩৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু তদনুসারে ইংরেজ সরকারের সহিত স্থির করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে কয়েক বৎসর লাগিয়া গেল। মোটামুটি ১৮৪০ সালের পরে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, এদেশে অল্প বেতনে ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার করা উচিত, এবং প্রত্যেক জেলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খুলিবার নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিলেন।

এদিকে হিন্দু কলেজ প্রায় এক পুরুষ ধরিয়া তাহার কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রমুখ সাহিত্যপাগল অধ্যাপকের হাতে পড়িয়া প্রায় কুড়ি বছর ধরিয়া বাংগালাদেশের কতগুলি বুদ্ধিমান্ যুবক ইংরেজী সাহিত্যের রসে মজিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিজ জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চর্চা কিছুই ছিল না—কেহ তাঁহাদের সংস্কৃত পড়াইবার কথা ভাবে নাই, এবং বাংগালাতেও তখন কোন আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। তাঁহারা কেবল ইংরেজীই পড়িতেন, এবং ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় প্রাচীন, মধ্য-যুগের ও আধুনিক কালের বিরাট্ সাহিত্য সম্ভার বন্যার মত আসিয়া তাঁহাদের মনকে প্লাবিত করিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি ও চিন্তানেতাদের সমকক্ষ কাহাকেও তাঁহারা স্বজাতির সাহিত্যিক ঐতিহ্যে পাইলেন না। ইহাতে 'ইয়ং বেংগল' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর ইংরেজীশিক্ষিত যুবকের উদ্ভব হইল, যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে জাতীয় সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট বা বিকেন্দ্রিত হইয়া পড়েন, এবং মনে প্রাণে ইংরেজ হইবার ব্যর্থ সাধনায় লাগিয়া যান। এই সংগে সংগে আর একটি আদর্শবিপর্যয়ের পথ উন্মুক্ত হইল। সেটি হইতেছে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ইউরোপীয় বিদ্যাদানের মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচার—এখানে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা প্রচার অপেক্ষা ভারতীয় যুবকগণকে মনে প্রাণে বিজাতীয় হইবার শিক্ষাই দেওয়া হইত।

এই অবস্থায় যখন বিদেশীয় শিক্ষার প্লাবনে বাংগালার যুবকদের বহিয়া যাইবার আশংকা দেখা দিল, তখন রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা চিন্তান্বিত হইলেন। রাজা রামমোহন রায়ের উপনিষদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার মৌলিক আধার সম্বন্ধে দেশের লোকেদের অনেকটা সচেতন করিয়াছিল। সংগে সংগে ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আবিষ্কার ও অধ্যয়নের ফলে, অপ্রত্যাশিতভাবে ইউরোপ হইতে ভারতের প্রাচীন মনীষার প্রতি যে শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার এক বিশেষ অনুকূল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও দেখা দিল। এই দুইটী জিনিস নূতন করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দেশাত্ম-

বোধের সহিত এক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আবেদন আনিয়া দিল। ১৮৫৭ সালে যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইল, তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পাঠ্য বস্তুর মধ্যে, ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও লাটিনের মত, ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ও ভারতের মুসলমানদের ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির ভাষা আরবী-ফারসীর পঠন-পাঠনের একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রথমে ভারতবর্ষে Democratization of Sanskrit অর্থাৎ জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই সংস্কৃতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ভারতের আধুনিক যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই ঘটনার মূল্য অসাধারণ।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, ১৮২০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত এই ৪০ বৎসর ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচিত হইবার দ্বিতীয় যুগ। ১৭৬০ হইতে ১৮২০ পর্য্যন্ত ইংরেজের সহিত সংস্পর্শের প্রথম যুগে ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। ১৮৬০ হইতে আমাদের দেশে ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সহিত আমাদের পরিচয়ের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইল, এবং এই যুগ হইল ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। এই যুগে যে সকল মনীষী বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে আত্মস্থ এবং পরিপুষ্ট করিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম পুরুষের মানুষ বলিয়া ধরা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষিগণ। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন প্রমুখ সন্ধিযুগের মনীষিগণ। বিদ্যাসাগর প্রমুখ সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধকদের অব্যবহিত পরে দেখা দিলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁহার সমসাময়িক লেখক ও চিন্তানেতৃগণ—যেমন কেশবচন্দ্র সেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিবেকানন্দ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাদের অপেক্ষা সময় হিসাবে কিছু অর্ব্বাচীন। কিন্তু ইনিও সেই একই মন্ত্রের ধারক ও বাহক ছিলেন। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃত বাঙ্ময়, বাঙ্গালা সাহিত্য—ইহারই মাধ্যমে তিনি বাঙ্গালাদেশের চিন্তা-

ধারায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন এবং এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি ছিলেন অন্যতম যুগনেতা, আধুনিক বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মানসিক সংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন প্রধান পরিচালক। প্রাচীনকে বুঝিয়া আধুনিককে সৎ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার পথে যাঁহারা পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। শাস্ত্রী মহাশয় নিজের শিক্ষা ও মানসিক জীবনে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন সংস্কৃতজীবী অধ্যাপক পণ্ডিতের ঘরে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব-পুরুষেরা নৈহাটীতে নিজেদের বাড়ীতে একটা টোল খুলেন। এই টোলটী নৈহাটী অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। এ সম্পর্কে স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি উদ্ধার যোগ্য। বাঙ্গালা ১৩৩১ সালে রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনী'র মূল সভাপতির অভিভাষণে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বিদ্যাচর্চ্চার উল্লেখ প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :

'আমার পূর্ব্বপুরুষ নৈহাটীর ভট্টাচার্য্যদের সঙ্গে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সম্পর্ক অতি মিষ্ট ও অতি ঘনিষ্ঠ। বর্গীর হাঙ্গামায় যখন গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে সমস্ত দেশ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, তখন হইতে কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত-সমাজ অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই সময়েই আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা নৈহাটীতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলেন। একশত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলে নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ী পাঠ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই নৈহাটীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তথা হইতে উপাধি লইয়া গিয়াছেন। বেশী দূরে যাইতে হইবে না, এখানকার [খানাকুল-কৃষ্ণনগরের] প্রবীন নৈয়ায়িক কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় আমার ন'ঠাকুরদার পড়ুয়া ছিলেন।···তাঁহার ভ্রাতা বারাণসী-দাদা রামকমল ন্যায়রত্নের [হরপ্রসাদের পিতৃদেবের] নিকট পাঠ স্বীকার করেন এবং অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। বাবার এক প্রধান ছাত্র সত্যব্রত [সামশ্রমী]। সত্যব্রতের বাড়ী খানাকুল। বাবা বলেছিলেন সত্যব্রতের মত ছাত্র পাওয়া কঠিন। আমার মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালংকার মহাশয় বলিতেন, কমলের বড় ভাগ্য যে সত্যব্রতের মত ছাত্র পাইয়াছে। ক্ষীরপাই রাধানগরের শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় আমার বাবার পড়ো ছিলেন।····'

শাস্ত্রী মহাশয় যখন আট বৎসরের বালক, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু সে সময় কান্দীর ইস্কুলে হেড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর নন্দকুমার তাঁহার বালক ভ্রাতা হরপ্রসাদকে নৈহাটী হইতে কান্দীতে লইয়া আসেন এবং কান্দীর ইস্কুলে ভরতি করিয়া দেন। ইংরেজী ১৯২৩ সালে লিখিত একটী প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

'বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা ৺নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দীর হেড্ পণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর স্কুল এ্যাংগলো সংস্কৃত স্কুল ছিল, হেড্ মাষ্টার ও হেড্ পণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ-বি-সি শিক্ষা কান্দীর স্কুলেই হয়। আমরা প্রায় এক বৎসর কান্দীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর····। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য, সেই নামেই আমায় ভরতি হইতে হইয়াছিল।' ['পুরাণ বাঙ্গলার একটা খণ্ড', পৃ. ৪]

কিন্তু নন্দকুমারও অকালে দেহরক্ষা করেন, কান্দীর ইস্কুল ত্যাগ করিয়া হরপ্রসাদকে নৈহাটীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে সমগ্র পরিবারে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়। কিন্তু এই দুর্য্যোগের মধ্যেও বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান শরৎনাথের শিক্ষা ক্ষান্ত থাকে না। নৈহাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথমে কাঁটালপাড়ার টোলে এবং পরে স্থানীয় বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। পরে, 'হর-প্রসাদে' অর্থাৎ মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্তির পর হইতে 'হরপ্রসাদ' নামান্তরে পরিচিত শরৎনাথ, ইংরেজী ১৮৬৬ সালে, তেরো বছর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভরতি হন। এই সময় হরপ্রসাদ কিছুদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার ছাত্রাবাসে থাকিয়া সর্ব্বপ্রথম সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইংরেজী ১৮৭১ সালে আঠারো বৎসর বয়সে হরপ্রসাদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন চার বৎসরের শিশু, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ঐ সময় মধ্যবিত্ত ঘরে যে ইংরেজী শিখিবার একটা প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র দেখা দেয়, সংস্কৃতজীবী পণ্ডিত-বংশের সন্তান হইলেও হরপ্রসাদ তাহার প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। বহু পণ্ডিতঘরের কিশোর ও যুবকের মত তিনি শিক্ষা-বিষয়ে সব্যসাচী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত চর্চ্চা তিনি কখনও ছাড়েন নাই, এবং সংস্কৃত কলেজে একই সঙ্গে F. A. পরীক্ষা পাঠের সহিত সংস্কৃত পাঠও গ্রহণ করেন। এইভাবে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ শিক্ষাধারার দোষ ও গুণ উভয়েরই সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল। তখন প্রাচীন পদ্ধতির

সংস্কৃত চর্চা দেশে পূর্ণভাবে চলিতেছে এবং মধ্যযুগের সংস্কৃত বিদ্যার ধারা তখনও দেশের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের মধ্যকালীন সংস্কৃত চর্চার ধারায় যুগোপযোগী আধুনিক পদ্ধতি আনীত হয়, তাঁহার 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও কয়েক খণ্ড 'ঋজুপাঠ' কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের মধ্যে ও সারা বঙ্গদেশে ও পরে সমগ্র উত্তর ভারতে সংস্কৃত শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত আরও কতকগুলি মনীষী ভারতের অন্যত্র উদ্ভূত হন, যাঁহারা একাধারে প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত বিদ্যা ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এই উভয়েই প্রাবীণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যেমন—রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী, ভাউ দাজী, সুধাকর দ্বিবেদী, গঙ্গানাথ ঝা, গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝা, কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী, গণপতি শাস্ত্রী, র. শামশাস্ত্রী। ইঁহারা সকলেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, বিদ্যা ও সংস্কৃতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুক্তিসংগত দৃষ্টিভংগী লইয়া আলোচনা করেন, এবং তথ্য ও তত্ত্ব উভয় দিক হইতেই সার্থকভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন সাধারণ জ্ঞানতপস্বী পণ্ডিতেরই জীবন ছিল—ইহাতে চমকপ্রদ ও লোমহর্ষণ ব্যাপার বা ঘটনার স্থান ছিল না। তিনি সারা জীবন অধ্যয়ন,. অধ্যাপনা ও গবেষণার কার্য্যেই অতিবাহিত করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনার পক্ষে পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত তথ্যপূর্ণ পুস্তিকাখানি ('সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ৭৩ সংখ্যক পুস্তিকা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) অমূল্য।...

একাধারে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, এবং রসসর্জ্জনা ও রসপরিবেষণ, এই উভয় প্রকার সাহিত্যিক অভিব্যক্তিই শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্বের অন্তর্গত। প্রাচীন আলংকারিক ও সাহিত্যিক রাজশেখর দুই প্রকারের প্রতিভার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—'কারয়িত্রী প্রতিভা' এবং 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা যায় Creative Genius এবং Reflective or Critical Genius. অন্যভাবে এই দুই প্রকারের প্রতিভাকে বলা যায় যে, একদিকে রসস্রষ্টা ও অন্যদিকে রসিক বা ভাবুক এবং তথ্য-নির্দ্দেশক। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাতে যেখানে তিনি সাহিত্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার রচনা হইয়াছে Literature of Power—অর্থাৎ মানুষের মনকে উদ্বেলিত করিতে পারে, রসাসিক্ত করিতে পারে, উচ্চচিন্তার প্রণোদিত করিতে পারে এমন সুসাহিত্য; এবং অন্যদিকে তাঁহার অন্য রচনা

হইতেছে Literature of Information বা তথ্যনির্ণায়ক ঐতিহাসিক অথবা সমালোচনা সাহিত্য। একাধারে এই দুই প্রকার বৃত্তির এইরূপ অদ্ভুত বিকাশ জগতে সুলভ নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্য একমাত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই উভয়বিধ গুণ দেখা গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি সুন্দর সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বলা যায় যে 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান এবং প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে বোধ এই উভয়ের আধারে, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত নূতন ধরণের দুইখানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস ('কাঞ্চনমালা' এবং 'বেণের মেয়ে') তিনি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম গদ্যকাব্য। 'মেঘদূতের ব্যাখ্যা'-য় তিনি নূতনভাবে সংস্কৃত সাহিত্যরস গ্রহণের রীতি বাঙ্গালার মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছেন; এবং এই হিসাবে তাঁহাকে টীকা রচনার নূতন পদ্ধতির স্রষ্টা বলিতে পারা যায়। ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কাজ হইতেছে সংস্কৃত পুঁথির আলোচনা। এই বিষয়ে ইঁহার আট দশ খণ্ড বর্ণনাত্মক সংস্কৃত পুঁথির সূচী, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমগ্র বিভাগের পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য অমূল্য উপাদানের আকর পুস্তক হইয়া আছে। বহু দুষ্প্রাপ্য এবং সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় ভাষায় পুস্তক, যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বে আর কেহ পান নাই, তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়া, হয় সেগুলি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, না হয় সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বাঙ্ময়ের ইতিহাস রচনা করিবেন, এবং এইরূপ একখানি ইতিহাস তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান কৃতিত্ব হিসাবে দেশবাসীর নিকট সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলে হয় তো তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত, এবং তাহাতে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ ধন্য হইত, আধুনিক ভারতের সংস্কৃত-চর্চ্চা গৌরবান্বিত হইত। কিন্তু যোগাযোগে সেই রূপটি ঘটিল না, কতক-গুলি সূচী পুস্তক ও প্রকীর্ণ প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছুই তিনি এ বিষয়ে দিয়া যাইতে পারেন নাই। নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া যান, কিন্তু সেখানেও তিনি যথেষ্ট সম্মাননা পাইলেও আশানুরূপ কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম আবিষ্কার হইতেছে তাঁহার মাতৃভাষার সাহিত্য। যে সময়ে বাঙ্গালী জাতি তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে

আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, প্রাচীন বাংগলা কাব্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং সারদাচরণ মিত্র, জগবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রমণীমোহন মল্লিক প্রমুখ অল্প দুই চারিজন গবেষক এই বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রাচীন বাংগালা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশন আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, সেই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়, এখন হইতে পঁয়ষট্টী বৎসর পূর্ব্বে, শিক্ষিত বাংগালী পাঠকের নিকট তাহার পুরাতন সাহিত্যের একটি দিগ্‌দর্শন দিয়াছিলেন। তিনি বংগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত বাংগলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও তাহার ইতিহাস প্রণয়ন বিষয়ে যেমন আত্মনিয়োজিত হন, তেমনি মুখ্যতঃ কলিকাতার এশিয়াটীক সোসাইটিকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সার্থকভাবে ব্যাপক গবেষণা করিয়া যান। বংগীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাধ্যমে তিনি 'ধর্ম্মমংগল' কাব্যের এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন, এবং ধর্ম্মমংগলের বিষয়বস্তু লইয়া কতকগুলি অনুসন্ধানমূলক লেখ বাংগালায় ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। তদ্রূপ তাঁহার সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের 'আদিপর্ব্ব' প্রাচীন বাংগালার একখানি প্রধান গ্রন্থের এক অতি মূল্যবান্ সংস্করণ। কিন্তু বাংগালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা তাঁহার নিকট একটি বিশেষ কারণে চিরঋণী থাকিবে—সেটি হইতেছে তাঁহার দ্বারা নেপালের রাজদরবারের লাইব্রেরীতে বৌদ্ধ 'চর্য্যাপদ' গ্রন্থে রক্ষিত পুরাতন বাংগালা পদের পুঁথির আবিষ্কার ও তাঁহার প্রকাশন। এই পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাংগালা ভাষার কোন অবিসংবাদিত রূপের প্রাচীন নিদর্শন আমাদের জানা ছিল না। এই চর্য্যাপদ প্রকাশের ফলে বাংগালা ভাষার ইতিহাস খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত টানিয়া লইতে আমরা সমর্থ হইলাম। বাংগালা ভাষা ও সাহিত্য তথা নব্য ভারতীয়-আর্য্য ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এই পুস্তকের মূল্য সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং সুখের বিষয়, এই বই লইয়া সার্থক আলোচনা বাংগালী বিশেষজ্ঞমহলে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাংগালাদেশে ধর্ম্ম-দেবতার সহিত এদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের একটা সংযোগ আছে বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমেই মনে করেন। এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে গবেষণার অবকাশ আছে এবং হয়তো শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবিত এই সংযোগের কথা পূর্ণভাবে সমর্থিত না হইতেও পারে; কিন্তু তাহা হইলেও এই গবেষণার সূত্রপাত শাস্ত্রী মহাশয়েরই দান। তাঁহার সম্পাদিত কতকগুলি মূল্যবান্ এবং অপূর্ব্ব-প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ আছে। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই (যথা—সন্ধ্যাকরনন্দী-রচিত 'রামচরিত' নামে দ্ব্যর্থক ঐতিহাসিক কাব্য, অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য, আর্য্যদেবের 'চতুঃশতিকা', 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ'

প্রভৃতি) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাচীন বাংগালার ইতিহাসে 'রামচরিত' কাব্যের মূল্য অসাধারণ এবং সমস্ত ঐতিহাসিক মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। তদ্রূপ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য ও আর্য্যদেবের রচনাও মহামূল্য।

শাস্ত্রী মহাশয় বাংগালা ভাষার একজন প্রধান নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি কেবল ইতিহাস ও সাহিত্য লইয়াই নহে, প্রাচীন জীবনপদ্ধতি, সমাজ, ধর্ম্মনীতি ও দর্শন লইয়া নহে, উপরন্তু আধুনিক বাংগালীর জীবনের ছোট-খাটো নানা সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে লক্ষণীয়—তাঁহার বিচারশৈলীর যৌক্তিকতা, তাঁহার রচনাভংগীর সাবলীলতা এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার রোচকতা ; এবং সর্ব্বোপরি, তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা বাংগালার এক অপূর্ব্ব সম্পদ্। তাঁহার পূর্ব্বে বাংগালা ভাষায় গদ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাংগালা ভাষাকে সাহিত্যিক মর্য্যাদায় উপযুক্ত করিয়া তোলার কৃতিত্ব ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। তিনি কেবল যে চিন্তার ধারাকে সুযুক্তিপূর্ণ ভংগীতে পরিচালিত করিবার পথ বাংগালীকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন তাহাই নহে, বাংগালা সাধুভাষার যে একটা অন্তর্নিহিত ছন্দের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে, তাহার পাঠকালে বাংগালীর স্বাভাবিক উচ্চারণকে অবলম্বন করিয়া যে একটি aesthetic appeal অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবোধের আবেদন বিদ্যমান, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম দেখাইয়া দেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অপরের পক্ষে সাহিত্যিক প্রকাশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্য তাঁহার রচনায় সাধুভাষা ভিন্ন চলিত ভাষার লঘু ও চটুল গতির পক্ষপাতী ছিলেন না, যদিও তিনি তাঁহার বেনামী রচনায় (বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন প্রসঙ্গে) সরস চলিত-ভাষার অবতারণা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সেদিকে প্রথম অবহিত হইয়াছিলেন বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের কয়েকজন লেখক, যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র গুরুগম্ভীর ও দুষ্পাচ্য সংস্কৃত-শব্দাড়ম্বর-পূর্ণ রচনাশৈলীর অন্তরালে কতকগুলি লৌকিক কাহিনী রচনার দ্বারা ; পরে মৌখিক ভাষার শক্তি প্রকাশ করিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শেষ বিদ্যাসাগরের সমকালীন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী গদ্যলেখক, বিশেষতঃ যাঁহারা একটু সংস্কৃত পড়িতেন, তাঁহারা গুরুগম্ভীর সংস্কৃতমূলক ভাষার মন্থর ও আড়ষ্ট গতির নিগড়ে বাংগালা ভাষার প্রকাশশক্তিকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দিলেন বাংগালা

ভাষার সর্ববিধ শক্তির এক অভাবনীয় প্রকাশকরূপে—তাঁহার প্রথম যুগের পুস্তক 'দুর্গেশনন্দিনী'র সংস্কৃতময় ও কতকটা আড়ষ্টশৈলী একদিকে, এবং অন্যদিকে তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা 'ইন্দিরা' উপন্যাসের সরল সাবলীল মৌখিক ভাষার অনুকারী বাঙ্গালায়। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষাও অতি সুন্দর এবং উভয় শৈলীর এক অতি মনোহর সমন্বয়। এদিকে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত গুণী নাট্যকার দেখা দিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলা কথ্য ভাষার শক্তি ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে অজ্ঞাতসারে সচেতন করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম যৌবনের রচনা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-তে চলিত-ভাষার পুনরা-বাহন করিলেন,—যদিও তিনি সাধু ও সংস্কৃতপ্রধান বাঙ্গলাতে অপরূপ কবিতা ও গদ্য তাঁহার প্রথম জীবনে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেন, তখন তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতবহুল সাহিত্যিক শৈলী অনুসরণ করেন। গবেষণাত্মক রচনায় বিষয়গৌরবের জন্য তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। 'ভারত-মহিলা' ও 'বাল্মীকির জয়'-এর ভাষার সহিত তাঁহার শেষ জীবনের রচনা 'বেণের মেয়ে'-এর ভাষার তুলনা করিলেই, কোন্‌দিকে তাঁহার লেখনী অগ্রসর হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠেন। বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও, তাহার নিজস্ব একটা প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এবং এই সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও আধুনিক। তাঁহার বাঙ্গালা রচনায় একাধিক স্থানে বাঙ্গালা ভাষা কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নিজের মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি যে কেবল নিজের মত প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, হাতে কলমে তিনি নিজের বিচারের যাথার্থ্য প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। প্যারিসে ছাত্রাবস্থায় আমার অধ্যাপক স্বর্গীয় Jules Bloch ঝুল্ ব্লক্ বলিতেন যে, মাতৃভাষা সম্পর্কে ফরাসী পণ্ডিতদের এই আদর্শ যে, অতি মহাপণ্ডিতও যদি কোনও গভীর দার্শনিক বা সাহিত্য-সংক্রান্ত তত্ত্ব বা তথ্য লইয়া আলোচনা করেন (বিজ্ঞানের কথা পৃথক্, কারণ বিজ্ঞানে বিশেষ প্রবেশ অপেক্ষিত), তাহার ভাষা এমনই প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হওয়া চাই যে, ফরাসী ভাষা শুনিয়া বা পড়িয়া যে বুঝিতে পারে এমন মানুষের পক্ষে ভাবগ্রহণে ও রসগ্রহণে যেন কোন বাধা না হয়। এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ফ্রান্স দেশের সমস্ত বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থিত College de France নামক প্রতিষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মনীষিগণ তাঁহাদের গবেষণার বিষয়ে যে সকল ভাষণ দেন, সেই সব ভাষণে ফরাসী জ্ঞানবিজ্ঞানের উচ্চতম প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহা শুনিয়া জনসাধারণ কিছু-না-কিছু জ্ঞান অথবা রস পায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রকাশ সম্পর্কে অনুরূপ বিচার ছিল—যতই গভীর বিষয় হউক না কেন প্রকাশভঙ্গী এমনই স্বচ্ছ, সহজ ও সর্ব্বজনবোধ্য হওয়া উচিত, যাহাতে বক্তব্য অনায়াসে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই পেঁীছিতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়।

তাঁহার লেখায় এই গুণ যে সহজভাবে প্রকটিত হইত, তাহার পিছনে ছিল সহজভাবে কথাপ্রসঙ্গে বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার তাঁহার অসামান্য শক্তি। শাস্ত্রী মহাশয় একজন শ্রেষ্ঠ Conversationalist অর্থাৎ সংলাপ-রসিক ছিলেন। তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে কোনও প্রয়াস ছিল না, এবং উপরন্তু কথোপকথনে হাস্যরসের অবতারণা করিবার শক্তি এই পরিহাসপটু পণ্ডিতটির মধ্যে অসাধারণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের রসিকতার অনেক গল্প অনেকেই শুনিয়াছেন। 'রসানাম্ আদিঃ শ্রেষ্ঠঃ'—ক্বচিৎ তাঁহার রসিকতায় এই শ্রেষ্ঠ রসেরও আভাস যে আসিত না, তাহা নহে; কিন্তু এই জন্যই তাহা রসজ্ঞ জনের নিকট বিশেষ উপভোগ্য ছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিবন্ধগুলিতে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তবে সমাজের গতি বা সামাজিক সমস্যা লইয়া, দুই চারিটি প্রবন্ধ ভিন্ন অন্যত্র তিনি তেমন স্পষ্ট ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। জীবনের প্রায় সর্বদিক সম্পর্কেই তাঁহার দর্শন ও সমীক্ষা ছিল; এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রাচীন-ভারতবিদ্যাবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোথাও তিনি বাঙ্গালাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও নিজ সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ'), তিনি ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজের চিরানুসৃত মতের পরিপন্থী কথাও প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন: সত্যই কি এই প্রবন্ধে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, না, কেবল একটু রসিকতা করিয়াছেন? যাহাই হউক, প্রথমে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক হরপ্রসাদের রচিত 'ভারত মহিলা' বিষয়ক প্রস্তাবে কিছু আপত্তিকর অর্থাৎ প্রচলিত মতের বিরোধী 'ভিউ' আছে মনে করিয়া প্রস্তাবটি ছাপাইতে চাহেন নাই, কিন্তু পরে সেই 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকারই সম্পাদক আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত

আপত্তিকর মনে হইলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিত সূচনার পরে, এই প্রবন্ধটি (প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ) প্রকাশিত করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণাত্মক প্রবন্ধের নামকরণই অনেক সময় পাঠকের আগ্রহ বাড়াইয়া তুলিত, যেমন—'যৌবনে সন্ন্যাসী', 'একজন বাঙ্গালী গভর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব', 'খাজনা কেন দিই ?', 'স্ত্রী-বিপ্লব', 'নূতন কথা গড়া', 'সাবেক মনুষ্যত্ব ও হালের সাইন করা', 'হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা', 'কালিদাসের মেয়ে দেখান', 'বিরহে পাগল', শকুন্তলার মা', 'শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী,' 'এক এক রাজার তিন তিন রাণী', 'বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ?', 'রঘুবংশের গাঁথুনি', 'অগ্নিমিত্রের ভাঁড়', 'রঘু আগে কি কুমার আগে,' 'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ', 'এস, এস বঁধু এস', ইত্যাদি। এই কৌতূহল জাগাইয়া তোলা সকল প্রকার রচনারই একটী বড় সার্থকতা, এবং শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ পাকাপোক্ত ছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষের বহুস্থানে ঘুরিয়াছেন, এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত এবং বাঙ্গালাদেশ ছাড়া, ভারতের অন্য প্রদেশেও তাঁহার বিচারের রশ্মি আলোকপাত করিয়াছে। একদিকে যেমন তিনি বাঙ্গালা ভাষার আদিম রচনা 'চর্য্যাপদ' আবিষ্কার করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই তিনি মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম উপলব্ধ গ্রন্থ জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত কথকতার পুঁথি 'বর্ণরত্নাকর' আবিষ্কার করিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং এই পুস্তকের একখণ্ড পুঁথি তাঁহারই আবিষ্কারের ফলে Asiatic Society Library-তে রক্ষিত হইতে পারিয়াছে।[১] বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙ্গালাদেশে একজন বৈষ্ণব সাধক কবি ও পদকর্ত্তা 'মহাজন' বলিয়া সম্মান করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম বিদ্যাপতির কবিত্বের স্বরূপ ও তাঁহার ব্যক্তিত্ব বাঙ্গালীর কাছে প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতি যে পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে যেরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারা ও সাধনমার্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল তদনুরূপ ভাবধারা ও সাধনমার্গের পথিক যে তিনি ছিলেন না, এবং তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ যে কেবল সংস্কৃত প্রেমের কবিতারই পথানুযায়ী কবিতামাত্র ছিল—এই সমস্ত কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বিদ্যাপতির অপ্রকাশিতপূর্ব কাব্যগ্রন্থ 'কীর্ত্তিলতা'-র বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় ব্যক্ত করেন। ইহাতে ভক্তিপ্রবণ বৈষ্ণব কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু

---

১. এই পুস্তক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুআ মিশ্র ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সমেত Asiatic Society হইতে ইংরেজী ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার যুক্তির খণ্ডন হয় নাই। রাজস্থানের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রাচীন পুঁথি লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।[১] আমার মনে পড়ে, বহুদিন পূর্ব্বে যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত শাস্ত্রী মহাশয় ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি রাজস্থান ভ্রমণ শেষ করিয়া সেখান হইতে কবি চন্দ বরদাঈয়ের বংশধর এক ভাট কবিকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে আমাদের অনেকের পক্ষে, সর্ব্বপ্রথম রাজস্থানের ভাটের মুখে 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' হইতে পাঠ শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেই সভায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি অতিথি ভাট মহাশয়কে প্রশস্তি করিবার কালে 'চারণরাজ' বলিয়া সম্বোধন করায়, শাস্ত্রী মহাশয় তখনই উঠিয়া তাঁহার প্রশস্তিবাচনে বাধা দিয়া, আমাদের সকলকে রাজস্থানের ভাট ও চারণের এবং বারহঠ প্রমুখ অনুরূপ অন্য জাতির বৈশিষ্ট্য ও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন—চারণেরা ভাটেদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া পরিষদের অতিথি ভাট মহাশয় চারণ আখ্যায় খুশী হইতেন না। এইরকম খুঁটিনাটি অনেক বিষয় হইতে বুঝিতে পারিতাম যে, শাস্ত্রী মহাশয় আধুনিক ভারতের জীবনের বহুদিক্ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন এবং কথা প্রসঙ্গে তাহার প্রকাশ পাইত।

আর একটি বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালাদেশে তথা ভারতবর্ষে এক Silent Revolution বা নিঃশব্দচারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। সেটি হইতেছে নাট্যকলায় ইতিহাসানুমোদিত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ইত্যাদির ব্যবহার। শাস্ত্রী মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি একবার কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা সংস্কৃত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি নিজে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া, যতদূর সম্ভব প্রাচীন ভারতীয় পাত্র-পাত্রীদের পরিধেয় অলঙ্কারাদির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ও তদনুসারে এই সমস্ত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অভিনয়ের পরে দুই তিন বাক্স ভরা সেই সমস্ত কাপড়চোপড় ও গহনা প্রভৃতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটকে তিনি দান করেন। তখন আমরা কলেজের ছাত্র ও ইন্‌স্টিটিউটের সদস্য, এবং ইতিপূর্ব্বেই স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের শেক্‌স্‌পীয়রের Julius Caesar নাটকের অভিনয়কালে প্রাচীন রোমের পোষাকের নকল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই অভিনয়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

১. দ্রষ্টব্য Preliminary Report on the Operation in Search of Mss. of Bardic Chronicles শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ১৯১৩ সালে Asiatic Society-তে এই রিপোর্ট পেশ করেন।

অন্যতম অভিনেতা ছিলেন ; পরে ইন্‌স্টিটিউটে শিশিরকুমার ও অন্য বন্ধুগণ যখন দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয় করেন, তখন আমাদেরই ডাক পড়িল বেশকারীর কার্য্য করিতে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিকল্পিত এই প্রাচীন ভারতের পোষাক ও গহনাগুলি তখন আমাদের কাজে আসিল ; এবং আমাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়ে প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন গ্রীসের পরিচ্ছদ ও অলংকার ইত্যাদি যথাযথ অনুকরণের চেষ্টা, কলিকাতার পণ্ডিত ও রসজ্ঞ সমাজের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হয়। এখন ক্রমে বাঙ্গালা নাটকে ও দেখা-দেখি ভারতের অন্যত্র, পোষাক পরিচ্ছদ অলংকার আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকতাবোধ আসিয়া গিয়াছে ; এবং আমি বলিব, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম চেষ্টা এই ব্যাপারের বীজস্বরূপ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার ব্যক্তিগত সংযোগের কথা একটু বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার বিবাহসূত্রে আত্মীয়তার সুযোগ ঘটিয়াছিল, এবং তিনি সম্পর্কে আমার দাদাশ্বশুর ছিলেন। এই সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কারণে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আমি তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হই, এবং তাহার বহু পূর্ব্বে দূর হইতে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছিলাম। অগ্রজকল্প রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে শাস্ত্রী সম্পর্কে অনেক কথা শুনি ; এবং উভয়ের মধ্যে কোন-কোনও বিষয়ে মতা-নৈক্য থাকিলেও, শাস্ত্রী মহাশয়ের বিদ্যা এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি রাখালদাসের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছি। ১৯১৬ সালে আমি প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাই এবং আমার আলোচ্য বিষয় ছিল বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণতত্ত্ব, এবং আমার পক্ষে এক বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা এই যে, আমার পরীক্ষক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং ইঁহাদের উভয়েরই অনুমোদন পাইয়া আমার গবেষণা সাফল্যলাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশিত হইবার পরে, চর্য্যাপদের ভাষা লইয়া কেহ কেহ অবান্তর কথা বলেন। কিন্তু প্রথম হইতেই আমার ধারণা ছিল যে, চর্য্যাপদ কয়েকটির ভাষা নিঃসন্দেহ-রূপে পুরাতন বাঙ্গলা (দোহাকোষ ও ডাকার্ণবের ভাষা কিন্তু বাঙ্গালা নহে, পশ্চিমা অপভ্রংশ)। শাস্ত্রী মহাশয় আমার ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। ১৯২৬ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমার গবেষণাত্মক পুস্তক Origin and Development of the Bengali Language প্রকাশিত হয়, তখন শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করেন। এই বই পড়িয়া তিনি এত খুশী হন যে,

একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার গৃহে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গণপতি সরকার ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক ও পণ্ডিতকে ও আমাকে একটি অন্তরঙ্গ সভায় আহ্বান করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন, যেমন নৈহাটীর গজা, জনাইয়ের মনোহরা, বর্ধমানের খাজা, মিহিদানা ও সীতাভোগ, পেনেটির গুঁপো, জয়নগরের মোয়া, বড়বাজারের রাতাবি সন্দেশ। এইরূপ মিষ্টান্ন ও ফল দিয়া আমাদের জলযোগ করাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় আমার রচিত দুইখণ্ড পুস্তক আনাইয়া হীরেন্দ্রবাবু প্রমুখ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, 'আজ আপনাদের যে বিশেষ কারণে আহ্বান করিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, এই ছোকরা মাতৃভাষার একখানি সম্পূর্ণ ভাষাতত্ত্বমূলক ইতিহাস লিখিয়াছে, তাহা আমাদের সকলেরই গ্রহণযোগ্য। আমরা পুরাণ পদ্ধতিতে মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এ নূতন পথ দেখাইয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে, এই ছোট ঘরোয়া মিলনে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।' আমি এই অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে অভিভূত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করি। আমার এই স্বল্প কাজের জন্য বাঙ্গালাদেশের আর দুইজন মনীষীর নিকট হইতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অনুরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি—তাঁহারা হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ সেইদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি এই সম্পর্কে একটি ছোট মন্তব্য Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, এইভাবে প্রাচীন কর্তৃক নবীনের আবাহন, বাঙ্গালা দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রে, একটি লক্ষণীয় ঘটনা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের অপরাপর গুণগ্রাহিতার আরও অনেক উদাহরণ আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিষদ-পরিচালনের পদ্ধতি লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু মতভেদ হইয়াছিল। কিন্তু রাখালদাসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য, তাঁহার প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলিবার ভঙ্গী অনেক সময় কটু হইত এবং তিনি স্পষ্টবক্তা ছিলেন, কিন্তু কখনও-কখনও সুযোগ পাইলে তিনি অতি সুন্দরভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারিতেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বৈমনস্য হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানিত। আশুবাবুর মৃত্যুর পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্মৃতিসভায় শাস্ত্রী মহাশয় আশুবাবুর নানা

গুণের কথা মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বলেন, ও সেই সঙ্গে এই মন্তব্য করিয়া সকলকেই প্রীত ও বিস্মিত করিয়া দেন: 'আর একটা কথা বলি, না বললেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথা। প্রচার ছিল, আমার সঙ্গে তাঁর অহি-নকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, তার একটা লক্ষণ এই—ছেলেপুলে তাঁরও হয়েছে, আমারও হয়েছে; আমার ছেলেদের নামের শেষে 'তোষ', আর তাঁর ছেলেদের নামের শেষে 'প্রসাদ'। এটা কি মনে করেন শুধু accident? তা নয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল।' (দ্রষ্টব্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ষের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।)। এমন মিষ্টি কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রাণ খুলিয়া সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

[ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম খণ্ডের ভূমিকা থেকে সংকলিত।]

সুশীলকুমার দে

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. ও শাস্ত্রী উপাধি ভূষিত হইয়া, চব্বিশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের পর যে সকল মনীষীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তরুণ বয়স্ক হরপ্রসাদের জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যবোধ ও কর্ম্মজীবন নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হইতেছেন প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ইহার পূর্ব্বে, সংস্কৃত কলেজ স্কুলে রামনারায়ণ তর্করত্ন (প্রসিদ্ধ 'নাটুকে রামনারায়ণ') রঘুবংশ পড়াইতেন; এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িবার সময় নাকি কালিদাসের এই সমগ্র কাব্যটি হরপ্রসাদের মুখস্থ হইয়া যায়। রামনারায়ণের শিক্ষা কতটা তাঁহার সাহিত্যবোধের উদ্রেক করিয়াছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু কালিদাসের রচনার প্রতি তাঁহার আজীবন গভীর অনুরাগের সূত্রপাত বোধ হয় এই সময় হইতেই। ১৮৮৩ সালে রামনারায়ণ অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহারই স্থানে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ব্যাকরণ ও সাহিত্যশাস্ত্রে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্কে না আসিলেও, তাঁহার চরিত্রের প্রভাব ও রচনার আদর্শ কলেজে পড়িবার সময় হইতেই হরপ্রসাদ পাইয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবাসে কিছুদিন আশ্রয়লাভ করিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার ও পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই অসামান্য পুরুষের নাম হরপ্রসাদ পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই শুনিয়াছিলেন; এবং "বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ"-এ এই বয়সে শ্রুত একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগরের নিঃসংকোচ সংস্কারমুক্ততার একটি বিস্ময়কর উদাহরণ দিয়াছেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত হরপ্রসাদের সংযোগ হইয়াছিল, বোধ হয়,

কলেজ পরিত্যাগের পরেই। নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল যে গবেষণা-গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, ১৮৭৮ সালে অসুস্থতার জন্য তাহা সম্পূর্ণ করিতে না পারিয়া তিনি হরপ্রসাদের সাহায্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; ইহার উল্লেখ উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় (১৮৮২) রহিয়াছে। এ সংবাদ আমরা আরও জানিতে পারি, রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ঋগ্‌বেদের বাংলা অনুবাদের ভূমিকা (১৮৮৫) হইতে। রমেশচন্দ্র সায়ণের ভাষ্য অবলম্বনে সমগ্র ঋগ্‌বেদের বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এই বৃহৎ ও দুরূহ কার্যে হরপ্রসাদ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা স্বীকার করিয়া রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, সেই সময় 'সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য' তাঁহার সুহৃদ্ ও 'সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত' হরপ্রসাদ 'সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন'।

হরপ্রসাদের বিদ্বজ্জীবনের যে অংশ পুরাতত্ত্ব চর্চায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহার উপর রাজেন্দ্রলালের প্রভাব নানা দিক দিয়া বিশেষভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই আনুকূল্যে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও পরে ১৮৯২ সালে ভাষাতত্ত্ব কমিটির সম্পাদক মনোনীত হইয়া হরপ্রসাদ তাঁহার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সোসাইটির জন্য রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও বিবরণী-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন; ১৮৯১ সালে তাঁহার দেহান্ত হইলে এই কার্যের সমগ্র পরিচালনার দায়িত্ব হরপ্রসাদ আজীবন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিরলস ও বহুদর্শী পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শুধু বাংলা দেশ নয়, উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান ও বিদ্যাকেন্দ্র পরিভ্রমণ এবং একাধিকবার নেপালের মত দুর্গম প্রদেশেও গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে বহু প্রাচীন ও অজ্ঞাত পুঁথির তিনি অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তাঁহার ও রাজেন্দ্রলালের সমবেত চেষ্টায় সোসাইটির গ্রন্থাগারে ১৪,৬৮৬ সংখ্যক পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র ৩,১৫৬ সংখ্যক পুঁথি তাঁহার পূর্বগামী রাজেন্দ্রলালের সংগৃহীত।

কিন্তু কেবল অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করিয়া হরপ্রসাদ ক্ষান্ত ছিলেন না। রাজেন্দ্রলালের আদর্শে তিনি এই বিপুল সংগ্রহের প্রত্যেক পুঁথি পরীক্ষা করিয়া বিষয়বিভাগ অনুযায়ী বিস্তৃত বিবরণী সংকলন করিয়াছেন। এই বিবরণী পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশিত; প্রত্যেক খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রমান্বয়ে

এইরূপ—১. বৌদ্ধ সাহিত্য, ২. বৈদিক, ৩. স্মৃতি, ৪. ইতিবৃত্ত ও ভূগোল, ৫. পুরাণ ও ইতিহাস, ৬. ব্যাকরণ অলংকার ও ছন্দ, ৭. কাব্য, ৮. দর্শন, ৯. তন্ত্র, ১০. জ্যোতিষ, ১১. জৈন সাহিত্য, ১২. দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য, ১৩. বৈদ্যক, ১৪-১৫ বিবিধ বিষয়। এই বিষয় নির্দ্দেশ হইতে বুঝা যাইবে, প্রাচীন কালের বৈদিক, সংস্কৃত, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগের পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বৃত্তান্ত একখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং কেবল সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত হিন্দী মৈথিলী রাজস্থানী নেপালী ও বাংলা পুঁথিও এই বিরাট সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে, যাহা দেবনাগরী শারদা (কাশ্মীরী) নেওয়ারী মৈথিলী বাংলা ওড়িয়া প্রভৃতি লিপিতে খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে বিভিন্ন শতকে অনুলিখিত। মুখ্যতঃ হরপ্রসাদ ও রাজেন্দ্রলালের চেষ্টায় সোসাইটির যে বৃহৎ সংগ্রহ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সংখ্যায় ও বিষয়-বৈচিত্র্যে, অজ্ঞাত ও দুর্লভ পুস্তকের আবিষ্কারে প্রায় অদ্বিতীয়; তাহার নিকট সমকক্ষ হইতে পারে ইণ্ডিয়া আফিস ও বার্লিনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারের ভারতীয় পুঁথির সংগ্রহ।

এই উপলক্ষ্যে রাজেন্দ্রলালের মত হরপ্রসাদকেও অনুশীলন করিতে হইয়াছিল বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন লিপির, যাহার নিদর্শন কেবল পুঁথিতে নয় প্রাচীন শিলালেখেও পাওয়া যায়। ইহা হইতে সূত্রপাত হইয়াছিল শিলালেখ-চর্চ্চায় হরপ্রসাদের আজীবন আসক্তি। কতকগুলি প্রাচীন শিলালেখের পাঠও তিনি প্রথম উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে দেশী ও বিদেশী বিদ্বৎসমাজের জন্য অভিপ্রেত তাঁহার রচনাগুলি প্রায়ই ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; সেইজন্য তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত। তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় Epigraphia Indica প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া যাইবে।

একটি জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্য্যাপ্ত; কিন্তু হরপ্রসাদ তাহা যথেষ্ট মনে করেন নাই। তিনি কেবল প্রাচ্য বিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না; এই বিদ্যার সদ্ব্যবহারেও ছিল তাঁর অসীম উৎসাহ। এই পুঁথিগুলি অবলম্বন করিয়া তিনি যে কেবল বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন বিদ্বৎসম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা নয়, রাজেন্দ্রলালের আদর্শে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকগুলি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

ইংরেজি লেখা ছাড়িয়া দিলে, বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ও গ্রন্থাকারে

অপ্রকাশিত হরপ্রসাদের বাংলা প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ১৫০। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তবে সকল প্রবন্ধের মূল্য সমান নয়। অধিকাংশ সাধারণ পাঠকের জন্য লঘুভাবে লিখিত; যেগুলি গুরুতর প্রবন্ধ তাহাতে বিবৃত অনেক মতামত পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয় নাই। তথাপি, পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহুদর্শনের পরিণত ফল এই প্রবন্ধগুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া রহিয়াছে।

সমগ্রভাবে দেখা যায়, হরপ্রসাদের প্রধান আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়ে—পরবর্তী যুগের মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানা দিক দিয়া কালিদাসের রচনাবলীর গুণগ্রাহিতা। প্রথমোক্ত বিষয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ ১৯৪৮ সালে পুস্তিকাকারে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রহিয়াছে হরপ্রসাদের বিশিষ্ট মত, 'ধর্মপূজার ব্যাপার বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধহয়।' মধ্যযুগের ধর্ম-বিকাশের ইতিহাসে এই মতের মূল্য অনেকে অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, হরপ্রসাদের প্রবন্ধগুলিই এ বিষয়ে গভীরতর আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিল।

কালিদাস সম্বন্ধে তাঁহার বহুসংখ্যক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা নয়। প্রাচীন কবির কাব্য ও নাটক পাঠ করিয়া তাঁহার রসিক চিত্ত যে আনন্দ পাইত, সেই আনন্দ তিনি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাগুলিতে তথ্য বা তত্ত্বের আড়ম্বর নাই, সহজ ভাষায় স্বচ্ছ অনুভূতির প্রকাশ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, এই প্রবন্ধগুলির নামকরণ হইতেই বুঝা যায় যে ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের আগ্রহ জাগাইয়া তোলা। শুধু তাহাই নয়, নামকরণ এবং রচনার ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে রহিয়াছে চমকদার সাংবাদিক-সুলভ (journalistic) মনোভাব ও পদ্ধতির নিদর্শন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নামের উল্লেখ করিলেই চলিবে—'শকুন্তলার মা', 'কালিদাসের মেয়ে দেখান', 'এক এক রাজার তিন তিন রাণী', 'অগ্নিমিত্রের ভাঁড়', 'বিরহে পাগল', 'শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী' ইত্যাদি। লেখা প্রাঞ্জল হইলেও প্রবন্ধগুলি স্থায়িত্ব-লাভ করে নাই প্রধানতঃ এই লঘুভাব ও লঘু পদ্ধতির জন্য। 'শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা' হিসাবে 'মেঘদূত-ব্যাখ্যা' রচিত হইয়াছিল; কিন্তু এই ব্যাখ্যার যে অশ্লীলতা-অপবাদ তাহার জন্য ইহার লঘু ভাষা ও ভঙ্গি অনেক পরিমাণে দায়ী।

হরপ্রসাদের সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে দশটি সংস্কৃত, তিনটি বাংলা ও একটি অবহট্‌ঠ ও মিশ্র মৈথিলী ভাষায় রচিত। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ও আর্যদেবের চতুঃশতিকা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে এরূপ সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ (যাহাকে editio princeps বলে) সহজসাধ্য নয়, গুণবত্তা থাকিলেও ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। হরপ্রসাদ নিজেই অন্যত্র বলিয়াছেন, 'প্রথম পথিকের ভুলভ্রান্তি অনিবার্য্য'। ইহা স্বীকার করিলেও দেখা যায়, গ্রন্থগুলি যথেষ্ট যত্ন ও সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই, এবং সেইজন্য পণ্ডিত সমাজে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত না হওয়ায় পুনরায় সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

হরপ্রসাদের এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রচনাবলী তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও রসজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। তিনি কোন বিস্তৃত বা বিশিষ্ট পুস্তক রাখিয়া যান নাই ; প্রবন্ধাবলীর স্বল্পপাত্রেই তাঁহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে। বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার তাঁহার ছিল ; কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরিবারের নিয়মনিষ্ঠ সন্তান হইলেও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। চিরাগত শিক্ষা ও পরিবেষ্টনীর মধ্যেও এই স্বতন্ত্র ও সচেতন উদারতা তিনি কোথা হইতে পাইলেন ? এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদের বহুদর্শী মননশীলতার তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সহিত যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য : 'আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হ'য়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনপ্রণালী সম্মিলিত হ'য়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।····হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল।'

একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চ্চায় রাজেন্দ্রলালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা ছিল, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যানুরাগে গতযুগের আর একটি শ্রেষ্ঠ মনীষী হরপ্রসাদের মনের উপর তরুণ বয়স হইতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের সাহিত্য-ধুরন্ধর বঙ্কিমচন্দ্র। কলেজে পঠদ্দশায় হরপ্রসাদ 'ভারত

মহিলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া হোলকার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধটি তিনি প্রথমে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু না পারিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় উহা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের জন্য গৃহীত ও প্রকাশিত (সন ১২৮২=খ্রীঃ ১৮৭৬) করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটেই কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন। এই ঘটনা হইতেই জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তরুণ সাহিত্যযশঃপ্রার্থী হরপ্রসাদের পরিচয়ের সূত্রপাত; এবং নিত্য যাতায়াত ও আলাপ আলোচনায় উভয়ের সম্পর্ক ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। ১২৮২ (=খ্রীঃ ১৮৭৬) হইতে ১২৯০ সাল (=খ্রীঃ ১৮৮৩) পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শনের স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য দুইটি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা 'বাল্মীকির জয়' (১২৮৭; পুস্তকাকারে ১২৮৮) ও 'কাঞ্চনমালা' (১২৮৯; পুস্তকাকারে খ্রীঃ ১৯১৬) বঙ্গদর্শনেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, মেঘদূত ও বিভিন্ন বিষয়ে পঁচিশটি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে 'বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' (১২৮৭) ও 'বাঙ্গালা ভাষা' (১২৮৮) শীর্ষক দুইটি রচনার এখনও যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে নারায়ণ পত্রিকায় (১৩২২, ১৩২৫) বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হরপ্রসাদ যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন এবং ১৩২৯ (=খ্রীঃ ১৯২২) সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি উন্মোচন করিবার সময়ে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন (মাসিক বসুমতী, ১৩২৯), তাহাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট শিষ্য হিসাবে তাঁহার ঋণ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন।

বাস্তবিক, হরপ্রসাদের প্রথম রচনাগুলিতে, বিশেষতঃ তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' ও 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব ও রচনাভঙ্গির প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রথম হইতেই এই ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রসাদগুণ, যাহা লক্ষ্য করিয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাধারণীতে (১৮৮১) লিখিয়াছিলেনঃ 'ইঁহার লেখা এরূপ পরিষ্কার—পরিষ্কার কেন স্বচ্ছ—যে ভাষার আবরণ আছে বলিয়াই বোধ হয় না। আর, একটি কথা সাধু বা সংস্কৃত, অন্যটি অসাধু বা প্রাকৃত—অতএব এ দুটির একত্র সংস্থান অকর্ত্তব্য, এরূপ ফলারের জাতিভেদ হরপ্রসাদে নাই।' ইহাই যে তাঁহার ভাষার পদ্ধতি ছিল, তাহা হরপ্রসাদ স্বয়ং বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। বহুবর্ষ পরে নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩২৫-২৬=খ্রীঃ ১৯১৮-১৯) 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে যে ঝর-ঝরে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেন যে কোনও

সাহিত্যিকের আদর্শ স্থানীয়। এই সহজ ভাষা ও ভঙ্গি ছিল হরপ্রসাদের নিজস্ব এবং ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।' তাঁহার কোনও প্রবন্ধ—এমন কি যেগুলি বিদ্বৎসমাজের জন্য লিখিত সেগুলিও—দুরূহ বা জটিল নয়, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলভাষায় প্রাঞ্জল, সুপাঠ্য ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য। কারণ, তিনি যাহা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন।

পণ্ডিতী ভাষা ছাড়িয়া সহজ ভাষায় বিদ্যাসাগরও লিখিয়াছিলেন; এ আদর্শ হরপ্রসাদের সম্মুখে ছিল। তবুও বিদ্যাসাগরের ভাষা অনেক পরিমাণে সংস্কৃতঘেঁষা ছিল; হরপ্রসাদের ভাষা তাহার চেয়েও লঘু, স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর। ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল কারণ, পণ্ডিতী আবহাওয়ার মধ্যেও সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস ছিলেন হরপ্রসাদের প্রিয় কবি এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁহার কাম্য আদর্শ। তাই শাস্ত্র-জিজ্ঞাসা কোনও দিন রস-পিপাসাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সহজ ঘরোয়া ভাষা বোধ হয় অজ্ঞাতে তাঁহার সাহিত্যিক মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

তরুণ বয়স হইতেই শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নয়, গবেষক হিসাবেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি হরপ্রসাদের ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। ১৮৮৬ সালে যখন তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তখন হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুদ্রিত বাংলা পুস্তক পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান। ইহার ফলে ১৮৯১ সালে—তখনও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় নাই—কম্বুলেটোলা রিডিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে তিনি এক ইংরেজি বক্তৃতা[১] প্রসঙ্গে ১১৪ জন বৈষ্ণব কবির প্রথম সন্ধান শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছিলেন। তখনকার দিনে রামগতি ন্যায়রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' অথবা ওই ধরণের দু'একখানি বাংলা সাহিত্যের অসম্পূর্ণ বিবরণ হইতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন কবির কথা জানা ছিল, প্রাচীন সাহিত্যের আর কিছু বিশেষ জানা ছিল না। এবং এরূপ মনোভাব ছিল যেন প্রাচীন সাহিত্যে জানিবার বিশেষ কিছু নাই। হরপ্রসাদের বক্তৃতা একটি নূতন জগতের সন্ধান দিল। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন: 'সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য

১. *Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education.*

ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ ; বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ; অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত ।'

যখন ছাপা বহি হইতে এত খবর পাওয়া গেল, তখন আসিল হাতের লেখা পুঁথি খোঁজার প্রয়োজন। এই সময় এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহের ভার হরপ্রসাদের উপর পড়িল। শুধু সংস্কৃত পুঁথি নয়, ১৮৯৪ সাল হইতে বাংলা পুঁথিরও অনুসন্ধান চলিল। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি বহু গ্রন্থের পুঁথি হরপ্রসাদের চেষ্টায় সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এইরূপে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হইল। দীনেশচন্দ্রও তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় হরপ্রসাদের সাহায্য ও ঋণ স্বীকার করিয়াছেন পুঁথি সংগ্রহে ও গ্রন্থরচনায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের যুগান্তকারী আবিষ্কার হইল বৌদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্যদের সাতচল্লিশটি চর্য্যাপদ (প্রকাশকাল সন ১৩২৩= খ্রীঃ ১৯১৬), যাহা শুধু বাংলা ভাষার নয়, আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। অপভ্রংশের কিছু ছাপ ও ছাঁদ থাকাতে কেহ কেহ ইহার ভাষাকে বাংলা বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অথবা বাংলা ভিন্ন অন্য কোন আধুনিক আর্য্যভাষা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এখন প্রায় নিশ্চিতভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহা প্রধানতঃ ও মূলতঃ বাংলা ভাষার আদিম রূপ।

কিন্তু কেবল গবেষক হিসাবে নয়, সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবেও বিশেষতঃ বাংলা গদ্য-লেখক হিসাবে, স্বল্প হইলেও বাংলা সাহিত্যে হরপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে,—একথা আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। হরপ্রসাদের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আমরা উপরে বলিয়াছি। তাঁহার সমালোচনা ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যরসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে তিনি কতকগুলি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, হয়ত সেইজন্য দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিবার সুযোগ পান নাই। হয়ত গবেষণা ও জ্ঞানচর্চ্চায় ক্লান্ত তাঁহার সাহিত্যিক মন ফাঁকে ফাঁকে এইরূপ সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে কল্পনার মুক্তি চাহিয়াছিল। তথাপি বাংলা সাহিত্যে এই রচনাগুলি উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহারা সাহিত্যরসজ্ঞ, তাঁহারা জানেন, আর কোন লেখা না হউক, তাঁহার 'বাল্মীকির

জয়' ও 'বেণের মেয়ে' এককালে যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহা নিরর্থক নয়।

হরপ্রসাদের কর্ম্মশক্তি ও মনস্বিতা ছিল অসাধারণ; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও জ্ঞানান্বেষণের প্রচেষ্টায় তিনি অধ্যাপকের কাজ একাগ্রচিত্তে করিবার অবসর পান নাই। সেইজন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত তিনি অনুপ্রেরিত শিষ্যগোষ্ঠী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু যাহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিল, তাহারা ছাত্রহিসাবে বা শিষ্যহিসাবে না হউক, অক্লান্ত জ্ঞানতপস্বীর আদর্শ হিসাবে তাঁহার প্রভাবের পরিধির মধ্যে সহজভাবে আসিয়াছিল।

১৮৫৩ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাঁহার দীর্ঘজীবন গত-যুগ ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে সেতুস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। একদিকে বঙ্কিম-চন্দ্রের যুগ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের যুগ, এই দুয়ের মধ্যে হরপ্রসাদ ছিলেন সংযোগ-সূত্র। হয়ত তাঁহার রচনার সঠিক মূল্য নিরূপণের সময় এখনও আসে নাই। আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক রচনা গুলিকে তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। তাঁহাদের মতে, হরপ্রসাদের লেখার স্থায়ী মূল্য বেশি নয়; রাজেন্দ্রলালের রচনার দোষ গুণ উভয়ই নাকি তাঁহার মন্ত্রশিষ্যের লেখায় বর্ত্তাইয়াছিল। জ্ঞানের অনুশীলনে অপরীক্ষ্যকারিতা পরিণামে ফলপ্রদ হয় না। অধিকতর সন্ধানের ধৈর্য্য না রাখিয়া কেবল দুএকটি আপাতচমকপ্রদ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সৌধ নির্ম্মাণ করিলে কালের পরীক্ষায় তাহার ভিত্তি আর দৃঢ়মূল থাকে না। হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এ অভিযোগ সত্য হউক বা না হউক, ক্রমবর্দ্ধনশীল অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার অনেক রচনার মূল্য হয়ত কালক্রমে অনেক পরিমাণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নিরবধি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী গবেষকের ইহাই নিয়তি।

কিন্তু এই অনিশ্চয়ের মাপকাঠিতে হরপ্রসাদের সমগ্র চেষ্টার গুণাপকর্ষণ করা উচিত হইবে না। পথিকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্যের আবিষ্কারের জন্য তাঁহার মতো জ্ঞান-তপস্বীর মর্য্যাদা কোন কালে ক্ষুণ্ণ হইবার নয়। তিনি সাধারণ পণ্ডিত বা সাধারণ অধ্যাপক ছিলেন না। পশ্চিম ভারতে যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে তেমনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্যবিদ্যার আধুনিক গবেষণার

মূল পত্তন করিয়াছিলেন। এই গবেষণার জন্য তিনি যে বহুসহস্র প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, একমাত্র তাহাই তাঁহার পাণ্ডিত্যোচিত জীবনের বিরাট ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি। পথ-নির্দ্দেশকের ভাগ্যে বিস্মৃতি কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পথ পরবর্ত্তী পথিকের জন্য চিরদিন সুগম্য হইয়া থাকিবে। তাঁহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলিয়াছিলেন : He, of all people, has been the real father of oriental research in North India,—একথা শ্রদ্ধাঞ্জলির নিরর্থক অত্যুক্তিমাত্র নয়। কিন্তু পশ্চিম ভারতে হরপ্রসাদের মত প্রাচ্য-গবেষণায় যিনি অগ্রণী ছিলেন, সেই ভাণ্ডারকরের স্মৃতি-রক্ষার কল্পে ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা-সংশোধকমণ্ডলী স্থাপিত হইয়া আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে গবেষণার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে ও তাঁহার সমস্ত রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছে। আর বাংলাদেশে হরপ্রসাদের নাম আজ তাঁর লোকান্তরগমনের আটাশ বৎসর পরে অজ্ঞাত না হউক—বিস্মৃত প্রায়। তবে বাংলা দেশের কথাই আলাদা!

২২ নভেম্বর ১৯৫৯

[সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' দ্বিতীয় সম্ভার (১৯৬০) থেকে মুদ্রিত।]

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাঙ্গালার এক সুপরিচিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে হরপ্রসাদের জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গের অনেক পণ্ডিতের গুরু বা অধ্যাপক। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় একবার প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলেন, 'বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের অধিকাংশ এই বংশের শিষ্য।' উত্তরকালে হরপ্রসাদ পূর্ব্বপুরুষগণের এই কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গের আধুনিক সংস্কৃত অধ্যাপক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের প্রায় সকলেই হরপ্রসাদের সহিত গুরুশিষ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ—কেহ-কেহ মুখ্যতঃ তাঁহারই শিষ্য, কেহ কেহ বা তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। এ বড় কম গৌরবের কথা নহে।

অধ্যাপক হিসাবে হরপ্রসাদ একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সাহিত্যের অধ্যাপনে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয় বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের রসবিচার ও সমালোচনা তিনি অতি সুন্দরভাবে করিতেন। ছাত্রদিগের সহিত আত্মীয়তা ছিল তাঁহার অসামান্য, তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন স্কুলের ছাত্রদিগের সহিতও তাঁহার পরিচয়ের অভাব ছিল না। তিনি তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। কি ছাত্র কি সাধারণ লোক সকলের সহিতই ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। যাহার সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে কোন দিনই দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অত্যন্ত রূঢ় বলিয়া মনে হইত সত্য—তবে যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভাল ছিল তাহাদিগের প্রতি তাঁহার কোমলতা ও সদ্‌ব্যবহারের অন্ত ছিল না। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য তাঁহাকে অযথা

দাম্ভিক বা অসামাজিক করিয়া তোলে নাই। তিনি সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার অননুসুলভ রসিকতা সকলকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিত। তিনি যে স্থানে কথা বলিতেন, উৎকট গাম্ভীর্য্য সে স্থানকে ভীষণ করিয়া তুলিতে পারিত না—হাসির ফোয়ারা উহাকে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তুলিত।

হরপ্রসাদ আজীবন ছাত্রের মত ছিলেন, সাংসারিক সমস্ত দুঃখকণ্ট ও অভাব-অভিযোগের মধ্যে তিনি কখনও পড়াশুনার প্রতি অবহেলা করেন নাই। বাল্যকালে অভাবের নিষ্পেষণে তিনি অতিকষ্টে লেখাপড়া করেন। এই সময়ে 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের সাহায্য তাঁহার বিশেষ উপকার করিয়াছিল। কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির পরও তাঁহার অভাব দূরীভূত হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। হেয়ার স্কুলের সাধারণ শিক্ষক হিসাবে তাঁহাকে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি ছাত্রের মত পড়াশুনা করিতে কোন দিনও ত্রুটি করেন নাই। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিয়মিত অধ্যয়নের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। ইহারই ফলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার মত অধিক পড়াশুনা খুব কম লোকেরই ছিল। তাঁহার বিপুল জ্ঞান কেবল মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অপ্রকাশিত বহু সহস্র হস্তলিখিত দুর্লভ পুঁথি দেখিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তিনি প্রথম পুঁথির কার্য্য আরম্ভ করেন। মিত্রমহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি সরকার কর্ত্তৃক পুঁথি অনুসন্ধানের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে সকল পুঁথি দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ *Notices of Sanskrit Manuscripts* নামক গ্রন্থে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের পক্ষ হইতে তিনি নেপালের দরবারের বিশাল পুঁথিশালার পরীক্ষা করেন এবং ঐ পুঁথিশালার পুঁথিগুলির বিবরণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। এইস্থানে তিনি কতকগুলি বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার পুঁথির সন্ধান পান। এখানকার পুঁথিগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকারীদিগের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমুলার মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি কতকগুলি দুর্লভ বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নেপালের মহারাজা সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর অক্সফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে প্রায় ৭০০০ সংস্কৃত পুঁথি দান করিয়াছিলেন। এইগুলির তালিকা প্রস্তুত ও দানের

ব্যবস্থা করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল—একথা ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জন স্বহস্ত লিখিত এক পত্রে স্বীকার করিয়াছিলেন।[১] ইহা ছাড়া, সরকারের পক্ষ হইতে হরপ্রসাদ বিশপস্ কলেজের পুঁথিগুলির এক বিবরণ প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোটের উপর তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তিনি যে জ্ঞান আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অমূল্য। তাহার কথঞ্চিত পরিচয় তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts*-এর ছয় খণ্ডের বিস্তৃত ভূমিকা হইতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার এই বিশাল গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে ইহার ভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবন্ধ হইত।

শাস্ত্রী মহাশয় যে কেবল পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন এমন নহে। তিনি কতকগুলি দুর্লভ প্রয়োজনীয় পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'রামচরিত' এবং 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য সাধারণকে জানাইয়া দিয়াছে। আর দ্বিতীয় খানিতে পূর্ব্বভারতের প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষায় অনেক নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এত অধিক এবং এত বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত যে তাহাদের স্বল্প পরিচয়ও একটি প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার কৃত কার্য্যের ব্যাপকতা ও বিশালতার ধারণা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত হইলে তাহা হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে।

প্রাচীন পুঁথির আলোচনা দ্বারা হরপ্রসাদ কেবল যে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান মাত্র সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ইতিহাসের কতগুলি নূতন মত খাড়া করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এই একটি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ মতবাদ এই যে—বঙ্গের তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচ জাতি বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত হইলেও তাহারা প্রকৃত হিন্দু নহে—বঙ্গে বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় তাহারা বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ প্রাধান্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিয়াছে। ডোম প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মপূজা

১. [এই গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় লর্ড কার্জনের চিঠি দ্র.]

বুদ্ধপূজার নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার এই মত *Discovery of Living Buddhism in Bengal* নামক তাঁহার প্রথম বয়সে লেখা পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের কথা তিনি তাঁহার অনেক লেখার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় সভ্যতায় বাঙ্গালীর দান সম্বন্ধে তিনি Bihar & Orissa Research Society-র পত্রিকায় বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আজ যতই অবজ্ঞাত হউন না কেন একদিন সমাজে তাঁহাদের প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাই জীবনের সায়াহ্নে হরপ্রসাদ এক এক করিয়া এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জীবনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের জীবনী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় সাহিত্য-পরিষদে রহিয়াছে।

হরপ্রসাদের কীর্ত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় হইতেছে তাঁহার বাঙ্গালা রচনাভঙ্গী। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার লেখায় 'পাণ্ডিতি' ভাব আদৌ ছিল না। তাঁহার বাঙ্গালা লেখায় একটা অনন্যসাধারণ প্রাঞ্জলতা বর্ত্তমান ছিল। ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনার তালিকা সাধারণতঃ লোকের আদৌ রুচিকর নহে। হরপ্রসাদ কিন্তু এই বিষয়টির মধ্যে একটা সজীবতা সঞ্চার করিতে পারিতেন। তাহার ফলে তাঁহার লেখা ঐতিহাসিক বিষয় উপন্যাসের মত সাধারণকে আকৃষ্ট করিত। মোটের উপর কঠিন বিষয়কে সরল ও সরস ভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার তাঁহার যে রচনা কৌশল জানা ছিল তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন না হইলেও আদর্শ স্থানীয় সন্দেহ নাই।

কালক্রমে নূতন আবিষ্কারের ফলে হরপ্রসাদের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে—তাঁহার মতবাদ ভ্রমসংকুল বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সুন্দর রচনারীতি বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে—বাঙ্গালীকে চিরআনন্দ দান করিবে। তাঁহার এই রচনাভঙ্গী তাঁহার 'বেণের মেয়ে', 'কাঞ্চনমালা' প্রভৃতি উপন্যাসে, 'বাল্মীকির জয়' প্রভৃতি গ্রন্থে, কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিদের কাব্য সমালোচনাময় প্রবন্ধ সমূহে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচিত 'বাল্মীকির জয়' এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্য রসিকগণ মুক্ত কণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদের দিকে তিনিই প্রথম সাধারণের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৌদ্ধগান ও দোঁহার আবিষ্কার ও প্রকাশের দ্বারা তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগের উপর যে আলোকসম্পাত করিয়াছেন সেজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপী সাহিত্যারাধনার আংশিক পুরস্কার-স্বরূপ হরপ্রসাদ সরকারের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় ও সি-আই-ই এই দুই উপাধি পাইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ডি-লিট উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যশাস্ত্রানুশীলন সমিতি—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি ১৯১৯ ও ১৯২০ এই দুই বৎসর সভাপতির গৌরবময় পদে তাঁহাকে বসাইয়াছিলেন। এই সমিতি কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালে তিনি আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সুদীর্ঘ সপ্তবিংশ বর্ষকাল তিনি সভাপতি ও সহকারী সভাপতি রূপে এই পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শুধু বাঙ্গালাদেশ বা ভারতবর্ষের মধ্যেই হরপ্রসাদের সম্মান ও খ্যাতি আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল সমস্ত জগদ্ব্যাপী। বিলাতের রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য তালিকায় স্থান দিয়াছিল। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাত্র ত্রিশ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালীর গৌরব প্রচার, বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যিনি জীবন-ব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন সেই পরলোকগত পণ্ডিত হরপ্রসাদের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। আমাদের মনে হয় শুধু তৈলচিত্র স্থাপনের দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইবে না। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহকে বিস্মৃতির করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাই কি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে? তাহা যদি হয়, তবে তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—এসিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক পত্রিকাদিতে বিক্ষিপ্ত তাঁহার রচনা সমূহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। আশা করি, বাঙ্গালী তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টায় যথোচিত সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রণ।]

সুকুমার সেন

হরপ্রসাদের মনীষা—পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতায়

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর আমাদের দেশে যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারততত্ত্ববিৎ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম অগ্রগণ্য। কুলক্রমাগত বিদ্যানিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঘরের সন্তান ইনি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের (All India Oriental Conference) অধিবেশনে হরপ্রসাদ মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি এইটুকু আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন: 'আমি সংস্কৃত-পণ্ডিত বংশানুক্রমে শিক্ষায় এবং বৃত্তিতে ; সংস্কৃতের সঙ্গে যা কিছুর সম্পর্ক আছে তাহার প্রতি আমার স্বভাব-সিদ্ধ প্রীতি আছে, তার মধ্যে ভারতবিদ্যাও বটে।'[১] এ পরিচয় পরিপূর্ণভাবে যথার্থ।

হরপ্রসাদ গভীরভাবে সংস্কৃত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজী বিদ্যাও তেমনি তাঁহার অধিগত হইয়াছিল। তদুপরি— সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কেহই যাহা করেন নাই—তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পালিভাষায় লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিলেন। সর্বোপরি তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রত্নবিদ্যার চর্চায় বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। এইসব দিক বিবেচনা করিলে হরপ্রসাদের মত পণ্ডিত, তখন ইংল্যান্ড ইউরোপ আমেরিকার বাহিরে ছিল না এবং এখন যদি থাকে তবে খুব কমই ছিল এবং আছে।

---

১. "I am a Sanskritist by heridity, training and profession, and I feel an instinctive love, including Indology."

অন্যান্য বড় সংস্কৃত পণ্ডিতের মত হরপ্রসাদের বিদ্যা 'অনুবাকহৃতা' ছিল না। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে ন্যায়ের ইঁদারার গভীরতায় নামায় নাই, স্মৃতির সরোবরে অবগাহন করায় নাই, বেদান্তের বেলুনে চড়ায় নাই। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের সর্বদিকেই এমন কি বেদেও সস্পৃহ অথচ খোলা দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাকে হরপ্রসাদ যে কত ভালোবাসিতেন তা তাঁহার অনেক ইংরেজী প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। বিশেষ করিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেনসে তাঁহার সভাপতি-ভাষণে। এই প্রবন্ধটি *Sanskrit Culture in Modern India* আমাদের দেশের সকল কলেজছাত্রদের অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত। প্রবন্ধটি পড়িলে নবীন শিক্ষার্থীদের চিত্ত জাতীয়-জমাট-বাঁধিবার (National Integration) দিকে অবশ্যই ঝুঁকিবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস শিক্ষার্থীরাও অনেক শিক্ষা পাইবে।

ভাষণটির শেষে হরপ্রসাদ এখনকার দিনের ভারতবিদ্যার গবেষকদের সম্বন্ধে একটি সতর্কতার উক্তি করিয়াছিলেন। সে সাবধান বাণীর পুনরুক্তি এখন আরো বেশি প্রয়োজনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সস্তা হওয়ার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সংস্কৃতবিদ্যা। এখনকার দিনে এমন বহু বহু ছাত্র সংস্কৃতে এম-এ পাশ করিতেছেন যাহাদের অনেকে বি-এ পরীক্ষাতেও সংস্কৃত পড়েন নাই। এখনকার সংস্কৃতবিদ্যা ভাষা ছাড়িয়া ভাবের—অর্থাৎ অনুবাদের—পথ ধরিয়াছে। ফলে সংস্কৃত-জ্ঞান দ্রুত লোপোন্মুখ।

হরপ্রসাদ এই কথা বলিয়াছিলেন ঃ

> 'এখন আমার অভিভাষণের সমাপ্তির মুখে আসিয়া আমার মনে হইতেছে যে এক বিষয়ে আপনাদের সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য। ঠিক বর্তমান সময়ে এমন একদল ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সংস্কৃতভাষার বিন্দু-বিসর্গ না জানিয়া সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া জাহির করিয়া থাকেন। আরো একদল লোক আছেন যাঁহারা দরিদ্র টুলো পণ্ডিতদের দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া নিজেরা প্রাচ্যবিদ্যাবাগীশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সার হারকোর্ট বাটলারের সভাপতিত্বে যে প্রাচ্যবিদ্যাবাগীশদের সমাবেশ হইয়াছিল সেই মহতী সভায় এক অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন যে পাশে টুলো পণ্ডিত না থাকিলে কেহ প্রাচ্যবিদ্যাবাগীশ হইতে পারে না। এমন প্রাচ্যবিদ্যাবাগীশতার পোষকতা পরিহর্তব্য। টুলো পণ্ডিতদের প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে

প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। তাঁহাদের বিচারবুদ্ধিতে কালনিষ্ঠ ইতিহাসবোধ জাগ্রত করাইতে হইবে।'[২]

সংস্কৃত প্রাকৃত পালি শাস্ত্রে এবং সংস্কৃতরূঢ় প্রাচ্যবিদ্যায় হরপ্রসাদের জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা কেমন ছিল তাহার কিছু নিরিখ পাওয়া যায়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী হরপ্রসাদ বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সৌধের ভিত্তি স্থাপন পর্ব উপলক্ষ্যে একটি ভাষণ (University Extension Lecture) দিয়াছিলেন। এটি *The Educative Influence of Sanskrit* নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটিও লাহোর অভিভাষণের সঙ্গে পড়িতে হইবে। ভাষণটির আরম্ভ বড় কৌতূহলোদ্দীপক :

> 'একজন অতিবিশিষ্ট ভারতীয় ভদ্রলোক বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সংস্কৃত শিখিলে চক্ষু মুদ্রিত হয়, ইংরেজী শিখিলে চক্ষু উন্মুক্ত হয়। যিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র সম্মানিত—শিক্ষাবিধায়করূপে, বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ রূপে, বদান্য-ব্যক্তিরূপে এবং সমাজ সংস্কারকরূপে। তাঁহার এই উক্তি কতটা টেকসই তাহা দেখানোই আমার এই ভাষণের উদ্দেশ্য।'[৩]

"But at the end of my address I think it to be my duty to give you a warning. At the present moment there is a large body of men who go as Sanskrit scholars without knowing a letter of Sanskrit. There are others again who tax the brains of poor Sastris and make big name as Oriental scholar. At the conference of Orientalists held under the Presidency of Sir Harcourt Butler in 1911 a very great man told the august assembly that without two Sastris at their elbows they cannot be Oriental scholars. Such Oriental scholarship should be discouraged. The Sastris should be trained for Oriental scholarship. A historical sense should be awakened in their minds."

"A very distinguished Indian gentleman during the middle of the last century gave pithily the effect of English and Sanskrit education in the following words :— 'Sanskrit education closes the eyes and English education opens them.' As the gentleman who uttered this is revered all over India as an educationist, as a scholar, as a philanthropist and as a reformer, my object would be to examine his dictum with care, to see how far he was correct."

নাম না করিলেও বুঝিতে দেরি হয় না যে এই 'Very distinguished Indian gentleman' আর কেহ নন, বিদ্যাসাগর, বিশেষ করিয়া একটু পরের উক্তি হইতে :

> '...সংস্কৃত শিক্ষাও ইংরেজী শিক্ষার মত জ্ঞানচক্ষু সম্পূর্ণভাবে উন্মীলন করিয়া দিতে পারে তাহা বুঝিলে আমার শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন বন্ধু তাঁহার কটু মন্তব্য প্রত্যাহার করিয়া লইতেন। বাংলা ভাষার সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার কৌশল ও ব্যবস্থা তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল, তাই এখন সংস্কৃত বিদ্যা ও বিনয় অধিগত করা তাঁহার কালের তুলনায় অনেক সহজ।'[৪]

এখন প্রশ্ন, কেন এই ইউনিভার্সিটি এক্‌স্‌টেনশন বক্তৃতায় হরপ্রসাদ বিদ্যাসাগরের নাম করিলেন না ? এ প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে জাগিয়াছে তাহা বলি। বক্তৃতাটিতে হরপ্রসাদ সংস্কৃত বিদ্যার বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক গ্রন্থ পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিক্ষা বিজ্ঞান চিকিৎসা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে যে সংস্কৃত বিদ্যা ইংরেজী বিদ্যার সমান তাহা এই বক্তৃতায় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস আছে। তবুও মনেপ্রাণে হরপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না যে আধুনিক বিদ্যার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ইংরেজীর সমকক্ষ। কিন্তু না বলিলেও উপায় নাই। মদনমোহন মালব্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার, মালব্যজী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দুব্রাহ্মণ ও সংস্কৃতশাস্ত্র ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। অতএব হরপ্রসাদ আর করিবেন কী। তবে তাঁহার মনে নিশ্চয়ই দ্বিধা ছিল, এবং দ্বিধা ছিল বলিয়াই সেই পুণ্যশ্লোক মহাজনের নাম উল্লেখ করেন নাই। (বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করিয়াছিলেন সেই কারণে—আমার মনে হয়—মদন মোহন মালব্য বিদ্যাসাগরকে তেমন শ্রদ্ধা করিতেন না।)

বেদের আলোচনায় হরপ্রসাদের বরাবর আগ্রহ ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে বেশি লেখেন নাই। শুধু দুইটি প্রবন্ধ পাইয়াছি। একটি বাংলায়—'বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা'—১২৮৪ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত, অপরটি—*The*

৪. "...my revered old friend would have retracted his caustic remark seeing that Sanskrit education also can open the eyes as fully as English education. Thanks to his labour in devising means for teaching Sanskrit through the medium of Vernaculars, it is now easier to acquire Sanskrit culture than it was in his days".

Rg-veda in the making—এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (৪ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত। বাংলা প্রবন্ধটি রমানাথ সরস্বতীর 'বেদ প্রকাশিকা' গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে বিরচিত। সাধারণ পাঠকের কাছে অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় বেদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটির মূল্য এখনও হ্রাস পায় নাই। ইংরেজী প্রবন্ধটি ছোট। ইহাতে বেদের বিভিন্ন শাখার পরিচয় আছে।

অল্প বয়সেই হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের কাছেই তিনি ভারততত্ত্বে দীক্ষিত হন। এই সূত্রে হরপ্রসাদ বৌদ্ধশাস্ত্র এবং পালির অনুশীলনে উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং পরে মহাযান শাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া তান্ত্রিক মহাযান শাস্ত্রে অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিশাল কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষার প্রায় সবগুলি সোপান তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং সে সোপানাবলীর অধিকাংশেই তিনি অক্ষয় পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

পালি ও প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে হরপ্রসাদ বেশি কিছু লেখেন নাই। তবে দুই একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সংঘটিত হয় সিলভ্যাঁ লেভির মূল-সভাপতিত্বে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে। এই অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাখায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে প্রস্তুত তাঁহার অভিভাষণটি *Proceeding and Transactions of the Second Oriental Conference*-এ মুদ্রিত, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতীয় আর্যভাষার ও সাহিত্যের বিবর্তনের সমীক্ষা সহজ ও সরলভাবে (—ইংরেজী হোক বাংলা হোক শক্ত কথা সহজ করিয়া প্রকাশ করিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের দক্ষতা অসাধারণ ছিল—) অল্প কথায় দেওয়া আছে।

পালি ও সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার বিচার করিয়া হরপ্রসাদ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন The Buddhist Research Society-র পত্রিকায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রবন্ধের প্রথম বাক্য হইতেছে: Bengali is a mixed language ('বাংলা একটি মিশ্র ভাষা')। আক্ষরিক অর্থে এই উক্তি শব্দবিদ্যার মতে গ্রহণীয় নহে। হরপ্রসাদ এখানে Bengali বলিতে Bengali Vocabulary (অর্থাৎ বাংলা শব্দকোষ) বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে কোন গোলমাল নাই। এই প্রবন্ধে অনেক ভালো কথা আছে সন্দেহ নাই, তবে একটি মূলকথা এখনকার শব্দবিদ্যার দৃষ্টিতে আপত্তিকর। হরপ্রসাদ পালি ও প্রাকৃতের মধ্যে যে আত্যন্তিক পার্থক্য ধরিয়া লইয়াছেন তাহা ঠিক

নয়। পালি ও প্রাকৃতের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য নাই, আছে পর্যায়গত পার্থক্য। পালি প্রাকৃতের দুই এক পুরুষ অগ্রজন্মা। 'বাড়ুজ্যে' পদবীর শেষে তিনি পালি 'উপজ্ঝায়' ধরিয়াছেন, প্রাকৃত 'উবজ্ঝাও' নয়। এ যুক্তি ছেলেমানুষির মত। পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার সরাসরি সংযোগ ছিল এ ভাবনাও এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বাঙালীর কাছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখ্য পরিচয় তাহার সংস্কৃত প্রাকৃত পালি প্রভৃতি ভাষায় প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণার, বিবিধ ধর্মভাবনার বিশ্লেষণে এবং ভারতবিদ্যার অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার জন্য নহে। সে পরিচয় বাংলা ভাষায় সুদক্ষ লেখক এবং সেভাষার সুনিপুণ পর্যবেক্ষক রূপে। তিনি গভীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কিন্তু বাংলা লিখিতেন সত্যসত্যই জলের মত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনেই তাঁহার হাতেখড়ি হইতে অমর-ভ্রমর পর্যন্ত হইয়াছিল। তবুও বলিব,—বঙ্কিমভক্তদের ভয়ে ভয়ে,—মোটামুটিভাবে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষাও ভালো—অর্থাৎ সহজ সরল সতেজ ও তীক্ষ্ণ—বাংলা লিখিতেন।

বাংলা ভাষার বিষয়ে তিনি যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলির মূল্য এখনও বাঙালী লেখকদের বোধগম্য হইতেছে না। কটি ছাড়া সব প্রবন্ধই শব্দ প্রয়োগ অথবা ইডিয়ম লইয়া আলোচনা। দুইটি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল, এই তিনটিই সর্বাধিক মূল্যবান।

প্রথম বাহির হয় 'নূতন কথা গড়া' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)। ইংরেজী শব্দের গোটাগুটি ব্যবহারে অথবা সংস্কৃত অনুবাদ দিলে কিংবা চলিত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলে যে আপত্তি উঠিতে বা অসুবিধা ঘটিতে পারে সে বিষয়ে ভালো উদাহরণ দিয়া সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হরপ্রসাদের নিম্নলিখিত মন্তব্য যে আজ প্রায় একশ বছর পরেও সমান সত্য—এবং দীর্ঘকালও তাহাই থাকিবে—সে বিষয়ে পরিভাষা-নির্মাণের কাজে লিপ্ত আমি ভুক্তভোগী।

> '....বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ঐ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে, কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নূতন শব্দ আমদানী করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, চলিত কথা দিয়া যেরূপে হউক ভাবপ্রকাশ হইলেই যথেষ্ট হইল। ইংরেজীতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত হয়, বাঙ্গালায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি নূতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর

হইতে শব্দ আনয়ন উচিত নহে। আমরা এ তিনটীর কোন মতেরই সম্পূর্ণ পোষকতা করিতে পারি না। কখন কখন নূতন শব্দ গঠনের প্রয়োজন হয়; কখন ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়নের প্রয়োজন হয়; কখন অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত করিতে গেলে, লেখার বাঁধনী থাকে না, এবং ভাবটিও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না।'

একটি ভালো উদাহরণ দিয়া হরপ্রসাদ তাঁহার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন।—'উকিলীতে আজকাল বড়ই competition'। ইংরেজী competition শব্দের কোন প্রতিশব্দ নাই এবং শব্দটির ভাব বাংলা ভাষায় সহজে ব্যক্ত করা যায় না। তাই হরপ্রসাদ বলিতেছেন, 'আমরা কি করিব? এ শব্দটী কি বাঙ্গালা করিয়া লইব, না উহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ধাতুপাঠ খুঁজিয়া "সংঘর্ষ" শব্দ গড়িয়া লইব? না বলিব—উকিলীতে আজকাল অনেক লোক হইয়াছে, অতএব উহাতে পসার করা বড়ই শক্ত।'

তাহার পর হরপ্রসাদ তিনটি উপায়ের দোষগুণ বিচার করিয়াছেন। 'সংঘর্ষ' শব্দটি হয়ত একেবারেই নূতন; যদি সংস্কৃতে থাকে, এরূপ অর্থে কখন ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সংঘর্ষ বলিলে, যিনি শব্দটী গড়িবেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু উহার এক গুণ আছে। উহা সংস্কৃতমূলক; সুতরাং অনেক লোক উহা ইংরেজী কথা অপেক্ষা ভাল বলিবেন, আর উহা যদি চলিয়া যায়, তবে ইংরেজের কাছে উহার জন্য দেন্দার থাকিতে হইবে না। কিন্তু একথা চলিবে কি?' 'যাহারা ইংরেজী জানে না, competition কথাটি তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু সংঘর্ষ বলিলে যত লোক বুঝিবে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোক বুঝিতে পারিবে।' 'উকিলীতে অনেক লোক হইয়াছে, অতএব পসার করা শক্ত বলিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু অল্প কথায় বলা না হওয়ায় কেমন একটু ভাসা-ভাসা লাগে। হয়ত যে প্রণালীতে রচনা হইতেছে, অত কথায় বলিলে সে প্রণালীর সহিত সহচার বিরুদ্ধ হইয়া থাকে।'

তাহার পর কয়েকটি উদাহরণ দিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে নবনির্মিত শব্দের তুলনায় চলিত ভাষায় এবং 'ইতর ভাষায়' প্রচলিত কথা অনেক বেশি সুন্দর। চারটি উদাহরণ দিয়াছেন হরপ্রসাদ। যেমন, 'কাচ ভঙ্গপ্রবণ' এই উদাহরণে ভঙ্গুর অর্থে ভঙ্গপ্রবণ যথার্থ প্রতিশব্দ নহে। যথার্থ প্রতিশব্দ হইল 'ইতর ভাষার' 'ঠুনকো'। আর একটি উদাহরণ ইংরেজী observatory শব্দের তর্জমা করা হইল 'পর্যবেক্ষণিকা'। 'কেহ বুঝিল না, অথচ কেতাবে কেতাবে চলিয়া গেল!' অথচ হাতের কাছে রহিয়াছে হিন্দী 'মানমন্দির'।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে 'বাঙ্গালা ভাষা') বাহির হইয়াছিল ১২৮৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। ইহাতে তিনি শব্দ চয়ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন লেখকদের প্রণিধানের জন্য। এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ এমন কিছু সত্য কথা লিখিয়াছেন যাহা আর কেহ উচ্চারণ করিতে পারেন নাই :

> 'কথাটী এই যে, যাঁহারা এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজী পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়াল-ভাঙ্গা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষায় কি আছে না আছে, তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।'

হরপ্রসাদ যেভাবে লেখকদের নিন্দা করিয়াছেন তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রও বাদ পড়েন বলিয়া মনে হয় না। আমার এই কথায় অনেকে আপত্তি তুলিতে পারেন যে প্রবন্ধগুলি যেহেতু বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল সেইহেতু বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদের উক্তি সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে আমি বলি যে প্রবন্ধগুলি ১২৮৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বঙ্গদর্শনের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র নন।

যে কোন কারণে হোক বঙ্কিমচন্দ্র যে হরপ্রসাদের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন ছিলেন না তাহার অবান্তর প্রমাণ কিছু আছে। 'কাঞ্চনমালা' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হরপ্রসাদ রচনা করিয়াছিলেন। বইটি প্রকাশিত হইয়াছিল বঙ্গদর্শনে ১২৯০ সালে। তখনও সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় কাঞ্চনমালা প্রকাশিত হইলে পর অনেকে উপন্যাসটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শোনা যায় তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং হরপ্রসাদকে উপন্যাস লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি সত্য কি না জানিবার উপায় নাই। ১৩২২ সালে কাঞ্চনমালা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের আট আনা সিরিজে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণের ভূমিকায় হরপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন, '১২৯০ সালে যখন ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন কাঞ্চনমালা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর নানা কারণে আমি অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালা লিখি নাই ;...।' নানা কারণের মধ্যে একটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাগ হইতেও পারে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় রামগতি ন্যায়রত্ন ও রমেশচন্দ্র দত্তের কৃতিত্ব অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার বিশিষ্টতা ছিল নূতন তথ্যের অনুসন্ধিৎসায় এবং ব্যাপক সন্ধানের প্রচেষ্টায়। রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের অপেক্ষা মূল্যবান রচনার মূল্য নির্ণয়েই নিবিষ্ট ছিলেন। হরপ্রসাদের দুইটি প্রবন্ধ, একটি বাংলায় আর একটি ইংরেজীতে লেখা বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করিয়াছিল। বাংলা প্রবন্ধটিতে সমসাময়িক অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে, ইংরেজী প্রবন্ধটিতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বেকার ভাষা ও সাহিত্যের কথা বলা হইয়াছে।

বাংলা প্রবন্ধটির নাম 'বাঙ্গালা সাহিত্য—বর্ত্তমান শতাব্দীর'। ১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র তারিখে সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল। (অল্পস্বল্প পরিবর্জনের সহিত (? প্রবন্ধটি ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ওই ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গদর্শন নিশ্চয়ই ১২৮৮ সালের আগে বাহির হয় নাই।)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের শ্যেনদৃষ্ট সার্ভে হিসাবে চমৎকার রচনা এই অভিভাষণটি।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন, 'তিনি যেরূপ নিজদেশের জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এত বোধহয় আর কেহই করে নাই। তাঁহার বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যত উন্নতি সাধন করিয়াছে, এত বোধহয় আর কেহ করে নাই।'

ভারতী পত্রিকার প্রশংসায় হরপ্রসাদ বলিতেছেন, 'এখানি জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুর পরিবার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার রুচি মার্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্য্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখনো বাকী পড়ে না। সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর বাকী পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকী নাই।'

ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যকর্মের প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ তাঁহার অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন:

> 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চারি বৎসর ভারতীতে যেসকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলী তুলনারহিত; তাঁহার য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র দেশভ্রমণ বিষয়ে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তাঁহার সকল প্রবন্ধগুলিই সুপাঠ্য। তিনি অল্প বয়সে যেরূপ মানসিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে পরে তাহার দ্বারা যে সাহিত্যের স্থায়ী উপকার হইবে তদ্বিষয়ে

সন্দেহ নাই। তাঁহার বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় (১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই মোহিত হইয়াছিলাম।'

এই অংশটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধে এবং তাহা হইতে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকায় নাই, আছে সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী সংগ্রহে (১২৯৩)। প্রকাশকের মন্তব্য হইতে মনে হয়, এই মন্তব্যগুলি যাহা বঙ্গদর্শনে পাওয়া যায় না, তাহা এখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সন্নিবেশ যে হরপ্রসাদেরই তাহাতে সন্দেহ নাই, বিশেষ করিয়া বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয়ের উল্লেখ হইতে। আমার সন্দেহ হইতেছে এইসব মন্তব্য মূল অভিভাষণে (৩০ চৈত্র ১২৮৭ সালে প্রদত্ত) ছিল, বঙ্গদর্শনে ছাপা হইবার সময় বাদ গিয়াছে, সুতরাং পুনর্মুদ্রণেও বাদ পড়িয়াছে। মন্তব্যগুলি যে ১২৯৩ সালে বা তার কিছু আগে সন্নিবিষ্ট হয় নাই তাহার প্রমাণ হরপ্রসাদেরই উক্তি—'এই চারি বৎসর ভারতীতে ···'। ভারতী প্রকাশ শুরু হয় ১২৮৪ সালে, ১২৮৭ সালে তাহার বয়স চার বৎসর। সুতরাং উক্তিটি অভিভাষণের মধ্যেই ছিল বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল, তাহা হইলে মন্তব্যগুলি বাদ গেল কেন? এখনই কি বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ও ভারতী গোষ্ঠীর প্রতি (স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রশংসাও বাদ গিয়াছিল) অপ্রসন্ন হইতে শুরু করিয়াছিলেন? এবং এই সূত্রেই কি হরপ্রসাদের উপর তাঁহার বিরক্তি আসিয়াছিল? ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গদর্শন ঠিক কোন সালে কোন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলে হয়ত এই সন্দেহের কিছু মীমাংসা হইতে পারে। (মনে করুন ভারতী পত্রিকার প্রশংসায় হরপ্রসাদের উক্তি—'সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর বাকী পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকী নাই'। সুতরাং হয়ত ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গদর্শন ১২৮৮ সালের শেষে অথবা ১২৮৯ সালের প্রথমে কোন সময়ে বাহির হইয়াছিল।)

ইংরেজী প্রবন্ধটি কম্বুলেটোলা লিটরেরি ক্লাবের বার্ষিক অভিভাষণ রূপে রচিত ও পঠিত এবং *Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education* নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮৯১)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় গবেষণা কার্যের প্রয়োগ এই প্রথম। এই বক্তৃতা-প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনায় প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দিয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাংলা অভিভাষণ এবং কম্বুলেটোলা লিটরেরি ক্লাবের ইংরেজী অভিভাষণ এক সঙ্গে করিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খসড়া বলা যায়।

প্রবন্ধটি ভালো করিয়া পড়িতে সুযোগ আগে আমি পাই নাই। এখন এই গ্রন্থের উদ্যোক্তাদের অনুগ্রহে সে সুযোগ পাইয়াছি এবং ইহা হইতে কিছু ফসল আহরণ করিতেও পারিয়াছি।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সকলে কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াকার কবি বলিয়া নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি টানিয়া টুনিয়া তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদের আগে তুলিতে পারি নাই। আমার এই প্রচেষ্টাও দ্বিধাগ্রস্ত। আমার দৃঢ় ধারণা কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের আগে নয়। কম্বুলেটোলা লিটরেরি ক্লাবের অভিভাষণে আমার ধারণার সমর্থন পাইলাম। হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন:

> 'The age of Krittivasa is not known but he is said to have flourished one hundred years after the death of Chaitanya.' (পৃষ্ঠা ১৩)

ইহা হইতে আরো এক সমস্যায় আলোকপাত পাইলাম। হারাধন দত্তের আবিষ্কৃত বলিয়া প্রচারিত পাতড়া বা পুথি, যাহাতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহার উৎস এখন অনুমান করিতে পারিতেছি। নগেন্দ্রনাথ বসু ব্রাহ্মণদের কুলজি ঘাটাঘাটি করিতেছিলেন। সেই কাজে তাঁহার আবশ্যক ছিল ফুলের মুখুটি কোন কোন ব্রাহ্মণকে প্রাচীনত্বে, সুতরাং অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রয়োজনেই কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী পাতড়ার বা পুথির 'আবিষ্কার' ঘটে। হরপ্রসাদ বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে, আর এই পাতড়া বা পুথি হইতে অংশ উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ অল্প কয়েক বছরের মধ্যে (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়)। সমগ্র রচনাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন দীনেশচন্দ্র ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ এমন অনেক রচনার ও রচয়িতার নাম ও পরিচয়—অল্পস্বল্প—দিয়াছেন যাহা পূর্বে জানা ছিল না। সর্বশেষে দিয়াছেন বৈষ্ণব পদকর্তাদের তালিকা এবং তাঁহাদের রচিত পদের সংখ্যা। একশত চৌদ্দ জন পদকর্তার নাম করিয়াছেন তিনি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়াছিল বিভিন্ন দিকে, সেদিকের কোন কোনটিকে বিভিন্নমুখীও বলা যায়। তিনি ভাষার বিশ্লেষণেও অনুরাগী ছিলেন এবং সে কাজে নিপুণতাও দেখাইয়াছিলেন। আবার সাহিত্যের রসবিচারে এবং রসপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিতেও তাঁহার সমান নিষ্ঠা ছিল এবং তাহাতেও সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য আধুনিক বিচার দৃষ্টির গোচরে আনেন প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁহার পরেই হরপ্রসাদের নাম করিতে হয়। এ বিষয়ে তিনি দুটি ছোট বই লিখিয়াছিলেন এবং অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন জীবনের প্রায় শেষ কাল পর্যন্ত।

প্রথম বই 'বাল্মীকির জয়' বাহির হইয়াছিল ১২৮৮ সালে। তাহার আগে ইহার কিছু কিছু অংশ বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ সালের পৌষ মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। (সেকথা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা—১২৮৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত—হইতে জানিতে পারি। আরও জানিতে পারি যে রচনাটির সমস্ত অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো লাগে নাই। বইটির শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভার যে কিঞ্চিৎ ছাপ পড়িয়াছে তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন।) বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাকে ভূমিকা করিয়া বইটি পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বইটির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, কিছু কিছু দোষের কথাও বলিয়াছেন। বাল্মীকির জয় সমাদৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পুস্তিকা 'মেঘদূতের ব্যাখ্যা' (১৩০৯ সাল) অন্য রসের বই। ইহার ভাষাও বিষয়ের অনুগত, এবং তরল ও লঘু। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সুলভ সাহিত্যরুচি-ঔদার্য হরপ্রসাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সব ছাপাইতে পারেন নাই এবং যাহা ছাপাইয়াছিলেন তাহাও সম্পূর্ণভাবে পুনর্মুদ্রিত করা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, হরপ্রসাদের আলোচনা তাহার উল্টা পিঠের। একটি যদি কালীপক্ষের হয় (রবীন্দ্রনাথ), অপরটি হইবে বিদ্যাপক্ষের (হরপ্রসাদ)।

বঙ্গদর্শনের ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় হরপ্রসাদের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধটির উপলক্ষ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মেঘদূতের বাংলা পদ্যানুবাদের সমালোচনা। অনুবাদটি সদ্যঃ বাহির হইয়াছিল (১৮৮২)। মেঘদূতের কবিত্বরসে হরপ্রসাদ যে কতটা মুগ্ধ ছিলেন তাহার ভালো পরিচয় রহিয়াছে এই প্রবন্ধে।

কালিদাসের কাব্য ও তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র লইয়া হরপ্রসাদ যে অনবদ্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন 'নারায়ণ' পত্রিকায় (১৩২২-২৪ ; একটিমাত্র বঙ্গদর্শনে, কার্তিক ও পৌষ ১২৯০) সেগুলির মূল্য অসামান্য। কালিদাসের কাব্য-নাটক না পড়াইয়া যদি এই প্রবন্ধগুলি কলেজে পাঠ্য হয় তবে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগীর সংখ্যা দিন দিন না কমিয়া দিন দিন বাড়িবে। হয়ত তাহারা

সংস্কৃতে এম-এ পড়িতে যাইত না, তবে আনন্দের পাথেয় পাইত এবং তথা-কথিত national integration সহজসাধ্য হইত।

হরপ্রসাদের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা যে কম ছিল না তাহার পরিচয় রহিয়াছে 'কাঞ্চনমালা'য় ও 'বেণের মেয়ে'তে। দুইটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। সুতরাং বলিতে গেলে গল্প-উপন্যাস লিখিতে গিয়া হরপ্রসাদ স্বধর্মচ্যুত হন নাই। কাঞ্চনমালার কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী, বেণের মেয়ের কাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী।

কাঞ্চনমালার কথা আগেই বলিয়াছি। বঙ্গদর্শনে বাহির হইবার (১২৯০) দীর্ঘকাল পরে পুস্তিকা আকারে বাহির হইয়াছিল (১৩২২)। বিষয় ফাঁদা হইয়াছিল অশোকের কালে। নায়ক অশোকের পুত্র কুণাল যিনি ভিক্ষু হইয়া সিংহলে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নায়িকা কুণালের পত্নী, কাঞ্চনমালা, লেখকের সৃষ্টি। রোমাণ্টিক গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের ধারায় রচিত। ভাষারীতি উত্তম। সাধারণ পাঠক বইটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা মনে করিয়া খুব অন্যায় করে নাই। হরপ্রসাদের প্রথম রচনা 'ভারতমহিলা' (সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায় লেখা, বঙ্গদর্শনে ১২৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত, পুস্তক আকারে ১২৮৭ সালে)—এই দীর্ঘ প্রবন্ধটির যেন সহযোগী রচনা এই কাঞ্চনমালা।

বেণের মেয়ে প্রথমে বাহির হইয়াছিল ধারাবাহিকভাবে 'নারায়ণ' পত্রিকায়, তাহার পরেই পুস্তক আকারে (১৩২৬)। কাঞ্চনমালায় চারিদিকে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের দিনের ছবি আঁকা হইয়াছে, বেণের মেয়েতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের ছবি। বইটি পরিপূর্ণ উপন্যাস, অথবা ঐতিহাসিক-চিত্র। ইহার স্টাইলে হরপ্রসাদের নিজস্ব রচনারীতির সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে লেখকের স্বকল্পিত এবং সে নিজস্ব কল্পনাও নির্ভর করিয়াছে তাঁহারই আবিষ্কৃত বস্তু ও ঘটনার উপর। বইটিকে উপন্যাস বলিয়া নিতে পারি, ইতিহাসের ছায়াচিত্র বলিয়াও লইতে পারি। বাংলাদেশের তথা পূর্ব-ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসের বেশ খানিকটা খণ্ড—পালদের আমল হইতে সেনদের আমল পর্যন্ত—হরপ্রসাদের আবিষ্কারের—সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত,' সরহ ও কৃষ্ণের 'দোহাকোষ,' 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ও 'ডাকার্ণব' ও অনেক 'সাধনমালা' ইত্যাদি পুথির—সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। বেণের মেয়ে এই ইতিহাসেরই একটুকরা illustration। তবে সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাহারো কাহারো নিকট উপাদেয় লাগিলেও অধিকাংশেরই দুষ্পাঠ্য ঠেকিবে।

ভারতীয় বিদ্যার অনুসন্ধিৎসু অধ্যেতা রূপে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতিষ্ঠা

চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে কতকগুলি মূলবান বই ও পুঁথির আবিষ্কর্তা হিসাবে এবং দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকিবে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা রূপে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি, বিশেষ করিয়া অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাষণগুলির এই হিসাবে অপরিসীম মূল্য। এইগুলির মধ্যে অল্প-স্বল্প ভুল-চুক থাকিতে পারে। সে থাকা স্বাভাবিক। সকল মৌলিক ভাবনাশীল লেখকের থাকে। থাকে না নকলকারীর। শাস্ত্রী মহাশয়কে যে যাহাই বলুক কোন সুবুদ্ধিই তাঁহাকে নকলনবীশ বলিবে না।

দীনেশচন্দ্র সরকার

প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরপ্রসাদের সুদীর্ঘ জীবনের সমাপ্তির দিকে আমি মফঃস্বল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমিও ঐ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. এ. পাশ করি।

হরপ্রসাদ তাঁহার সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্‌গণের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের লাহোর অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। এই নির্বাচনে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্যক্‌ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি অনেককে প্রাচ্য-বিদ্যা শিক্ষায় দীক্ষিত করেন; সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

স্কুলের ছাত্র হিসাবেই শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা ও ক্রিয়াকলাপ আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রথম দিকে তাঁহার রচিত একখানি স্কুল-পাঠ্য বাঙলা ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখিয়াছিলাম। ক্রমে শুনিলাম, তিনি কিছুকাল কতিপয় সহায়ক পণ্ডিতের সহিত কাঠমণ্ডুতে থাকিয়া নেপাল মহারাজের দরবার গ্রন্থশালার অগণিত মূল্যবান্‌ গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইখানি বহুমূল্য পুস্তক তিনি সঙ্গে আনেন এবং পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। এই দুইখানি গ্রন্থ—১. চর্যাগীতি, যাহাকে অনেকে বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া মনে করিয়াছেন; এবং ২. সন্ধ্যাকর

নন্দীর ঐতিহাসিক দ্ব্যর্থকাব্য 'রামচরিত', যাহাতে রামায়ণের কাহিনী এবং বাঙলার রাজা রামপাল ও তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পালবংশীয় রাজগণের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কাব্যের প্রতিটি শ্লোক দুইভাবে ব্যাখ্যা করিবার মত করিয়া রচিত।

পরবর্তীকালে কেহ কেহ এই গ্রন্থদ্বয়ের শাস্ত্রী মহাশয়কৃত পাঠ ও ব্যাখ্যার কিছু কিছু ত্রুটি ধরিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে হরপ্রসাদের কৃতিত্ব হ্রাস পায় না। চর্যাগীতির ভাষা ও বিষয়বস্তু দুরূহ। তিনি যে ইহার মূল্য বুঝিয়াছিলেন এবং অশেষ শ্রমসহকারে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। আবার 'রামচরিত'-এর মত কঠিন কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই। ইহার প্রথম সম্পাদনা হরপ্রসাদের অসামান্য কৃতিত্ব। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ দুখানি অনবদ্য হইলে অবশ্যই আমাদের আনন্দের বিষয় হইত। কারণ পণ্ডিত সমাজের জন্য এ দুটিই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমাদের দুটি কথা মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ কোনো কোনো ভুলের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের সহকারীরা দায়ী। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তক দুটির ন্যায় তাম্রশাসন ও শিলালেখ সম্পাদনাতেও তাঁহার কোনো কাজই সব দিক হইতে সুন্দর হয় নাই। হরপ্রসাদ স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নিকট প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; এই মিত্র মহাশয়ের রচনাতেও অনুরূপ ত্রুটি দেখা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে এই সকল রচনায় তাঁহারা সহকারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাহায্যকারীর কোনো পাঠ বা ব্যাখ্যা সর্বত্র কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া গৃহীত বা বর্জিত হয় নাই। এই সম্পর্কে যে কেহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের পাঠ ও ব্যাখ্যা বিষয়ে হরপ্রসাদের প্রবন্ধের (*Indian Historical Quarterly*, Vol. II, 1926, pp. 81 ff.) সহিত প্রথমে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের উৎকৃষ্ট আলোচনা (*Inscriptions of Bengal*, Vol.III,1929,pp. 140 ff., 177 ff.) এবং পরে বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ (*J.A.S.B.*, Vol. XX, 1954, pp. 201 ff.) তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন। আসল কথা এই যে, কাব্য-রীতিতে রচিত বৃহৎ কোনো শিলালেখ বা তাম্রশাসন সম্পাদনার জন্য সংস্কৃত ভাষায় সুগভীর জ্ঞান অত্যাবশ্যক; কিন্তু অতি গভীর ভাষাজ্ঞানও সম্পাদনার কাজের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আরও চাই সত্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং প্রত্নলিপি-বিদ্যা, লেখবিদ্যা ও ইতিহাসে গভীর পাণ্ডিত্য। যাহা হউক, যে দুটি কথা বলিতে উদ্যোগী হইয়াছিলাম সে বিষয়ে কিছু বলা যাক।

কিছুকাল পূর্বে আমি জীবদেব নামক উড়িয়া লেখকের 'ভক্তিভাগবত' সংজ্ঞক সংস্কৃত গ্রন্থের কবি-প্রশস্তি অংশের উপর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধটি আমার *'Studies in the Yugapurana and Other Texts'* (pp. 135 ff.) গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে। উল্লিখিত অংশটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের *Report on the Search for Sanskrit Manuscripts*, 1901-1906 গ্রন্থে (pp. 14-16) উহার অধিকাংশ শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদ আছে। অবশ্য মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত না করিয়া শুধু অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। যাহা হউক, এই অনুবাদ পড়িয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে এ কাজ হরপ্রসাদের হইতে পারে না। ধরুন ২৭শ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে আছে—

নদ্যাং নিবাপসলিলেন স বিষ্ণুপদ্যাং
প্রাতর্পয়ৎ পৃথুযশাঃ পিতরং ত্রিপক্ষে ॥

শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদে আছে, 'at the end of the sixth week of his father's death, he (i.e. King Prataparudra of Orissa) offered handfuls of Ganges water for the benefit of his father'— এই অনুবাদ স্পষ্টতঃই কোনো অর্বাচীনের। ইহা কখনই হরপ্রসাদের ন্যায় সুপণ্ডিতের অনুবাদ হইতে পারে না।

উপরে আমরা সংক্ষেপে শিলালেখ, তাম্রশাসনাদি সম্পাদনা ব্যাপারে হরপ্রসাদের যে ত্রুটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছি, ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত তৎকালীন অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও উহা দেখা গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র দেশীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় হরপ্রসাদ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক শিলালেখ ও তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও এই জাতীয় কাজ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। দেবপালের সময়কালীন ঘোষরাবা গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখটির সম্বন্ধে ভাণ্ডারকরের প্রবন্ধের (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XXI, Part I, 1872, pp. 271 ff.) সহিত জার্মান-পণ্ডিত কীলহর্ণের প্রবন্ধ (*Indian Antiquary*, Vol. XVII, 1888, pp. 309 ff.) মিলাইয়া পড়িলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনায় ঐতিহাসিক সূক্ষ্মদৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়। *Epigraphia Indica* (Vol. XII, 1913-1914, pp. 320 ff.) পত্রিকায় তিনি মন্দসোরে প্রাপ্ত নরবর্মার একখানি শিলালেখ সম্পাদনা করিয়াছিলেন। এই রাজা নরবর্মা জয়বর্মার পৌত্র এবং সিংহবর্মার পুত্র ছিলেন। মন্দসোর (প্রাচীন দশপুর) মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে

রাজস্থানের প্রান্তে অবস্থিত। ঐ একই পত্রিকায় (Vol. XIII, 1915-1916, pp. 133) শাস্ত্রী মহাশয় অপর যে একখানি শিলালেখ সম্পাদনা করিয়াছিলেন উহা বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার অভিলেখ। এই চন্দ্রবর্মাকে পুষ্করণাধিপতি বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর এই দুইখানি অভিলেখের ভিত্তিতে শাস্ত্রী মহাশয় এক অদ্ভুত ইতিহাস দাঁড় করাইলেন। রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলস্থিত আজমেরের নিকটবর্তী পুষ্কর হ্রদের তীরে ছিল পুষ্করণা। সেখানকার রাজা ছিলেন সিংহবর্মা। তাহার দুই পুত্র—নরবর্মা ও চন্দ্রবর্মা। এই চন্দ্রবর্মাই মেহরৌলি স্তম্ভের ভারত বিজয়ী চন্দ্র। তিনি যোধপুর হইতে বাঁকুড়া পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন।

এই ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আজ একেবারেই নিরর্থক। তবে দুই একটি কথা আপনিই আসিয়া যায়। দশপুরের রাজা নরবর্মার পিতা সিংহবর্মাকে হাজার মাইল দূরবর্তী লেখ বিশেষের পুষ্করণাপতি চন্দ্রবর্মার পিতা সিংহবর্মার সহিত অভিন্ন অনুমান করার পক্ষে যুক্তি কি ? কিছুই না। কারণ সিংহবর্মা নামটি অত্যন্ত সাধারণ। দ্বিতীয়তঃ, দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা তাঁহার যোধপুর অঞ্চলস্থিত রাজধানী হইতে দেড় হাজার মাইল দূরবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ে আসিয়া গুহা খননপূর্বক অভিলেখ উৎকীর্ণ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিবার পূর্বে অবশ্যই দেখা প্রয়োজন যে, শুশুনিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে পুষ্করণা নামের কোনো স্থানের অস্তিত্ব আছে কিনা। আশ্চর্যের বিষয়, অল্প সন্ধানেই দামোদরের নিকটে পোখরণা নামক গ্রামের সন্ধান মিলিয়া গেল। এইখানেই যে চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল, ইহা বিশ্বাস করা অবশ্যই কাহারও কিছু কঠিন মনে হইল না।

এইবার আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত একটি সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ সমর্থন জানাইব। আমাদের দেশে সকলেই সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের কথা বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, ইদিলপুরে প্রাপ্ত লক্ষণসেনের পুত্রের একখানি তাম্রশাসনে শাসনদাতার নাম কেশবসেন পাঠ করা হইয়াছিল। অবশ্য পূর্বলিখিত একটি নাম ঘষিয়া তুলিয়া এই নামটি অল্প পরিসরে লিখিত, তাহা বুঝা গিয়াছিল। যাহা হউক, তাম্রশাসনটি হারাইয়া যাওয়ায় কেহ ইহা সম্যকরূপে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। আবার মদনপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত অনুরূপ আর একখানি তাম্রশাসনে শাসনদাতা হিসাবে লক্ষ্মণসেন-পুত্রের যে নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশ্বরূপসেন। এখানেও পূর্বলিখিত একটি নামের স্থানে

অল্প পরিসরে এই নূতন নাম পুনর্লিখিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এ শাসনটিও পরে হারাইয়া যাওয়ায় অনেকের পক্ষে ইহা পুনঃ পরীক্ষা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু, জার্মান-পণ্ডিত কীলহর্ণ এবং হরপ্রসাদ বলিয়াছিলেন যে, ইদিলপুর ও মদনপাড়া তাম্রশাসনদ্বয় একই রাজার প্রদত্ত এবং ইদিলপুর শাসনে ভ্রমক্রমে 'বিশ্বরূপ' স্থলে 'কেশব' পাঠ করা হইয়াছে। (দ্র· বসু, *J.A.S.B.*, Vol. XLV, Part I, 1896, pp. 8 ff· ; Kielhorn's List of Inscriptions of Northern India, in *Ep. Ind.*, Vol· V, 1898-1899, No. 649, note, শাস্ত্রী, *Ind. Hist. Quart.*, Vol. II, 1926, pp. 77 f.)। অবশ্য অপর কোনো লেখকই এই মত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু আমরা পুনরাবিষ্কৃত মদনপাড়া শাসন নূতন করিয়া সম্পাদনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মত। পূর্বলিখিত 'সূর্য' নামটি ঘষিয়া তুলিয়া সেস্থলে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার 'বিশ্বরূপ' লিখিতে গিয়া কিছুই খুব স্পষ্টভাবে লেখা যায় নাই। ইদিলপুর শাসনে তাহাই ভুল করিয়া 'কেশব' পাঠ করা হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। দ্র *Ep Ind.*, Vol. XXXIII, 1959-1960, pp. 315 ff.)।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'তে শাস্ত্রী মহাশয়ের 'কাঞ্চনমালা', 'বাল্মীকির জয়' এবং 'বেণের মেয়ে' স্থান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থ গত শতাব্দীর শেষভাগে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল; তৃতীয়খানি পরে 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা; কিন্তু নাম হইতেই বুঝা যায় যে, তৃতীয় গ্রন্থের ভাষা হালকা ও ঝরঝরে। 'কাঞ্চনমালা'র ভিত্তি বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত মৌর্যবংশীয় রাজা অশোকের পুত্র কুণালের কাহিনী। ইহাকে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কিংবদন্তীর পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাসের ন্যায় মনে হয়। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীর ছায়ার উপর 'বাল্মীকির জয়'-এর ভিত্তি। 'বেণের মেয়ে'কে বাঙলাদেশের ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস বলা যাইতে পারে।

তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে 'বাল্মীকির জয়' সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন'-এ সমালোচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে।....কিন্তু···চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই।...কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ কল্পনায়। ইহার কল্পনা মহিমময়ী।...যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা।...ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে; কিন্তু আমরা

এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি।...গ্রন্থখানি অতিক্ষুদ্র ; কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষার একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্পবয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।' ('হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী', বসুমতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য)। 'কাঞ্চনমালা' এবং 'বেণের মেয়ে'তেও হরপ্রসাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১০০০ খ্রীষ্টাব্দের কাহিনী হিসাবে 'বেণের মেয়ে'তে আমরা কিছু কিছু ইতিহাস বিষয়ক ত্রুটি দেখিতে পাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশের পর এই দীর্ঘকালে আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান অনেক বর্ধিত হইয়াছে। আমরা এখন জানি যে, হরিবর্মা ও ভবদেব ভট্ট ঐ সময়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হন। হরিবর্মা সামলবর্মার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন ; তাঁহাদের পিতার নাম ছিল জাতবর্মা। এই জাতবর্মা চেদিরাজ কর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। কর্ণদেব ১০৪১-৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার দৌহিত্র বা দৌহিত্রস্থানীয় হরিবর্মা ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সিংহাসনে আসীন ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। হরিবর্মা যে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে। শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে পালবংশীয় প্রথম মহীপালের (আ° ৯৭৭-১০২৭ খ্রী°) রাজত্বের উল্লেখ করিয়াছেন ; কারণ মহীপালের সারনাথ লেখের তারিখ ১০২৬ খ্রী°। মহীপালের পুত্র নয়পাল (আ° ১০২৭-৪৩ খ্রী°) এবং পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ° ১০৪৩-৭০ খ্রী°)। এই বিগ্রহ পাল কর্ণদেবের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং জাতবর্মার ভায়রাভাই ছিলেন। সুতরাং হরিবর্মা বিগ্রহপালের পুত্রগণের (আ° ১০৭০-১১২৬ খ্রী°) সমসাময়িক। এ সম্পর্কে হরিবর্মা, সামলবর্মা এবং ভোজবর্মার সামন্তসার, বজ্রযোগিণী এবং বেলাবো তাম্রশাসনের সাক্ষ্য পরীক্ষণীয় (*Epigraphia Indica*, Vol. XXXI, pp. 255 ff. ; Vol. XII, pp 37 ff.)।

বঙ্গাধিপ হরিবর্মার রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি নিতান্তই অসম্ভব। কারণ ১০০০ বা ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববাঙলা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকৃত হইত। এমন কি হরিবর্মা রামপালের (আ° ১০৭২-১১২৬ খ্রী°) রাজত্বের শেষার্ধে তাঁহার বশীভূত মিত্ররূপে পূর্ববাঙলায় শাসন আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করার কিছু কারণ আছে। 'বালবলভী' হইতে 'বাগড়ী' নামটির উদ্ভব ভাষাতত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত হয় না। সংস্কৃত 'ব্যাঘ্রতটী' নামের প্রাকৃত রূপ

'বগ্‌ঘঅড়ী' বা 'বাঘঅড়ী' হইতে 'বাগড়ী' উদ্ভূত হইতে পারে। আবার 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভবদেব ভট্টের উপাধি এবং নামবিশেষ ছিল। উহা হইতে তাঁহাকে বালবলভীর রাজা বলিয়া স্থির করা যায় না। যাহা হউক, এ কথা সত্য যে, ভবদেব ভট্টের একখানি প্রশস্তি পট্ট ভুবনেশ্বরের অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরমানন্দ আচার্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে General Stewart ভুবনেশ্বরের মন্দির সমূহ হইতে দুইখানি শিলালেখ আনিয়া কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে দান করেন। ইহাতে হিন্দুর ধর্মকর্মে আঘাত করা হইয়াছে বলিয়া পুরোহিতগণ আন্দোলন উপস্থিত করিল। তাই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Major Kittoe-র চেষ্টায় দুইখানির স্থলে ভ্রমক্রমে তিনখানি শিলালেখ সোসাইটী হইতে ভুবনেশ্বরে ফেরৎ পাঠানো হয়। তন্মধ্যে ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিটি অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে সংলগ্ন করা হইয়াছিল। আচার্য মহাশয় দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, এইভাবে বাঙলাদেশের কোনো স্থানের এই শিলালেখটি ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হয়, প্রকৃতপক্ষে ভবদেব ভট্টের সহিত ভুবনেশ্বরের কোনোই সম্বন্ধ ছিল না। (*Proceedings of the Indian History Congress*, 1939, pp. 287 ff. দ্রষ্টব্য)।

শ্রীহর্ষের 'গৌড়াধীশ-প্রশস্তি' বা 'গৌড়াধীশ-কুল-প্রশস্তি'-র কোনো পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত গৌররাজ হরিবর্মা হইতে পারেন না। কারণ গৌড় হরিবর্মার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। আবার শ্রীহর্ষের কাল কেহ কেহ বলেন নবম-দশম শতাব্দী, কেহ বলেন দ্বাদশ শতাব্দী অবশ্য তিনি বাচস্পতি এবং উদয়নের উদ্ধৃতি দিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে দশম শতাব্দীর পরবর্তী মনে করিতে বাধা নাই। কিন্তু শ্রীহর্ষ কোন দেশীয় ছিলেন, তিনি বাঙালী ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *A History of Sanskrit Literature, Classical Period*, Vol. I, pp. 326, 626 দ্রষ্টব্য)।

হরপ্রসাদের রচনাদি পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার অসামান্য শক্তিকে নানা দিকে বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন। দু-একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখিলে তাঁহার অবদান যে বিস্ময়াবহ হইত, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। এমন কি তিনি যদি কেবলমাত্র ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখিতে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলেও তিনি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের সম্মান পাইতেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

গোপাল হালদার

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এক.

১২৮৪ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' সেদিনের উদীয়মান সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'আমাদের গৌরবের দুই সময়' ব্যাখ্যা করছিলেন : 'সম্ভবত এই দুইটী বুদ্ধি বিপ্লবের একটী যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৯০০ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৪০০ বৎসর সমান তেজে সুফল প্রদান করে। অপরটী খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ বৎসর ভারতের পুনঃসংস্কার করে। প্রথমটীতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয়। দ্বিতীয়টীতে পৌরাণিকদের শ্রীবৃদ্ধি হয়।' তাঁর বিচারে, 'একটীতে মৌলিকতা পরিপূর্ণ, অপরটীতে প্রকৃষ্টরূপ চর্চ্চা মাত্র ; মূলের দোহাই অধিক, কিন্তু মৌলিকতারও কমি নাই।....একটীর চরম ফল উন্নতি, আর একটীর ফল অধোগতি। তথাপি প্রথমটী দ্বিতীয়টীর মূল, প্রথমটী না হইলে দ্বিতীয়টীর নামও শুনিতে পাইতাম না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তবে কিরূপে ফল দুই প্রকার হইল ? উত্তর, সমাজের অবস্থায়।...প্রথমটী প্রবল অর্থাৎ সামাজিক উন্নতিরই মূল, পরমার্থ তত প্রবল নহে। অপরটীতে হাই চর্চ্চ টোরি মত ; উন্নতির গন্ধও নাই। সবই পরমার্থ, ইহলোকের নামও নাই।'

এদেশের কোনো স্পেঙ্গলার বা টয়েনবি নিশ্চয়ই তাঁদের বিচার-দৃষ্টি নিয়ে আরও অগ্রসর হতে পারেন। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে আমাদের কোনো গৌরবের দিনই মানব-সভ্যতার ইতিহাসের দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য বা তেমন গৌরবের অধ্যায় নয়, সভ্যতার ইতিহাসের তা একটি ফুট নোট মাত্র। তবু ফুটনোটই হোক আর পত্রখণ্ডই হোক, ইতিহাসের এই

হারানো পাতাকে নূতন করে পাঠের সুযোগ যাঁরা দিয়েছেন, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সেই পণ্ডিতগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বয়ং একজন।

আর-একটি কথাও শাস্ত্রী মহাশয়ের ইঙ্গিত অনুসরণ করে বলা যায়—আমাদের গৌরবের একটি তৃতীয় দিকও আছে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ১৮০০ বৎসর পরে এই বঙ্গভূমিতেই তা আরম্ভ হয়েছিল—১০০ বৎসরে ভারতভূমিতে তা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতিলাভ করে। খ্রীষ্টজন্মের ১৯৪৭ সালে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসেও আমাদের এই একশত বা দেড়শত বৎসরের প্রয়াস এই অর্থে একটা অর্থপূর্ণ ঘটনা। অবশ্য আধুনিক সভ্যতার দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে তা এখনো একটা খণ্ড পরিচ্ছেদমাত্র; কারণ ১৯৪৭-এর মূল অর্থ ভারত-ভূখণ্ডে আধুনিক সভ্যতার ক্রম-প্রতিষ্ঠা। আর একালে সেই আধুনিক সভ্যতারও বিশ্বব্যাপী যে আবর্তন-বিবর্তন চলেছে, তাতে কোনো ভূখণ্ডই আর পূর্বেকার মতো আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। অন্তত আমাদের এই ১৯৪৭-এর 'সম্ভাবনা' যে আমাদের প্রচেষ্টা ও বিশ্বব্যাপী আবর্তের টানে কী পরিণতি লাভ করবে, তা আজ জগদ্‌গুরুরা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই—প্রায় একশত বৎসর ধরে বাঙলাদেশে একটা গৌরবের কাল চলেছিল। সে একশত বৎসর খ্রীঃ ১৮১৫ (রামমোহন রায়ের প্রকাশ) থেকে খ্রীঃ ১৯১৪ (প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ) পর্যন্ত কিংবা খ্রীঃ ১৮১৭ (হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা) থেকে খ্রীঃ ১৯১৮ (প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রারম্ভকাল) পর্যন্তও ধরতে পারি—ঘড়ির কাঁটা দেখে তা ভাগ-বিভাগ করা নিরর্থক। মোটামুটি কালটা বাঙালীর জাগরণের কাল, বাঙালী ভদ্রলোকের অভ্যুদয়কাল, ভারতবর্ষে আধুনিক সভ্যতার অঙ্কুরায়ণের কাল। ১২৮৭ সালের ৩০শে চৈত্র (অর্থাৎ ইং ১৮৮০-র এপ্রিল মাসে) সাবিত্রী লাইব্রেরির (দ্বিতীয় বার্ষিক) অধিবেশনে পঠিত 'বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে যুবক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই 'পরিবর্ত্তন সময়ের' মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে—শুধু 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তির' বিষয় চিন্তা করেও—এই গৌরবের তৃতীয় কালের কথা সবলে ঘোষণা করেন: 'তাঁহারা (রামমোহন ও পরবর্তী জিনিয়সগণ) যে সমাজ, যে সাহিত্যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এমন কি আর কখন হইবে? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখন কোন দেশে কোন কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল?' ইউরোপীয় রিনাই-

সেন্সের কথা বিশেষ করে তাঁর মনে জাগছিল, কিন্তু তিনি নিজেই বলছিলেন, ইউরোপীয় রিনাইসেন্স শুধু গ্রীক সাহিত্য ও চিন্তার দান লাভ করেছিল। আমরা এই উনিশ শতকে পেলাম একই কালে রিনাইসেন্স—রিফর্মেশন—বুর্জোয়া-বিপ্লবে বর্ধিত ইউরোপের দান—তার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঞ্জীবনী মন্ত্র, এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচার, বৌদ্ধসাহিত্যের পুনরুদ্ধার। 'এত সম্পদ কাহার ভাগ্যে ঘটে?' দৃঢ় কণ্ঠেই হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তথচ তখনো সেই ভাগ্যের মহত্তম বিকাশ অপ্রকাশিত। আর, যা হরপ্রসাদের ভাবনায় গৌণ, এমনকি বঙ্কিমেরও কল্পনাতীত, সেই স্বাধীনতার সাধনায়ও বাঙালীর আত্মপ্রকাশের প্রেরণা স্ফুরিত হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র অজ্ঞাত। এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচারে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে, বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি-অপসারণে তখনো হরপ্রসাদের দান অনধিগত। আজকে সেই পরিবর্তন-সময়ের সমগ্র পরিণতি সম্মুখে রেখে আমরা আরও সবল কণ্ঠে বলতে পারি—এত সম্পদ ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর কবে ঘটেছে? পরাধীনতার শত বন্ধনের মধ্যে আমাদের ইতিহাসে কবে জন্মেছে এত মহদাশয়-পুরুষ? আর, এমন যদি না হোত তাহলে পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে কি আমাদের এ-মুক্তি সম্ভব হোত? অবশ্য পরমুহূর্তেই ১৯৪৭-এর পরবর্তী সংকট ও সংঘাতের কথা মনে রেখে নিজেদেরও জিজ্ঞাসা করতে হয়—অংকুরেই বিনাশের সম্ভাবনা কি কম দেখা দিয়েছে? কিন্তু ভাবী দিনের সেই আশা-আশংকার কথা ছেড়ে দিলেও বলতে হবে আমাদের এই তৃতীয় গৌরবের দিনের তুলনাও ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই গৌরবের কালটির মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্থানও অসামান্য গৌরবের। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় সেদিন 'জিনিয়াসের সময়', 'আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি ইঁহাদিগেরই কৃপায়'—বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ-সময়, চারদিকে সৃষ্টির জোয়ার, আলোক-দূতের আহ্বান নানাপ্রদেশ থেকে। সাধারণ-শক্তিও আপনার অসাধারণতায় তাই জেগে উঠেছে—আর অসাধারণ শক্তি বহুদিকে আপনাকে মেলে না দিয়ে স্থির হতে পারে না। তার প্রমাণ হরপ্রসাদের মতো বহুমুখী কৃতী পুরুষগণ। তিনিও তখন একক নন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন আর রমেশচন্দ্রও প্রায় তাই (রমেশচন্দ্রের কাল ১৮৪৮-১৯০৯, হরপ্রসাদের ১৮৫৩-১৯৩১)। আর রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তাঁর পূর্বগামী। তবে

বিশেষ করে বঙ্কিম (১৮৩৮-১৮৯৪) ও রাজেন্দ্রলালেরই (১৮২২-১৮৯১) তিনি অনুগামী। রাজেন্দ্রলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রকে, দু-জনকেই রবীন্দ্রনাথ সব্যসাচী বলেন। হরপ্রসাদকেও তা বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথের মনে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গেই তাঁর চরিত্রচিত্র মিলিত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও এরূপে হরপ্রসাদের কীর্তি মিলিত হয়ে আছে। স্বচ্ছ ও সরল খাঁটি বাঙলা গদ্য-সৃষ্টিতে সহযোগীরূপে হরপ্রসাদ বঙ্কিমের উত্তরসাধক।

দুই.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিজস্ব এলাকা এক-আধটি নয়, এ একটি বৃহৎ রাজ্য। এর প্রত্যেক এলাকাতেই তাঁর অধিকার সুস্থির। বহুমুখী প্রতিভার জ্ঞানে ও আয়ত্তে বহু এলাকাই আসে। সম্ভবত সভ্যতা যখন প্রবীণ হয়ে ওঠে তখন বহুমুখী প্রতিভার দিন যায়, অপেক্ষাকৃত সীমিতক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের বিকাশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে আসে জ্ঞানের সর্বাঙ্গীন ও সার্বজনীন পরিবেশনের সমস্যা—যে সমস্য আজ প্রবলরূপে দেখা দিয়েছে, তাই আমেরিকায় জেনারেল এডুকেশনের নূতন দাবি উঠেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কালে বাঙালী সমাজে এই বহুমুখী প্রতিভারই প্রয়োজন ছিল, সম্ভবত এখনো এদেশে তা শেষ হয় নি,—অথচ ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে 'বিশেষজ্ঞদের যুগ' তখন (উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই) প্রতিষ্ঠিত। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য অধিগত করে এদেশে এই পথের পথিকৃত হলেন। বঙ্গদর্শন ও আর্যদর্শনের সাহিত্যরসিক লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শুভক্ষণে তাঁরই ঐতিহ্যভার লাভ করলেন (ইং ১৮৭৮-১৮৮২)। প্রাচ্যবিদ্যার বিশেষজ্ঞের ও এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রাহকের বিশিষ্ট সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এইটি যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক বিচারের এলাকা—তাঁর নিজস্ব এক ক্ষেত্র। এখানে তাঁর বিস্তৃত সংগ্রহ, তাঁর বিবরণী-মালা, সম্পাদিত গ্রন্থ আর তিন শতাধিক প্রবন্ধ শাস্ত্রী মহাশয়ের কীর্তি। এর অনেক লেখাই ইংরেজিতে লিখিত, বাঙলায়ও লেখা কম নয়। তাঁর পাণ্ডিত্য ছাড়া অদ্ভুত যুক্তিপূর্ণ অন্তরদৃষ্টির প্রমাণ তাতে প্রচুর। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্যবোধ খর্ব হয় নি। তথাপি সাহিত্য অনুশীলনের অবকাশ সীমিত হয়েছে। 'বাল্মীকির জয়'-এর (বাং ১২৮৮, ইং ১৮৮১) লেখককে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙলার প্রথম গদ্য-

কাব্যের লেখক বলেছেন, প্রায় একই কালে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-র (১ম সংস্করণ ১২৮৮, ২য় সংস্করণ ১২৯২ বাং) ও বাল্মীকির জয়'-এর (১৮৮১) গদ্যকবি বাল্মীকির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তারপর বাল্মীকির জয়'-এর লেখক হলেন 'কাঞ্চনমালা'-র (১২৮৯ বঙ্গদর্শন, গ্রন্থাকারে বাং ১৩২২=ইং'১৯১৬) কথাকার। 'বেণের মেয়ে'-র (১৩২৫-১৩২৬ নারায়ণ, গ্রন্থাকারে বাং ১৩২৬ =ইং ১৯২০) স্রষ্টা। এই ঐতিহাসিক সমাজচিত্র রচনার রাজ্যে শাস্ত্রী মহাশয় যে ইতিহাসবোধ ও চিত্র-সৃষ্টির সমন্বয় করেন তা ভারতীয় সাহিত্যে অতুলনীয়—তাঁর শিষ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া এই ক্ষেত্রে কেউ আর প্রবেশাধিকারও পান নি। শাস্ত্রী মহাশয়ের রসসৃষ্টির ও বিচারবুদ্ধির অন্য পরিচয় লাভ করা যায় সংস্কৃত কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে। বঙ্কিমচন্দ্রও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যের এরূপ রসসমৃদ্ধ আধুনিক আলোচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই প্রথম ও অগ্রগণ্য। কালিদাসের কাব্য আলোচনায় তিনি শেষ জীবনে 'নারায়ণ'-এ ২৪-টি প্রবন্ধ লেখেন। এ সব আলোচনা তিনি সংস্কৃতের আলংকারিক পদ্ধতিতে করেননি, আধুনিক কালের রসজ্ঞ সমালোচকের মতো করেছেন। বাঙলা সাহিত্য তাঁর নিজের চতুর্থ ক্ষেত্রে। বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর রচিত প্রবন্ধের ও কথিত আলোচনার সংখ্যা স্থির করা প্রায় অসম্ভব। যা লিখিত ও মুদ্রিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ তালিকাও প্রণীত হয়েছে কিনা সন্দেহ। আর প্রথমাবধিই এ আলোচনায় তিনি ছিলেন প্রায় পথিকৃৎ। তাঁর পূর্বে রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা রিভুয়ুতে ইংরেজি ভাষায় (ইং ১৮৭৭) এ ধরনের আলোচনা করেছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্নের সুপরিচিত 'প্রস্তাব'ও প্রকাশিত হয়েছিল (ইং ১৮৭২-৭৩)। কিন্তু 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য'-এর (বাং ১২৮৭=ইং ১৮৮০ মতো জাগ্রত দৃষ্টির ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির পরিচয় পরবর্তী অনেক আলোচনাতেও সুলভ হয়নি। সাহিত্য যে একটা সামাজিক-মানসিক চর্যা হঠাৎ ব্যক্তিবিশেষের মাথায় সরস্বতী এসে নৃত্য শুরু করেন, শুধু এমন না—এ কথাটা সে দিনের বাঙালী লেখক যতটা বুঝতেন আজকের বাঙালী সম্ভবত তা বোঝেন না মাঝখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ও রসবাদের হাওয়াটায় সে সুস্থ আবহাওয়া ঘুলিয়ে দিয়েছে। এজন্যই শাস্ত্রী মহাশয়ের সে প্রবন্ধের কথা প্রথমেই আমরা উল্লেখ করেছি।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি যে সর্বতোভাবে আমাদের গ্রাহ্য হবে এমন কথা নয়। যেমন, বাঙালীর জাগরণের কথা উল্লেখ করে শাস্ত্রী মহাশয় এ প্রবন্ধেই প্রস্তাব করেছিলেন, রাজ্য পরিচালনা ভার ইংরেজের হাতে দিয়ে

'বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে নির্বিবাদে নিরাপদে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে পারেন।' অনুমান করা যায়, বঙ্কিমও এরূপ একটা পদ্ধতিতে বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনের কল্পনা করতেন। তার কারণ, অকৃত্রিম দেশ-প্রীতি, ইতিহাস-বোধ, মোহমুক্ত যুক্তি-বাদিতা সত্ত্বেও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিনিয়ম এবং সমাজ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এই মহাগুরুরা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে পারেন নি। এটা তাঁদের কালের ত্রুটি; কতকাংশে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর মূলগত শ্রেণী-দৃষ্টির ত্রুটি। বুর্জোয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রহণ করতে হলে ইংরেজের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্যও মানতে হবে, চাকুরে ও মধ্যস্বত্বভোগী শিক্ষিতশ্রেণীর এ-ভ্রম সহজেই ঘটত। কিন্তু তা নিয়ে আজ আমরা তাঁদের ত্রুটি দেখিয়ে যদি নিজেদের খুব বাহাদুর মনে করি তাহলে আমরাও খুব খাঁটি ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় দেব না। কারণ, ১৯৪৭-টা শুধু 'জাতির জনকের' সৃষ্টি নয়, এমনকি কংগ্রেস বা বিপ্লবী স্বদেশী দলেরও সৃষ্টি নয়। জাতির জনকেরও জনক কেন, পিতামহ ছিলেন। 'স্বদেশী' বা 'বিয়াল্লিশী'দের অপেক্ষা 'ইয়ং বেঙ্গল'ও কম বিদ্রোহী ছিলেন না। ঊনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের যাঁরা উদ্বোধন করলেন তাঁরা সাহিত্যের মধ্য দিয়েও আমাদের জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনাকেই অগ্রসর করে গিয়েছেন—মধ্যযুগের অবসান আসন্ন করে এনেছেন। এমনকি, সে তুলনায় ১৯৪৭-এর পরবর্তী বাঙালী বা ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী আধুনিক সভ্যতায় ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজনে তেমন প্রতিজ্ঞা, তেমন নিষ্ঠা, তেমন শক্তি বা তেমন সাধনার পরিচয় দিচ্ছেন বলতে পারি কি? আকাদেমির পুরস্কার আর সাহিত্যের 'সমারোহ'-প্রলুব্ধ প্রতিযোগিতা শ্রদ্ধা সঞ্চার করতে পারে কিনা দেখা যাক।

তিন.

ঊনবিংশ শতকে বাঙলা দেশের কলোনিয়াল মধ্যবিত্তশ্রেণী যে সৃষ্টিশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়, কলোনিয়াল বন্ধনে অবশ্য তা ক্রমেই অতিমাত্রায় অন্তর্মুখী ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদ যখন বাঙলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন তখনো তার ভারসাম্য নষ্ট হয় নি। সৃষ্টিতে ও কল্পনায় অবশ্য তখন বান ডেকেছে। তাহলেও একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার ধারাও সাহিত্যে তখন প্রবল ছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিনিষ্ঠ যুগ-পুরুষদের

দান তখনো অক্ষয়। এমন কি, বঙ্কিমও যুক্তির আশ্রয় ছেড়ে তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদ গঠনের কথা ভাবেন নি—এজন্য তাঁকে গীতা, মিল, স্পেনসার, সীলি, কোঁৎ নিয়ে অনেক কসরত ও মেহনত করতে হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদর্শনের এই বঙ্কিমকে তাঁর সাহিত্য গুরু রূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে (বসুমতী, ভাদ্র ১৩২৯) তিনি বলেছেন, 'তিনি জীবনে আমার Friend, Philosopher and Guide ছিলেন।' এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু 'প্রচারের' বঙ্কিম যখন ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠেছিলেন শাস্ত্রী মহাশয় তখন প্রাচ্যবিদ্যার বৈজ্ঞানিক চর্চায় আরও অগ্রসর হয়ে যান। কলোনির হিন্দুত্ব-বাদী বঙ্কিম বৈজ্ঞানিক চেতনা যতই হারাচ্ছিলেন, নৈয়ায়িকের বংশধর হরপ্রসাদের বুদ্ধি ও ধী পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘর্ষণে ততই শাণিত হয়ে উঠছিল। হিন্দুসভার হিন্দুত্বের প্রতি তাঁরও মমতা ছিল, ১৯২৩-এ কলকাতার অধিবেশনে তিনি হিন্দুসভার সভাপতিত্বও করেন। কিন্তু বিদ্যা ও বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের মমতা তাঁর বুদ্ধিকে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বরং নৈয়ায়িক বুদ্ধি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সম্পর্কে এসে জীবন-নিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারল—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার এক দৃষ্টান্ত। স্মার্ত পণ্ডিতদের মতো শাস্ত্র দিয়ে জীবন ব্যাখ্যা করতে তিনি চান নি, বরং জীবন দিয়েই হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকে তিনি যাচাই করে নিয়েছেন। আলঙ্কারিকের পদ্ধতিতেও তাঁর কাব্য-চেতনা কাব্যবিচার করে টীকাভাষ্য রচনা করলে না, জীবন দিয়ে তা সাহিত্য-রস বুঝে দেখতে চাইল। নৈয়ায়িক ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনদৃষ্টির এই সমন্বয়—এই জীবনবাদী নৈয়ায়িকতা—এইটিই শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ। আর, এইটিই একালের বাঙালীর পক্ষেও এক স্বীকার্য সত্য।

চার.

ন্যায়ের বিচার ও জীবনের বিকাশের, যুক্তি ও রসবোধের এই আশ্চর্য মিলনের ফল শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা বাঙলা গদ্য। কালপ্রভাবে বিজ্ঞানের দান পুরনো হয়। কারণ নতুনতর দানকে সম্ভব করে তোলাই বিজ্ঞানের ধর্ম। তাতে বিজ্ঞানের মূল্য কমে না। শুনেছি শাস্ত্রী মহাশয়ের কোনো কোনো ঐতিহাসিক মত খণ্ডিত হয়েছে; নিশ্চয়ই আরও খণ্ডিত হবে—তাতে তার মূল্য কমবে না। এমন কি 'বাল্মীকির জয়', 'বেণের মেয়ে' নিষ্প্রভ না হলেও হয়ত তত বেশি পঠিত হবে না; কারণ, নূতন সৃষ্টিতে সাহিত্যের

ভাণ্ডার আরও ভরে উঠবে। কিন্তু কোনো কালেই কোনো কারণে যার আদর কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না, সে হচ্ছে শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙলা গদ্য।

বাঙলা গদ্যের এই ক্রমবিকাশের কথা এখানে আলোচনা করা অসম্ভব। সে ইতিহাস অল্পদিনের হলেও কম বিচিত্র নয়। আজ বাঙলা গদ্য প্রৌঢ়ত্ব লাভ না করে বরং তালজ্ঞান হারাচ্ছে। তথাপি এ গদ্যের ইতিহাসে কৃতীও আছেন, এখন পর্যন্ত তাঁরা নির্বংশও হন নি। তাঁদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে; সে-সব বুঝতে হলে বিশ্লেষণ করতে হয়, উদ্ধৃতি দিতে হয়, প্রায় বই লিখতে হয়। এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শও বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে হয়।

সংক্ষেপে এখানে বলা প্রয়োজন—গদ্যভাষা বিশেষ করে হচ্ছে কাজের ভাষা, বুদ্ধির ভাষা, জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভাষা; যেমন ভাব ও আবেগের ভাষা কাব্যের ভাষা। গদ্যের ভাষার প্রধান গুণ তাই স্বচ্ছতা (clarity যা নাকি ফরাসি গদ্যের একমাত্র লক্ষ্য)। এই প্রধান ধর্ম স্বীকার করেও গদ্য হাজার রকমে বিচিত্র হতে পারে—প্রত্যেক লেখকের হাতেই তার নূতন রূপ ফুটতে থাকে। স্টাইল ব্যক্তিত্বের প্রতিলিপি। সম্ভবত এর পরেই বলা উচিত ভাষার সেই রূপ নির্ভর করে বিষয়ের উপর। তাই কতকটা নির্ভর করে কার জন্য লেখা, কী ভাব উদ্রেক করার জন্য লেখা—এ সবেরও উপর। সকল ভাষার গদ্যের সম্বন্ধেই এসব কথা সত্য। প্রয়োজন বুঝে তার লঘু চাল, গম্ভীর চাল, কিংবা সরস স্বচ্ছন্দ চাল, সবই দরকার হয়। তথাপি আবার স্মরণীয়, গদ্যের প্রধান ধর্ম—স্বচ্ছতা; সংস্কৃত আলংকারিকরা যাকে বলেছেন প্রসাদগুণ, ইংরেজিতে যুক্তির যুগে (অষ্টাদশ শতকে) গদ্যে যে গুণের বিকাশ হয়েছিল—সেই প্রাঞ্জলতা।

এই বাঙলা গদ্যের নির্মাতাদের মধ্যে বঙ্কিম, হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর তিন দিক্‌পাল। তাছাড়াও অবশ্য গুরু আছেন—বিদ্যাসাগর একদিকে মহাগুরু, অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। শিবনাথ শাস্ত্রী ও কেশবচন্দ্র, সেদিনের অক্ষয় সরকার বা চন্দ্রনাথ বসুর অপেক্ষা কম নমস্য নন। আর হরপ্রসাদ রামেন্দ্র-সুন্দরদের সমকালীনদের মধ্যে বিবেকানন্দ, বলেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র বা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিস্মৃত হবার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের কথা এ প্রসঙ্গে আমরা তুললাম না, যদিও রবীন্দ্রনাথ সর্ব-দিকেই অতুলনীয় শিল্পী। কারণ, প্রথমত রবীন্দ্র-প্রতিভা গদ্য-প্রতিভা নয়, কাব্য-প্রতিভা। দ্বিতীয়ত তাঁর গদ্যের যেটি বিশেষ ধর্ম—সেই ভাবুকতার উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন মহর্ষির কাছ থেকে। তাই মহর্ষি প্রণম্য।

আর তৃতীয়ত, সরস, স্বচ্ছন্দ যে গদ্য তাঁর 'জীবনস্মৃতি' পর্যন্ত বিকশিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তা কাব্যিক গুণে, বাক্যবিন্যাসের রীতি পালটিয়ে নিয়ে বাঙলা গদ্যের মূল প্রকৃতিকে নিয়ে খেলা করে গিয়েছে। তা যেন খেয়ালের আলাপ। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কথা যা তা এই যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী চলতি বাঙলা লেখেন নি। তিনিও বাঙলা কথার কুশলী শিল্পী। কিন্তু তাঁর চলতি বাঙলা আসলে চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদযুক্ত সাধু বাঙলা। বিবেকানন্দ ছাড়া চলতি বাঙলা যদি কেউ লিখে থাকেন তবে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এই জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা চিরদিনের মতো গ্রাহ্য হয়ে থাকবে।

বলা প্রয়োজন—মুখের সাধারণ ভাষা আর সাহিত্যের ভাষায় একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। কারণ, মুখের কথার পিছনেও উক্ত বা অনুক্ত মনের কথা থাকে; সাহিত্যের ভাষা চায় প্রয়োজনীয় বাচ্যকে ভাষার জালে ধরতে। স্থূল-ভাবে এ চেষ্টা করলে সাহিত্যের ভাষা তা ধরতে তো পারেই না, বরং বাক্যের আড়ম্বরে বা আড়ষ্টতায় নিজেই জড়ভরত বনে যায়। কাজেই চলতি ভাষার সাহিত্য একেবারে মুখের ছেঁড়া-টুটা বা হুবহু টেপ রেকর্ডারের কথা হয় না। মুখের কথার চাল, কথিত ভাষার মূল প্রকৃতি, তার ছন্দ, তার স্বাভাবিক গতি, এগুলি সে সাহিত্য গ্রাহ্য করে। এই চাল, এই ছন্দও নিতান্ত এক ধরনের নয়। সঙ্গীতেরও যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি নানা স্টাইল আছে—আধুনিকী, ফিল্মী আরও কত কি গড়ে উঠছে, ভাষারও তা হতে পারে। বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যের ছন্দ ও ভারসাম্য প্রথম আবিষ্কার করেন। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরূপ ছিলেন, বলতেন সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষাটাকে বিপদে ফেলে গিয়েছেন। কিন্তু বাঙলা গদ্যের একটা ক্লাসিক স্টাইল বা ধ্রুপদী রূপ বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেন। বঙ্কিমও সময়মতো সংস্কৃতের শব্দ-সম্পদ গ্রহণ করে সে স্টাইল-এ মাঝে মাঝে সার্থক গদ্য লিখেছেন। তবে বঙ্কিমের নিজস্ব রীতি হল প্রসাদগুণযুক্ত গদ্যরীতি। 'ইন্দিরা'র শেষ সংস্করণের বঙ্কিম, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধের বঙ্কিম, বিশেষ করে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতির আলোচক বঙ্কিম—বাঙলার এই 'কাজের গদ্যের', প্রাঞ্জল গদ্যের, স্বচ্ছ যুক্তি ও স্বচ্ছ ভাষার গদ্যের—প্রধান গুরু।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর শিষ্য। প্রথমাবধিই তিনি ছিলেন এরূপ গদ্যের লেখক। সেদিনের সংস্কৃত কলেজের তিনি ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের তারাশংকর তর্করত্ন প্রভৃতির অনুকরণে হরপ্রসাদও সংস্কৃত ভাষাকে আঁকড়ে ধরে 'নদনদী,

পর্বত-কন্দর' লিখবেন এই ছিল বঙ্কিমের আশংকা ('বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়')। কিন্তু 'ভারত মহিলা'র প্রথমাংশ দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন, 'তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?' হরপ্রসাদ জানিয়েছিলেন, 'আমি শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা' (সংস্কৃত কলেজের লেকচরর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি বাঙলা চলতি ভাষা ও বাঙলা সাধুভাষার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন: Bengali Written & Spoken, *Calcutta Review*, ১৮৭৭)। ফলে হরপ্রসাদ প্রথমেই যা লেখেন ভাবে ভাষায় তা, বঙ্কিমের ভাষায়, খাঁটি সোনা।

অবশ্য বঙ্কিমের যুগে বঙ্কিমের ভাব ও ভঙ্গির প্রভাব যুবক হরপ্রসাদের উপর সুস্পষ্ট দেখা যায়। তাঁর গদ্যকাব্য 'বাল্মীকির জয়', 'যৌবনে সন্ন্যাসী' প্রভৃতি 'এসে'তে তার প্রমাণ আগাগোড়া। কিন্তু ক্রমেই লক্ষ্য করা যায় হরপ্রসাদ চলতি ভাষার প্রকৃতি অনুসরণ করেই তাঁর লিখিত বাক্য সাজাতে প্রস্তুত হচ্ছেন—'খাজনা দিই কেন?' প্রভৃতি 'কাজের গদ্যের' নমুনা, 'বাঙ্গালার সাহিত্য' (১২৮৭) 'বাঙ্গালা ভাষা' (১২৮৮) প্রভৃতি সাহিত্য-প্রবন্ধের নমুনা নিলে তা বোঝা যায়। তারপরে তাঁর মত ও বিচারবুদ্ধি বঙ্কিমের প্রভাব কাটিয়ে একেবারে আত্মস্থ হল। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধের, 'বেণের মেয়ে'র মতো কাহিনীর গদ্যের চালটা একেবারে মুখের কথার চাল—সাহিত্যে চলতি বাঙলার সার্থক নমুনা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ প্রধানত ক্রিয়াপদে ও সর্বনাম পদগুলিতে সাধুরূপের পরিবর্তে চলতিরূপ প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিবেচনায় তা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু চলতি বাঙলার মূল রূপ শুধু ঐ দু-ধরনের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না। তা হচ্ছে কথ্য ভাষার চাল। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ভঙ্গির খাতিরে এ চাল বর্জন করে একটা চটুল চাল চালিয়েছেন, তার প্রভাব আধুনিকদের বাঙলায় স্পষ্ট। কিন্তু ক্রিয়াপদে ও সর্বনামে পুরনো রূপ রক্ষা করেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাষা লিখেছেন, তা বাঙলা মৌখিক কথার স্বভাব-অনুগামী। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমের ধারাতেই তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত, আর চলতি বাঙলাও তাঁর ভাষাতে প্রতিষ্ঠিত।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক কৃতী লেখকের হাতেই ভাষা তার এক নূতন রূপের সন্ধান পায়। আর বিষয়, উদ্দেশ্য প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রত্যেক রচনার ভাষা সার্থক হয়। কাজেই, আরও কৃতী লেখক বাঙলায় জন্মেছেন, বাঙলায় জন্মাবেন, বাঙলা গদ্যও সহস্রদল মেলে দেবে। কিন্তু গদ্য প্রধানত হবে কাজের ভাষা, বুদ্ধি-শুভ্র কথা, বৈজ্ঞানিক মানসের বাহন। তার প্রধান গুণ হবে

স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা। আর এ বাঙলার প্রধান এক নির্মাতা হরপ্রসাদ। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায়, 'তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।' দুঃখের সঙ্গেই বলতে হবে দিনের পর দিন এ খাঁটি বাঙলা আরও দুর্লভ হয়ে উঠছে। কারণ, সর্বনামে-ক্রিয়াপদে চলতি রূপ গ্রহণ করেও তথাকথিত চলতি বাঙলা বেচাল হয়ে উঠছে।

এজন্য 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'—শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙলা লেখার প্রকাশ পরম প্রয়োজনীয়। বাঙালী লেখক খাঁটি বাঙলার সঙ্গে পরিচিত হোক।

[১৩৬৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা পরিচয় পত্রিকা থেকে সংকলিত।]

ভবতোষ দত্ত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস

এক.

'বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি'[১] এ কথা বলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদের এই কথাটি আজকাল আমাদের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যে যুগে তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন সে যুগ ছিল ইতিহাস সন্ধানের যুগ। বাঙালির পুরনো ইতিহাস উদ্ধারের যে প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে, সে প্রয়াস হরপ্রসাদের উদ্যমে অধিকতর সিদ্ধিলাভ করেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার পরিধি বিচার করলে বলা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল মর্মেরই সন্ধান করে ফিরেছেন, কেবল বাংলার ইতিহাস বা বাংলার সংস্কৃতিই তাঁর প্রধান আলোচনা-ক্ষেত্র ছিল না। তথাপি বাংলার ইতিহাস তাঁর বৃহত্তর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অন্তর্গত ছিল। সে-ক্ষেত্রে তাঁর দান বস্তুতই ছিল মৌলিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে বাংলার ইতিহাসের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা আমরা সকলেই দেখেছি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তাও আমাদের অবিদিত নেই। তিনি নিজে নানা উপলক্ষে যে অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন 'বিবিধ প্রবন্ধের' (১৮৯২, দ্বিতীয় ভাগ) ভূমিকায় তার নির্যাসটুকু পাই এইভাবে ঃ

১. হরপ্রসাদ এই বিখ্যাত উক্তিটি করেন সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের (১৩২০) অভিভাষণ-প্রসঙ্গে।

'অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।...যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তিনি যে তাঁর ভাবগুরুর এই ঐকান্তিক বাসনার স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবেন তা নয়। এজন্যই মনে হয়, হরপ্রসাদের যে উক্তিটি দিয়ে এই রচনাটি আরম্ভ হয়েছে সেটি যেন হরপ্রসাদের কণ্ঠে বঙ্কিমেরই উক্তি। তবু বঙ্কিমের ব্যাকুলতার সঙ্গে হরপ্রসাদের প্রয়াসের একটা পার্থক্য ছিল। বঙ্কিম প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার চেয়েও চেয়েছেন ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। তাঁর ইতিহাস-সন্ধানের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল দেশধ্যান ও স্বজাতি প্রীতি। বঙ্কিম যখন বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখেছেন, তখনও বস্তুত বাংলার ইতিহাসের উপাদান সংকলন যথোপযুক্ত হয়নি। বিশেষত তুর্কি বিজয়ের পরে বাংলার ইতিহাসের কাঠামো পাওয়া গেলেও তুর্কি বিজয়ের পূর্বেকার ইতিহাস তখনও অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে 'কে গায় ওই' সন্দর্ভটিতে এবং মৃণালিনীতে তুর্কি বিজয়ের পরেই বাঙালির একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগের অধ্যায়ন্তর ঘটল বলে মনে করেছেন। কিন্তু যে প্রাচীন কালটির গৌরব কল্পনা করে বঙ্কিম স্বপ্নমুগ্ধ, সেই কালটির সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত অল্পই জানা গিয়েছে। বঙ্কিম-চন্দ্র একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে:

'বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।'

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই আক্ষেপ বঙ্কিম করেছেন বিশেষ করে তুর্কি-পূর্ব যুগের বাংলার ইতিহাসের অভাব-বোধ করে। রাজকৃষ্ণের বইতে 'আর্যশাসনকাল' নামে প্রথম অধ্যায়টি ছিল মাত্র দশ পৃষ্ঠার। এর পরিশিষ্টে 'পাল রাজবংশ' নামে একটি অধ্যায় ছিল (পৃ° ৯৭-১০২)।[২] এই পরিশিষ্ট সম্ভবত প্রথম সংস্করণে ছিল না। এটি

২. 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর এই পৃষ্ঠাসংখ্যা নেওয়া হয়েছে ১৮৮৬-র সংস্করণ থেকে। এটি চতুস্ত্রিংশ সংস্করণ।

যুক্ত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *On the Pala and the Sena Dynasties of Bengal* প্রবন্ধটি প্রকাশের পর।[৩]

অবশ্য তার পূর্বেই পাল-রাজাদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের সূচনা হয়েছে, কিন্তু উপাদানের অভাবে সে-সূচনা ছিল ক্ষীণ। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস উইলকিন্স দিনাজপুরের গরুড়স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পান। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার প্রথম খণ্ডে এর অনুবাদ তিনি প্রকাশ করলেন। ১৮০৭ সালে কোলব্রুক তৃতীয় বিগ্রহপাল-দেবের আমগাছি লিপির অনুবাদ করলেন। এই দুই প্রত্নলিপি থেকেই পাল-রাজাদের সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হয়। এর থেকেই বাংলার প্রথম ইতি-বৃত্তকার চার্লস স্টুয়ার্ট ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলার ইতিহাসে বলেছিলেন:

> 'Although the Hindus of Bengal have an equal claim to antiquity and early civilisation with the other nations of India, yet we have not any authentic information respecting them during the early ages of their progress: nor is there any other positive evidence of the ancient existence of Bengal, as a separate kingdom, for any considerable period, than its distinct language and peculiar written character.'

স্টুয়ার্টের বইতে তুর্কি-পূর্ব যুগ কিছুই ছিল না। ১৮৩৮-এ লেখা মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসে ওই যুগ সম্বন্ধে একটি ছোট অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাতেও পাল রাজাদের কথা তখনও গুরুত্ব পায় নি। মার্শম্যানের বইয়ের এই অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার তিনটি রাজধানী গৌড়, সোনারগাঁ এবং সাতগাঁকে কেন্দ্র করে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। আদিশূর এবং সেন রাজারা বাংলার ইতিহাসে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু পাল রাজারা নেই। বস্তুত সেন রাজাদের সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী চিরকালই চলে এসেছে কৌলীন্য প্রথার অনুবর্তনের সঙ্গে এবং কুলশাস্ত্রের প্রমাণে। সেইভাবে আদিশূরের কোনো ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ পাওয়া না গেলেও লোকস্মৃতিতে তিনি ইতিহাসেরই রূপ লাভ করেছেন। সেন রাজাদের কিছু বিবরণ মীনহাজ-উদ্দিনের কাহিনী থেকেই জানা যায়। মুসলমান জাতি ইতিহাস-সচেতন

৩. রাজেন্দ্রলালের এই প্রবন্ধটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে *Indo Aryan* দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

ছিলেন, অতএব তুর্কি বিজয়ের পর থেকে বাংলার ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাঁদের লিখিত গ্রন্থই পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ-সেনের সঙ্গে তুর্কি সংঘর্ষ হওয়ার ফলে সেন রাজারাও উজ্জ্বলতর হয়েছেন, কিন্তু পাল রাজাদের কাহিনী কী করে উদ্ধার হবে ?

বস্তুত ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়কপালদেবের বংশতালিকাযুক্ত একটি তাম্রলিপির অনুবাদ করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাল রাজাদের ইতিহাস উদ্ধারে আগ্রহী হন। অবশ্য ইতিপূর্বে সেন রাজাদের সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধান করছিলেন। পরবর্তীকালে রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকাতে (তৃতীয় পর্বে) 'সেন রাজাদিগের বংশাবলী' নামে একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু পাল রাজাদের সম্বন্ধে জানবার একমাত্র উপায় তখন ছিল তাম্রলিপি। মহেন্দ্রপাল সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তাম্রলিপিনির্ভর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বেরিয়েছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই মহেন্দ্রপাল ছিলেন ভোজরাজের পুত্র।

এই সময়ের কিছু আগে থেকেই রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-সহকারীরূপে মাঝে মাঝে কাজ করতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের ***The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*** প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকাতে রাজেন্দ্রলাল সস্নেহচিত্তে হরপ্রসাদের ঋণের উল্লেখ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের কাছেই হরপ্রসাদের পুঁথি সংগ্রহের দীক্ষা হয় তারপর নানাসূত্রে সারা জীবনই তিনি এই কাজে কাটিয়েছেন। এ কথাও বলা যায়, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হরপ্রসাদ আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতিও রাজেন্দ্রলালের কাছেই শিক্ষালাভ করেন।[৪] রাজেন্দ্রলালের উপর ভার ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহের। ১৮৭০ সাল থেকেই সোসাইটির আনুকূল্যে পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৯১তে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হলে হরপ্রসাদ সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহের কাজে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এই দায়িত্ব ভার নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। এই কার্যোপলক্ষে হরপ্রসাদ চার বার নেপালে গিয়েছিলেন। আর সেই সূত্রেই আবিষ্কৃত হল বাংলার ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ উপাদান যার মূল্য অসীম—একটি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত আর একটি চর্যাপদ।

৪. বর্তমান সংকলনের "চল্লিশ বৎসর পূর্বে : রাজেন্দ্রলাল মিত্র" প্রবন্ধ দ্র.।

দুই.

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-এর একটি প্রধান গুরুত্ব এই যে কহ্লণের রাজতরঙ্গিনী ছাড়া এই বইটিই সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় লেখা সত্যকার ইতিহাস মর্যাদার অধিকারী। সংস্কৃতে 'ইতিবৃত্ত'-র গুণগান থাকলেও ইতিহাস নামক বস্তুটির বিশেষ অভাব আমাদের বিস্মিতই করে। অবশ্য সংস্কৃতে রাজাদের জীবনচরিতবর্ণনা-মূলক কাব্যের অভাব নেই। হর্ষচরিত, গৌড়বহো, নবসাহসাংকচরিত, বিক্রমাংকদেবচরিত, কুমারপালচরিত, পৃথ্বিরাজ বিজয় প্রভৃতি যে সব বইয়ের ধারা পাই, রামচরিত সেই ধারাতেই লেখা। কিন্তু ঐতিহাসিক বলছেন

> 'Among these, Rama-carita (twelfth century A. D) is undoubtedly the best from the historical point of view.'[৫]

আমাদের বিশেষ তৃপ্তির কথা এই যে রামচরিত বাংলা দেশের একজন অনন্য-কর্মা রাজারই কাহিনী এবং সে কাহিনী লিখেছিলেন প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী একজন বাঙালি কবি। রামচরিতের এই একটিই পুথি। হরপ্রসাদ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি নেপাল থেকে নিয়ে আসেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য বিবরণীতে এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal* Vol. III রূপে এই দুর্লভ পুথিখানি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।[৬]

রামচরিত একটি শিলষ্ট কাব্য। সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে বলেছেন কলিকালের বাল্মীকি:

> অবদানং রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োরেতৎ।
> কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ ॥
>
> —রামচরিত, কবিপ্রশস্তি।

এই কাব্যখানিকে রামায়ণ এবং নিজেকে বাল্মীকি বলার কারণ আছে। এর প্রতি শ্লোকের দুটি করে অর্থ। এক অর্থে এটি রামায়ণের রামচরিত,

৫. R. C. Majumdar, 'Ideas of History in Sanskrit Literature', C. H. Phillips ed. *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, Oxford University Press 1961, p. 19

৬. ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক, ননীগোপাল মজুমদার দ্বারা সম্পাদিত হয়ে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি থেকে আবার প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩-তে রাধাগোবিন্দ বসাক এর একটা বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্করণটিই রাধাগোবিন্দ আবার ইংরেজিতে চতুর্থ সংস্করণ রূপে প্রস্তুত করেছেন।

অন্য অর্থে পালরাজবংশোদ্ভূত রামপালের কাহিনী। এই দুরূহ শ্লিষ্ট কাব্যখানির অর্থোদ্ধার করা খুবই কঠিন। এই পুঁথির সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশটি শ্লোকের টীকাও পাওয়া যায়। ওই টীকাতেই রামপালের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে। রামচরিতের প্রথম তিন অধ্যায়ে রামপালের রাজ্যকালের ঘটনা, চতুর্থ অধ্যায়ে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালদেবের রাজ্যকালের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের মতো রামচরিতের চতুর্থ অধ্যায়টিও 'রামোত্তরচরিত' নামে পরিচিত।

তুর্কি-পূর্ব যুগের বাংলাদেশের রাজবৃত্তে দুটি গৌরবপূর্ণ অধ্যায় আছে। একটি ধর্মপালের আর একটি রামপালের। তেমনি আছে দুটি বিপ্লবের চমকপ্রদ ঘটনা। একটি গোপালের রাজপদে মনোনয়ন, আর একটি দিব্যোকের বিদ্রোহ দমন করে রামপালের রাজ্য উদ্ধার। দেশে যখন প্রচণ্ড অরাজকতা, বার বার বিদেশী রাজার আক্রমণে জনসাধারণ বিপর্যস্ত, সেই সময় প্রজারা দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র এবং বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্বাচন করে। এই অসাধারণ সংবাদটি জানা যায় খালিমপুর তাম্রশাসনে আর তিব্বতীয় লামা তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে'। এই নির্বাচনের সময় ছিল অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ। এই সময় থেকে পালবংশের রাজারা গৌড় শাসন করতে থাকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই চারশ বছরের ইতিহাস বাঙালির পক্ষে গৌরবের, যদিও এর মধ্যে উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল। দুঃখের বিষয় পাল রাজ্যকালের পূর্ণাঙ্গ বিশদ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। যেটুকু জানা যায় তা তাম্রশাসন ও শিলালিপির অমোঘ প্রমাণের সাহায্যে। কিন্তু সেই দূর অতীতের মধ্যে এই প্রমাণের আলো ফেলে মাঝে মাঝে পথরেখা আলোকিত হলেও আমাদের আকাঙ্ক্ষার তুলনায় তা নেহাৎই স্বল্প। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণা অবশ্য শিলালিপির চেয়েও পুঁথি-প্রমাণকেই বেশি করে অবলম্বন করেছিল। কিন্তু পালরাজগণের ইতিহাস 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া জানবার উপায় নেই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি (১৯১০) এই যুগের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হয়ে হরপ্রসাদ কথিত 'পাথুরে প্রমাণ' সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন 'গৌড় লেখমালা'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ বিংশ শতকের প্রথম দিকে পাল ও সেন রাজবংশের ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দুয়ের মধ্যে কিছু রেষারেষিও ছিল।[৭] শিলালিপি ও তাম্রশাসন ছাড়া আর যে উপকরণ সেকালে ব্যবহৃত

৭. এই গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য দ্র.

হয়েছে, তা হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বসুর বহু ব্যবহৃত কুলশাস্ত্র। হরপ্রসাদ নেপাল থেকে যে সব প্রাচীন পুথি নিয়ে এসেছিলেন, তাতে যে সব দুর্লভ উপকরণ সংগৃহীত আছে তার মূল্যও আজ অসাধারণ। কুলশাস্ত্রের প্রমাণ আজকাল ঐতিহাসিকেরা নির্বিচারে গ্রহণ করেন না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্টে দীর্ঘ আলোচনা করে 'বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্ন' করতে চেষ্টা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না থাকলেও তিনি যে প্রাচীন পুথি অবলম্বনে তাঁর গুরু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতোই গবেষণা সূত্রে বাংলার ইতিহাস উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রয়াসের মূল্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। রামচরিত পালযুগের ইতিহাস রচনার প্রধানতম উপকরণ। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের ইতিহাসের জন্য হাহাকার করেছেন, হরপ্রসাদ সেই যুগেরই উপকরণ এনে দিয়েছেন। পাল রাজারা অন্তত তিনবার তাঁদের রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন,—ধর্মপালের সময়, মহীপালের সময় এবং রামপালের সময়। রামপালের সময় আনুমানিক ১০৭৭ থেকে ১১২০ খ্রীষ্টাব্দ। রামপালের রাজত্বকালেই রাঢ়ে সেন রাজবংশের পত্তন হয়েছে।

তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ ১০৫৫-১০৭০) যখন গৌড়-মগধের রাজা, তখনই বৈদেশিক আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিগ্রহপালের তিন পুত্র—দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হয়ে, তাঁর দুই ভাই রাজ্যের অন্তর্বিপ্লবে যুক্ত এই সন্দেহে, দুজনকেই কারারুদ্ধ করেছিলেন। এদিকে বরেন্দ্রভূমির সামন্তরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হল। সেই যুদ্ধে মহীপাল নিহত হলেন। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কৈবর্তজাতীয় নায়ক দিব্য। তিনিই হলেন রাজা। রামচরিতে দিব্যকে বলা হয়েছে দস্যু। সেখানে 'দিব্য'-র নাম দিব্বোক। মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় শূরপাল কিছুকাল রাজত্ব করেন। শূরপালের পর রাজা হন রামপাল। রামপাল যখন রাজা হন তখন পালরাজ্য ছিন্নভিন্ন। তাঁর অধিকারসীমা সম্ভবত তখন খুবই সংকীর্ণ—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান, সেটুকু ছিল ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত ব-দ্বীপ মাত্র। রামপাল রাজা হয়ে তাঁর পিতৃভূমি উদ্ধারে উদ্যোগী হলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমিকেই বলেছেন পালরাজাদের পিতৃভূমি—'জনকভূ'। রামপালের পিতৃভূমি উদ্ধারই রামচরিতের মূল বিষয়। তাঁর এই যুদ্ধোদ্যম মহাকাব্যেরই উপযুক্ত বিষয়। এতে রামপালের

যে সংগঠন ক্ষমতা, ধৈর্য, রণনৈপুণ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা বাঙালিমাত্রেরই গর্বের বস্তু।

কৈবর্তগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। রামপাল তাদের প্রথমে এঁটে উঠতে পারেন নি। তারপর তিনি সামন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। যাদের সৈন্যসাহায্য নিয়ে রামপাল বরেন্দ্র আক্রমণ করেছিলেন রামচরিতে তাদের নাম আছে। মোটামুটি তারা মগধ ও রাঢ় দেশের। রামপালকে বিশেষ সাহায্য করেছেন তাঁর মামা রাষ্ট্রকূট-তিলক মথন। তাঁর দুই পুত্র কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ ছিলেন রামপালের প্রধান সহায়ক। অতঃপর রামপাল দক্ষিণ দিক থেকে গঙ্গা পার হয়ে বিপুল সৈন্যসহ কৈবর্তরাজ ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম দিব্বোকের ভাই রুদোকের পুত্র। তখন উত্তরবঙ্গের রাজা ভীম। এই যুদ্ধে পরাজিত ভীমকে বন্দী ও পরে নিহত করা হয়।

বহুদিন পর রামপাল পিতৃভূমি ফিরে পেলেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি একটি নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন, তার নাম রামাবতী। রামপাল সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা রাজ্য জয় করলেন। পূর্বদিকে বঙ্গ ও কামরূপ, দক্ষিণে উৎকল ও কলিঙ্গ। রামপালের রাজত্বকালে কর্ণাটকদের প্রভুত্ব ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কিন্তু রামপালই তাকে বাধা দেন। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর সে বাধা আর ছিল না। ওদিকে বর্তমান উত্তরপ্রদেশে গাহড়বাল বংশীয় রাজাদের সঙ্গেও রামপালের যুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধে রামপালেরই জয় হয়েছিল বলে মনে হয়। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের রানী কুমারদেবী রামপালের মামা মথনের দৌহিত্রী। সম্ভবত মথনই বিবাহ সম্পর্ক ঘটিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়েছিলেন। মথন শুধু রামপালের মামা নন, তাঁর এতবড় শুভানুধ্যায়ী আর কেউ ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে রামপাল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপালদেবের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে রামাবতীতেই বাস করতেন। একবার তিনি যখন মুদ্গগিরি বা বর্তমান মুঙ্গেরে ছিলেন, তখন মামা মথনের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। এই সংবাদে শোকার্ত হয়ে রামপালদেব ব্রাহ্মণদের ধন দান করে গঙ্গাসলিলে আত্মবিসর্জন দিলেন। রামপাল বিয়াল্লিশ বছরেরও বেশি রাজত্ব করেন।

সত্যসত্যই রামপালের জীবনকাহিনী বড় বিচিত্র। এই বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আমাদের বাংলাদেশের এক বিপুল বিশাল রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এই ইতিহাসে আমাদের শিক্ষণীয়তা, গৌরববোধ করবার মতো ঘটনাসমাবেশ, স্মরণীয় চরিত্র-মাহাত্ম্য, বাঙালির রাজনৈতিক দক্ষতা,

আত্মত্যাগ, সাংগঠনিক ক্ষমতার এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। এই কাহিনী যিনি কাব্যে গেঁথেছেন সেই সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনের কাছে বাস করতেন। তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালদেবের সান্ধিবিগ্রাহিক ছিলেন। রামচরিত তাই পাথুরে প্রমাণের মতোই গ্রাহ্য।

তিন.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত রামচরিতখানা বাংলার একটি যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় মূলত ছিলেন ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসু গবেষক। তুর্কি বিজয়ের পূর্বেকার বাংলার জনজীবনের একটা ইতিহাস মোটামুটি আমরা তাঁর হাত থেকেই পাই। নেপাল যাত্রার ফলে তিনি বৌদ্ধ সহজিয়াতন্ত্রের যে পুঁথি আবিষ্কার করে এনেছিলেন, সেটা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসের শাশ্বত দান। কিন্তু ভাষা-সাহিত্য ছাড়াও পালযুগের জীবনের যে নিবিড় পরিচয় তিনি উদ্ধার করেছেন, তাকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলেছেন 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে।[৮] একাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গে ও বরেন্দ্রভূমির রাজনৈতিক আবহাওয়া, ধর্ম ও সমাজজীবনের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিবরণ রাস্তাঘাট জনপদ ও অন্যান্য ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক তথ্যগুলি ঔপন্যাসিক কাহিনী গ্রন্থনে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে।

বেণের মেয়ে উপন্যাসের 'মুখপাতে' লেখক বলছেন :

> 'বেণের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখন হইতেও চাই না। 'বেণের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙ্গলার সব ছিল। বাঙ্গলার হাতী ছিল,

৮. 'সেই চলমান মানব প্রবাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; অন্ততঃ তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক সাহিত্য রচয়িতারা সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেণের মেয়ে সে চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন'।—নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস', ১৩৫৬, পৃঃ ৫৩৩।

ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।..'

এই কথাগুলির মধ্যে লেখকের ক্ষোভ যাই ব্যক্ত হোক না কেন, এতে বাংলার অতীতের ইতিহাসজ্ঞানের যে অটলতা ধ্বনিত হয়েছে, হরপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব তাতেই ফুটে উঠেছে। যে জীবন তিনি এঁকেছেন সম্ভবত তার কোথাও মিথ্যা কল্পনা নেই। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' কিংবা 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে'—এসব প্রবাদ প্রবচনকে তিনি সেই ইতিহাস-কল্পনার কাজে লাগিয়েছেন। সত্যই এর সবকিছুই পাথুরে প্রমাণ নয়, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান আমাদের অতীত ইতিহাসের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন:

'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের যে প্রকৃত ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।'

হরপ্রসাদ বস্তুত বাংলার সেই ধ্যানকেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এই ধ্যান দেশের রাজনৈতিক জীবন নয়, সাংস্কৃতিক জীবন দিয়েই তৈরি হয়। 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস বটে কিন্তু এই উপন্যাস থেকে হিন্দু এবং বৌদ্ধসমাজের প্রকৃষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তখন দেশে বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রের প্রভাব, পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু হরপ্রসাদ দেখিয়েছেন তখনকার বৌদ্ধমত যাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত, তারা সমাজের নিম্নতর শ্রেণী। এই বৌদ্ধ সমাজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠেছিল চর্যাপদ এবং সিদ্ধাচার্যদের সম্বন্ধে জানতে গিয়ে। হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত চর্যাপদ এই উপন্যাসে নিপুণভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। তখন বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম আস্তে আস্তে বাংলাদেশে যে লৌকিক রূপ নিচ্ছিল, তার নিদর্শন বাংলার নানা বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান, গুরুসম্প্রদায় প্রভৃতিতেই প্রমাণিত। বৌদ্ধধর্মের এই অন্তিম অধ্যায়টি সম্বন্ধে হরপ্রসাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। পালরাজাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে বিদায় নেয়। তুর্কি বিজয়ের ফলে দেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল সেই কারণেই বৌদ্ধধর্ম আর এদেশে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পারল না। ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা হরপ্রসাদের এই মতটি সর্বজনস্বীকৃত নয় বটে, কিন্তু বাঙালির আচার অনুষ্ঠান লৌকিক ধর্ম-কর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনেক পূর্বতন ইতিহাসের ধারাকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। হরপ্রসাদ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন। বাঙালির সমাজ একটা মিশ্রসমাজ, বাঙালির ইতিহাস রচনা করতে এর সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করা দরকার।

আজকালকার প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা হরপ্রসাদের গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে

সন্দিহান। কিন্তু বোধ হয় হরপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের মূল মর্মটি আমরা ঠিক নির্ধারণ করতে পারিনি বলেই একথা মনে হয়। হরপ্রসাদের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ প্রচুর। কিন্তু তাঁর চেতনা বস্তুত নিবদ্ধ ছিল বাংলার ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ে মাত্র নয়, রাজবৃত্ত রচনাতেও নয়—জনসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ রচনায়। আজকাল দেশে লোকসংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক নানা পদ্ধতিও অবলম্বিত হচ্ছে। দেশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে রাজবৃত্তের চেয়ে লোকবৃত্তের উপরেই ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে। হরপ্রসাদ বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ঠিক এই পদ্ধতি না হলেও এই লক্ষ্য দ্বারাই চালিত ছিলেন।[১] প্রাচীন যুগের নানা পুথিতে প্রাপ্ত টুকরো তথ্যগুলি জোড়া দিয়ে তিনি বাঙালি জাতির ইতিহাসের রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল লেখার আগে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল থেকে ফিরে এসে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ '*Discovery of Living Buddhism in Bengal*.' বোঝা যায় মধ্যযুগে বাংলার দেবদেবী সমাকীর্ণ লোকধর্মের উৎস-সন্ধানে তিনি বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সেই প্রাচীন সংঘাতের যুগেই ফিরে গেছেন।

শাস্ত্রীমশায়ের এই প্রবণতাটি বোঝা যায় তাঁর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৯১৬) সম্পাদন সূত্রেই। সরহ, কৃষ্ণাচার্য, শান্তির সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাঙালি সমাজের সঙ্গে কীভাবে তাকে মিলিয়েছেন তার একটি দৃষ্টান্ত ঃ

> 'তেঙ্গুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।'

নাথগুরু গোরক্ষনাথ আগে বৌদ্ধ ছিলেন। নেপালীরা গোরক্ষনাথকে ধর্মত্যাগী বলে ঘৃণা করে, কিন্তু মীননাথকে পূজা করে। অথচ মীননাথ নাকি মাছ মেরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মীননাথের পুত্রের নামও মৎস্যেন্দ্রনাথ। বাংলার লোকধর্মের বিচিত্র ইঙ্গিত হরপ্রসাদের লেখায় ছড়িয়ে আছে। তিনি চেয়েছিলেন এইসব উপাদান সংগ্রহ করে বাঙালির পরিচয় উদ্ধার করতে। চর্যার ভূমিকাংশেষে তিনি বলছেন ঃ

১. এই লোকবৃত্তমূলক ইতিহাস রচনার পরবর্তী নিদর্শন দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' এবং সুকুমার সেনের 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী'। শাস্ত্রী মহাশয়ের চর্যাপদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নীহাররঞ্জন ও সুকুমার সেন ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র হরপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ হয়েও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কোনো সংস্করণেই চর্যার উল্লেখমাত্র করেন নি। এটা বিস্ময়কর।

'সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা-সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে তিব্বতীভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে।'

চার.

পালরাজাদের সময়ে বাংলাদেশে সমাজে সংস্কৃতিতে যেসব পরিবর্তন চলেছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে-সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলার ইতিহাসের সেই অজ্ঞাত দিকটি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সামাজিক ইতিহাস—দুই দিকই হরপ্রসাদ স্পষ্টতর করে দিলেন। এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস নিয়ে তাঁর অনুগামী গবেষকদের দল আরও কাজ করেছেন। পালরাজ্য ভেঙে পড়বার সময়ে পুথিপত্র নিয়ে বাঙালি ও মৈথিলিরা নেপালে চলে যান। ফলে বাংলার ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপকরণ সেখানেই সঞ্চিত হয়ে গেছে। এই ইতিহাসেই যে হরপ্রসাদের ঔৎসুক্য ছিল সবচেয়ে বেশি, তার প্রমাণ আছে সপ্তম ও অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণ দুটিতে। সপ্তম সম্মেলনের অভিভাষণে তিনি বলেন:

'তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে।'

হরপ্রসাদ তাই প্রাচীনতরকালে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। কালানুক্রমিক বাংলার ইতিহাস রচনা না করে তিনি বাঙালির এই গৌরবপূর্ণ কীর্তি ও কর্মের বিবরণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই আমাদের জাতি-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

বাঙালি জাতির উৎপত্তি সন্ধান করে একদা বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তখন আর্যগৌরব নিয়ে সকলে চঞ্চল। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের রীতি প্রয়োগ করেছেন, তারপর করেছেন সমাজ-বিন্যাস বিশ্লেষণ।

তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, বাঙালি বিশুদ্ধ আর্য নয় তবে ব্রাহ্মণরা আর্যই। আর্যেরা বাইরে থেকে বাংলায় এসেছে। এসে এখানে আদিম কয়েকটি অনার্য জাতির সান্নিধ্যে তাদের রক্তে মিশ্রণ ঘটল। এখন বাঙালি সমাজের উপরের স্তরে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত; নিম্নতর স্তরে বাঙালি অনার্য, মিশ্রিত আর্য ও বাঙালি মুসলমান। উনিশ শতকে ধারণা ছিল আদিশূরের পূর্বে এদেশে আর্যাধিকার ছিল না। 'আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না'।[১০] বঙ্কিমের পর এ বিষয়ের অনুসন্ধান আরও এগিয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু কুলশাস্ত্র থেকে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে ইতিহাস নির্দোষ নয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হর্নলে এ বিষয়ে একটি মত দিয়েছিলেন। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে দুই পর্যায়ে। প্রাচীনতর অভ্যাগতকে নবীনতর অভ্যাগতের দল বিতাড়িত করে ভারতের দূর অঞ্চলে হটিয়ে দেয়। বৈদিক সভ্যতা নবীনতর আর্যদের মধ্যেই জন্ম নেয়। এই তত্ত্বের নাম বহির্বর্তী আর্য ও অন্তর্বর্তী আর্যজাতির তত্ত্ব। গ্রীয়ারসন সাহেব এই তত্ত্বকে মেনে নেন। বহির্বর্তী আর্যরাই বাংলাদেশে এসে পড়ে। গ্রীয়ারসন যেটা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে স্থির করেছিলেন, নৃতত্ত্ববিৎ রমাপ্রসাদ চন্দ নৃতত্ত্বের বিচারে তাকেই মোটামুটি মেনে নেন।[১১]

হরপ্রসাদ বাঙালির উৎপত্তি এবং আর্যত্ব সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেননি। রমাপ্রসাদ চন্দের বই তখনও বের হয়নি। হর্নলে এবং গ্রীয়ারসনের অনুমানকে তিনি সমাজসংস্কৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে সমর্থন করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণে তিনি বলেছেন আর্যরা 'আবর্তে আবর্তে সরস্বতী তীর হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত' এসে উপস্থিত হয়েছে। 'আর্য আবর্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল' বলে তিনি মনে করেন। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের রাজা যশোবর্মদেবের কাছে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে চেয়ে পাঠানো হয় বঙ্গদেশ থেকে। তখন থেকেই এখানে ব্রাহ্মণধর্মের ভিত্তি স্থাপন হল। তারপরে প্রবল পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেন। তারপর হল মুসলমান বিজয়। মুসলমানরা বৌদ্ধমঠগুলি ধ্বংস করে ফেললে সমাজে আবার ব্রাহ্মণদের প্রভাব শুরু হল।

আর্য প্রভাব এদেশে ছড়িয়ে পড়বার আগেই বাঙালি একটি শক্তিশালী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এই সভ্যতার খণ্ড খণ্ড বিবরণ শাস্ত্রীমশায়

১০. 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'

১১. Ramaprasad Chanda, *Indo-Aryan Races, Part I*, 1916.

দিয়েছেন তাঁর সপ্তম এবং অষ্টম সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে। অষ্টম সম্মেলনের দীর্ঘ অভিভাষণটি 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' নামে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহমালায় প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীকালে। এই নিবন্ধটি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক অভিনব ধারণাকে ফুটিয়ে তোলে। তিনি বাঙালির কয়েকটি নিজস্ব সভ্যতা-নিদর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। এগুলি আর্যদের দান নয়। তিনি তো মনে করেন জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, আজীবক ধর্ম এবং তৈর্থিক মতগুলি আর্যজাতির ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ঋগ্বেদের যে আদর্শ আমরা পাই, তার সঙ্গে এইসব বৈরাগ্যমূলক ধর্মের পার্থক্য আছে। বঙ্কিম বলেছিলেন, আদিশূরের পূর্বে বাঙালির লেখা কোনো বই পাওয়া যায় না; হরপ্রসাদ বলেছেন, পালকাপ্যের হস্তায়ুর্বেদ পূর্বের রচনা। আর্যরা হাতি চিনত না, বাঙালিরা চিনত। এমনি করে হরপ্রসাদ বস্ত্রশিল্প, নৌ-চালনা, নাট্যকলা প্রভৃতি নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আবার অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বাঙালি কীর্তিরও নানা কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা কাল্পনিক কিংবদন্তীকেও হরপ্রসাদ ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলছেন, এখন যারা সিংহলে বাস করে এক কালে তারা ছিল বাঙালি। সিংহলের কিংবদন্তী দ্বীপবংসর সাক্ষ্য মেনে তিনি মনে করেছেন বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গনগরের রাজার ছেলে বিজয় নানা দেশ ঘুরে সিংহলেই অবতরণ করে বাঙালিকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সূত্রে বাঙালির নৌ-শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারেও তিনি গর্ববোধ করেছেন, দশকুমারচরিতে উল্লিখিত তাম্রলিপ্ত বন্দরটি বাঙালির নিজস্ব পরিণত সভ্যতার দৃষ্টান্ত। তিনি মনে করেন, তাম্রলিপ্ত কোনো সংস্কৃত শব্দ নয়, প্রাচীন শব্দ দামলিও। বাংলায় এক সময় দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকদের মতের সমর্থন যেন এতে মেলে। তামল হচ্ছে কোনো অনার্য জাতি। তারাই আর্যরা আসবার আগে এই নগরের প্রবর্তন করেছিল। এই তমলুক থেকেই জনৈক রাজকুমার জাহাজে এক রাক্ষসের দেশে উপস্থিত হন। সেখানে 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' এক রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। এই রাম বোধ হয় ইজিপ্টের রামেসিসের স্মৃতিবহ।[১২] বাঙালিরা যে সমুদ্রযাত্রা করে বহির্ভারতে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনে লিপ্ত ছিল, এটা হরপ্রসাদের কাছে

১২. এই ধরনের অনুমান অবশ্য আরও নানারকম হতে পারে। ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের *The Hindu Avatars* (1966) পুস্তিকাখানিতে রামেসিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা যোগ শব্দ সাদৃশ্যে অনুমিত হয়েছে।

বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। তমলুক থেকেই বাঙালিরা পূর্ব উপদ্বীপ চীন ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যেত। যখন লোকে লোহার ব্যবহার জানত না তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়ে বাঙালিরা নানা দেশে ধান চাল বিক্রি করতে যেত। সেই নৌকার নাম বালাম নৌকা। সেই নৌকায় যে চাল আসত তার নাম বালাম চাল। শাস্ত্রীমশায় বলছেন, 'বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে'।

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সন্ধানে হরপ্রসাদ নানা আভাস অনুমানকে অনেক সময়েই সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তার কিছু কিছু হয়তো প্রমাণনিষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবেন। তাঁর ভক্ত-শিষ্য যেমন বলছেন :

> 'হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইত না।'[১৩]

বস্তুত হরপ্রসাদের এই কল্পনাশক্তি আর একদিক দিয়ে দেখলে তাঁর চরিত্রের একটা বড় গুণ। এই কল্পনা স্বল্পপ্রাপ্য উপকরণকে বাংলার ইতিহাস রূপসৃষ্টিতে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। পালযুগ পর্যন্ত মোটামুটি চিত্র রচনা করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হলেও প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা তখনও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পূর্বেকার বাংলার ইতিহাস তখনও অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। হরপ্রসাদ তার কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বড় স্পষ্ট করেই বলেছিলেন :

> 'সমবেত বাঙ্গালী লেখকমণ্ডলী সেই সাহিত্যকে সৎপথে চালিত করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। পূর্ব্বগৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুঁথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্ত্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া এমনকি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নূতন নূতন কথা জানা যাইবে। বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে।

১৩. সুশীলকুমার দে, হরপ্রসাদ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ইষ্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী ১৯৬০, ভূমিকা।

বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিতান্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না।'

এই উদাত্ত কথাগুলি হরপ্রসাদ বলেন ১৯১৩-তে। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙালিকে আনন্দ চঞ্চল করে তুলেছেন। হরপ্রসাদের এই ভাষণেই তার সোচ্ছ্বাস বর্ণনা আছে। স্বভাবতই বাঙালির কীর্তি গৌরবের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি পড়ল। হরপ্রসাদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুনতর প্রেরণা। সম্ভবত তাঁরই আগ্রহে সেই সময়ে একটি বাংলার ইতিহাস রচনার আয়োজন হয়েছিল। ১৯১৬ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনালড্‌সের সচিব গুরলে সাহেব তিনখণ্ডে একখানি বাংলার ইতিহাস সংকলন করাতে উদ্‌যোগী হন।[১৪] এই উদ্দেশ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রাথমিক কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টা অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়। কেন তখন হয়নি জানি না, কিন্তু হরপ্রসাদের কল্পিত বাংলার ইতিহাস বাঙালি পায়নি।

জুলাই ১৯৭৬ ॥

১৪. প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৬০, পৃ ৭১.

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শাস্ত্রী মশাই-এর 'বাঙ্গালা ভাষা'

শাস্ত্রী মশাই-এর গদ্যরীতির যোগ্য আলোচনার পূর্বে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বাঙলা ব্যাকরণ সংক্রান্ত যে আন্দোলনের সূচনা হয়, যার নেতা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ—সেই আন্দোলনের মূলকথাটি বুঝে নেওয়া দরকার। শাস্ত্রী মশাই প্রথম বাঙলা ভাষার প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারটির উপর জোর দেন। কিন্তু ১৩০৫ সালেই 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' নামক সমালোচনামূলক প্রবন্ধে ঐ 'ভ্রম সংকুল' ব্যাকরণটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> ক. আমরা কেন বাংলা-ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলাভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।
>
> খ. লিখিত এবং কথিত বাংলার ব্যাকরণে প্রভেদ আছে।

১৩০৮ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাঙলা ব্যাকরণ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'বাংগালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধোত্তর সাহিত্য পরিষদীয় আলোচনা সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—'শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্তী হইবে ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্তী হওয়াই উচিত।' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাৎ ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন।' সংস্কৃতানুসারী বাঙলা ব্যাকরণ আর বাঙলা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ এই দুই মতের বিরোধের কালে অনেকেই

বলেছিলেন—লিখিত ভাষা কথিত ভাষার মধ্যে প্রভেদ যত কম থাকে ততই ভালো।

এই গদ্য-আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যটির সঙ্গে আধুনিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ইতিহাসটি মনে রাখতেই হয়। লিখিত সাহিত্যে গদ্যের অভ্যাস আমাদের উনিশের শতকের আগে ছিল না। নিভৃত ব্যক্তিগত পাঠের দিকেও আমাদের আগ্রহ ছিল না, নজর ছিল না। বাঙালি মধ্যবিত্ত আকারে প্রকারে প্রাথমিক স্পষ্টতা পেতে থাকলে গদ্যের চর্চা শুরু হয়েছে। এই চর্চা নতুন কালের সামগ্রী হল। জনমণ্ডলীর সামনে পাঠের ব্যাপারটা কোনো অর্থেই আর প্রাগুনবিংশ শতাব্দীর পাবলিক রিডিং থাকল না। সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে অন্নদার ভবানন্দ ভবনে পাঠ-গান আর সমবেত শ্রোতৃ-সুধীর সামনে সামাজিক বা সাহিত্যিক বিতর্কের উত্থাপন মূলে স্থূলে পৃথক—এবং সে পার্থক্য শুধু গদ্য-পদ্যের পার্থক্যই নয়—দুই কালের পার্থক্য। শ্রেণীর দুই ভূমিকার পার্থক্য।

কিন্তু 'মধ্যবিত্ত' কথাটি বড় গোলমেলে। অন্তত আমাদের দেশে। প্রথম থেকেই যে মধ্যবিত্ত এখানে আসর জাঁকিয়ে বসলেন, সে মধ্যবিত্ত একান্তভাবে ইংরেজি-শিক্ষা-উদ্ভূত মধ্যবিত্ত। সে কারণেই বাঙলার মধ্যবিত্তের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ কিছুতেই বুর্জোয়া সমাজের জাগ্রত মধ্যবিত্তের সঙ্গে তুলনীয় নয়। বাঙলা গদ্য, যা বাঙালি মধ্যবিত্তের নতুন জীবনের সাহিত্যিক অভিজ্ঞান, সে গদ্যের প্রাথমিক পদচারণার দিনে নিভৃত পাঠের ব্যাপারটি সেজন্য এত অবহেলিত। স্কুলের পাঠকক্ষ, বা সভাসমিতির বক্তৃতাকক্ষই সেদিন ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট। এমন কি নিবিষ্ট পাঠের উপযুক্ত রচনা, যেমন বিদ্যাসাগর মশায়ের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'ও অনেকটা address system বা ভাষণ পদ্ধতিতে লেখা। হুতোমের নকশায় কিছুটা ব্যক্তিগত নিভৃত পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ স্বীকৃত হয়েছে। তার কারণ হুতোমের অতি জাগ্রত সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং কলকাতাই বিকারের বিষয়ে সমালোচনাশীল মনোভাব।

আমরা আগেই বলেছি, এখানে প্রকৃত বুর্জোয়া শ্রেণীর অবিদ্যমানতায় মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত গঠন কদাচ সম্পূর্ণ হয় নি। English educational middle class এক ধরনের শহুরে এলিট শ্রেণীর রচয়িতা হয়েছে মাত্র। বাঙলা গদ্যের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে সেই এলিট শ্রেণীর মতোই গদ্যও চেয়েছিল একটা কোনো অথরিটির হাত ধরে চলতে। একদিকে সংস্কৃত অপর দিকে ইংরেজি—বাঙলা গদ্যের শব্দ-চয়ন ও বাগ্‌বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। গদ্য পড়া ও শোনা দুইই ছিল অনভ্যস্ত। তাই বোধ হয় একেবারে প্রথমদিকে কোনো কোনো

গদ্য লেখক গদ্য বাক্যকেও বৃথা অনুপ্রাস ঝঙ্কৃত করে মনোগ্রাহী করে তুলতে চেয়েছেন। যে প্রকরণ কবিতাতেই তখন মনে হচ্ছিল বস্তাপচা, তা আর কেমন করে এই নতুন সাহিত্য-মাধ্যমের সঙ্গে অন্বিত হবে? যিনি অনুপ্রাস পিপাসু তিনি ভারতচন্দ্রের যুগেই নিবদ্ধ। যিনি গদ্য পড়বেন এবং শুনবেন তিনি নতুন কালের মানুষ হবেন। সেই গদ্য লেখকরা নিজ শ্রেণীর যথার্থ ভূমিকা বুঝতে পারেন নি বলেই এক যুগের প্রকরণের সাহায্যে আর এক যুগের রুচির দাবি, মনের তাগিদ মেটাতে চেয়েছিলেন। এ পথ ছিল ভ্রান্ত। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় প্রথম এই দোষ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা দেখা যায়।

ইংরেজি-শিক্ষা-উদ্ভূত এই মধ্যবিত্ত তার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণেই অহঙ্কৃত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের এই নতুন মাধ্যমটি সম্বন্ধে তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা ছিলেন বিশেষ সচেতন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গলা ভাষা (লিখিবার ভাষা' প্রবন্ধের পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্য অপেক্ষা গদ্যই কার্যকরী।' বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে এখানে গদ্যের পক্ষে ব্রীফ ধরেছেন তাতে তখনকার আত্মপ্রত্যয়ী ভিক্টোরীয় যুবকের নিজ শ্রেণীর 'উন্নতি বাসনা'-ই বেশি ক্রিয়াশীল এবং সে উন্নতি বাসনাও পার্থিব সামাজিক উন্নতি বাসনা। এই উন্নতি বাসনাকে সামনে রেখেই সেদিন ছিল সামাজিক মধ্যবিত্তের সকল রকম পথ চলা।

অথচ এই ভিক্টোরীয় বঙ্গীয়েরা তাঁদের সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে যেমন স্থায়িত্ব বাসনাকেই নিজ শ্রেণীস্বার্থে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন—ভাষার বিষয়ে সেদিনকার স্বাধিক প্রশ্নেও তেমনি ভাষার স্থায়িত্বকে অধিকতর নিশ্চিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সে কারণে তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, ভাষার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে ভাষার বহতা ধারাটিকে একটি শক্ত পোক্ত খাতে ধরে রাখলে। তাই ভাষা সমস্যা সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের এই নির্দেশ অনিবার্য: 'সকলেই উচ্চারণ করে খেউরী। কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই খেউরী শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরী প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষায় স্থায়িত্ব জন্মে।' কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কান ছিল পরিষ্কার, রুচিও শীলিত। তাই তিনি ঠিকই ধরেন, 'হে ভ্রাত বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; ভাইরে বলিয়া যে ডাকে তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে।'

বঙ্কিমচন্দ্র-হরপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথ সকলেই একটা বিষয়ে স্থির-মত হয়েছিলেন যে, লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে প্রভেদ যত কমে তত ভাল। কিসের ভালো? এই প্রশ্নের উত্তরে বোধহয় ততটা মতৈক্য আশা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল বক্তব্যকে বিপুলতর পাঠক-গোষ্ঠীতে পৌঁছে দেওয়া। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যে তারই সমর্থন মেলে। রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে আর একটু অন্য কথা বলেছেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটি ছিল বাঙলা ভাষার অনন্যতা, তার নিজস্বতার রূপটি সাহিত্যের এলাকার মধ্যে নিয়ে আসা। এর জন্য তিনি তুলনামূলকভাবে ব্যাকরণ পড়াশুনাও করেছেন। শাস্ত্রী মশাইও যে বাঙলা ভাষার এই স্বতন্ত্র গতি প্রকৃতি বিষয়ে সজাগ ছিলেন 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। ১৩০৮ এর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার কুড়ি বছর আগে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা বঙ্গদর্শনেই শাস্ত্রী মশাই প্রথম বাঙলা ভাষার একটি সমস্যার দিকে সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, 'লিখিত বাঙ্গালা ও কথিত বাঙ্গালা এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না।' ইংরেজি-শিক্ষা-উদ্ভূত যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা আমরা বর্তমান আলোচনায় বারে বারে উল্লেখ করছি, শাস্ত্রী মশাই তার বিষয়েও সচেতন ছিলেন, 'কিন্তু তাঁহাদের (গ্রন্থকারদের) সময়ে শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রভাব কিছু অতিরিক্ত প্রমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই কয় বৎসরের মধ্যে ইংরেজীর অতিরিক্ত চর্চা হওয়ায় বহু সংখ্যক ইংরেজী শব্দ ও ভাব বাঙ্গালাময় ছড়াইয়া পড়ায় বিষয়ী লোকের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা আর নির্ণয় করিবার যো নাই।' 'চলিত শব্দ সকল' পরিহার করায় ভাষার যে অপকার হয়েছে তার মূলে ছিল মধ্যবিত্ত-বিকার। শাস্ত্রী মশাই সে বিষয়েও সজাগ ছিলেন—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনাদিতে যে ইংরেজী, পারসি, বাঙলা ও সংস্কৃতময় ভাষায় কথাবার্তা চলে তাকে তিনি বিদ্রূপই করেছিলেন। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, এই মনস্বী সমস্যাটিকে মূলে ছুঁলে ধরতে পেরেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাববার বিষয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্যকে তার যথাযথ ভূমিকায় দাঁড় করানোর জন্য যে তিনজন ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই সংস্কৃত-শিক্ষা ধারার সন্তান—বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর এবং শাস্ত্রী। সেই সময়ে বাঙলা ভাষার, তথা গদ্যের রূপটি কী হবে এ চিন্তায় যাঁরা উদ্দীপনা যুগিয়েছিলেন শাস্ত্রী মশাই অবশ্যই

তাঁদের অন্যতম। বিদ্যাসাগর-এর সঙ্গে হরপ্রসাদের পার্থক্যটিও এ ক্ষেত্রে অনুধাবনীয়। বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার উন্নতি বিধানে সংস্কৃত কলেজকে নেতার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর—It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.[১] —এও কিন্তু সেই বিচিত্র এডুকেশনাল মিড্‌ল ক্লাসের অথরিটি নির্ভর পথান্বেষা। পক্ষান্তরে শাস্ত্রী মশাই খুঁজছিলেন অন্যপথ। তিনি পীড়িত বোধ করেছিলেন সাহিত্যের ভূমিকা-বিচ্যুতিতে এবং তজ্জনিত সংকটে,—'সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহু সংখ্যক সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।'[২] ১২৮৪ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ শাস্ত্রী মশায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের চার বছর আগে ক্যালকাটা রিভিউতে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ই ছিলেন শাস্ত্রী মশাই-এর গদ্যের গুরু। শাস্ত্রী মশাই যখন প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই বলে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, 'আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।' তাতে বঙ্গদর্শন সম্পাদক বলেছিলেন, 'ওঃ! তাই বটে। নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গালা বাহির হইবে না।' বঙ্কিমচন্দ্র মতানৈক্য সত্ত্বেও শ্যামাচরণ বাবুর প্রবন্ধটিকে উৎকৃষ্ট বলে ঘোষণা করেন। বাঙলা ভাষার স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসের ইতিবৃত্তে প্রবন্ধটি উল্লেখ্য এই কারণে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিকে উদ্দীপিত করেছিল শ্যামাচরণ বাবুর প্রবন্ধটি। শ্যামাচরণবাবু প্রস্তাব দিয়েছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই আমার জানা—তৎসম শব্দের যে সব ক্ষেত্রে তদ্ভবরূপ চালু হয়ে গেছে, সে সব ক্ষেত্রে আর তৎসম শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। 'ভ্রাতা', 'মস্তক' ইত্যাদির জায়গায় 'ভাই', 'মাথা' এসবই লিখতে হবে।[৩] গত শতাব্দীতে একবার তা হলে এ প্রস্তাব উঠেছে, এবং এ

১. Notes on Sanskrit College, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ ৪৪৫।

২. বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৮

৩. কবি বুদ্ধদেব বসু এই শতাব্দীর চারের দশকে 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের ক্রোড়পত্রে (অধুনা বর্জিত) ঠিক এই রকম প্রস্তাব দিয়েছিলেন—"প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু...বলবো না...কিন্তু 'স্বতঃ' 'রথ' বলতে দোষ নেই।"

শতাব্দীতেও উঠল। দুবারই এই প্রস্তাবের পরিণতি ঘটল একই। ভাষার একটা মজা এই যে, সে কোনো কিছুই আর অর্জনের পর বর্জন করতে পারে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে এখানে মনোযোগ দিতে পারি আমরা—শ্যামাচরণ বাবু ভাষার কথ্যচাল ও মৌখিক ছাঁদটিকে খুঁজছিলেন। এবং, এই অন্বেষা বুঝি বা একটা স্থিরাদর্শের খানিকটা সন্ধান তখন পেয়েছিল, শাস্ত্রী মশাই যখন 'বিশুদ্ধ বাংগালা' কী ছিল তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন: 'ভট্টাচার্য্য' ও কথকদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও কতক কতক নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোক এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, সেরূপ নির্ণয় করাও সহজ নহে। গ্রন্থকারদিগের বাংগালা বাংগালা নহে। বিশুদ্ধ বাংগালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।' মনে হয় যে ভাষায় বাঙলা চিঠিপত্র লেখা হত, কথক ঠাকুররা কথকতা করতেন তাকেই শাস্ত্রী মশাই বিশুদ্ধ বাঙলা বলতে চাইতেন।

এই গদ্য কথ্য গদ্য। চিঠির ভাষা লৈখিক ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও কথ্য ছাঁদে রচা। শাস্ত্রী মশাই নিজে যে গদ্যশৈলীর চর্চা করে গেছেন তা-ও এই কথ্য গদ্যের চালে। আচার্য সুনীতিকুমার হরপ্রসাদ রচনাবলীর (প্রথম সম্ভার, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি) সম্পাদকীয় ভূমিকায় শাস্ত্রী মশায়ের গদ্য-শৈলীর গুণ নির্ণয়ে তাঁর গদ্যের প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতার মূল নির্দেশ করেছেন শাস্ত্রী মশায়ের সংলাপ রসিকতায়। এ বিচার অবশ্যই মান্য। কিন্তু এটা বোধ হয় কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়। অধ্যাপক পরিবারের উত্তরাধিকারেই এ গুণ বর্তিয়েছে হরপ্রসাদেও। নৈহাটির বাসিন্দা হিসাবে বর্তমান নিবন্ধকার মাঝে মাঝে প্রাচীন নৈহাটি চর্চায় একথাও জেনেছেন যে এককালে এখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে কথকতার আদর-কদর ছিল খুবই। শাস্ত্রী মশাই নিজেই সে সময়ের কাঁটালপাড়ার একটি স্মৃতিচিত্র এঁকে রেখে গেছেন। নৈহাটি-কাঁটালপাড়া-ভাটপাড়ার সংস্কৃত শিক্ষার ধারা এই কথকতার আসরকে পুষ্ট করেছে নানা-ভাবে। কথককেও মনোরঞ্জনী বাগ্‌বিন্যাস জানতে হত।[৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্তরঙ্গ বাগভংগী তাঁর নিজস্ব বিষয়াধিকার—কিন্তু এর ভিত্তিভূমিতে তাঁরই কথিত 'বিশুদ্ধ বাংগালা'-র উপলব্ধি অস্বীকার করা চলে না। তিনি যেন এই বিষয়ী বাঙলাকেই খুঁজে পেতে ঘষে মেজে নতুন করে নিলেন।

●

৪. "তখন আমার বয়স বছর এগার, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দু'চার দিন ধরণীকথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম···ধরণীকথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়।

তাঁর ব্যক্তিত্ব শুধুই নৈয়ায়িক বংশজাত যুক্তি তর্কের ব্যক্তিত্ব নয়। বরং বিস্মিত হতে হয় তাঁর অন্য-নিরপেক্ষ আত্মবিশ্বাসে। শাস্ত্রী মশাই-এর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্যের কাছে আমি শুনেছি যে, শাস্ত্রী মশাই বাঙলাদেশের অন্য কোনো টোল থেকে উপাধি নিতে চাইতেন না। 'আমরাই তো উপাধি দিয়ে এসেছি, আমরা আবার নেব কি'—এই ছিল তাঁর ভাব। ভারত মহামণ্ডলের দেওয়া 'প্রত্নতত্ত্বরত্নাকর' উপাধি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি—ব্যবহারও করেন নি। বিদ্যাসাগরের মতো তাঁরও এ আত্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্যবোধ একই সঙ্গে সহজাত ও অর্জিত। তাঁর গদ্য তাঁর সেই অর্থরীটি-বিমুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি সত্তার দান। সে শৈলীর গূঢ় রহস্য সেই ব্যক্তিসত্তার মধ্যেও অনুসন্ধেয়। একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ না করে পারি না। 'রঘুবংশের গাঁথুনি' বলে প্রবন্ধটি রচনার একটা ইতিহাস শাস্ত্রী মশাই নিজেই দিয়েছেন। একদিকে টোলের পণ্ডিতদের রঘু-অবজ্ঞা 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্', অপর দিকে বঙ্গদর্শন স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের রঘুবংশ বিষয়ে সুদৃঢ় প্রত্যয়—'রঘু কাঁচা হাতের লেখা'—এই দুই বিন্ধ্য হিমাচলের মাঝখানে শাস্ত্রী মশাই রঘুর উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ অনুভূতি ও অভিমতকে লালন করেছেন ও দাঁড় করিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরস্কারও তাঁকে দমাতে পারে নি। এই প্রবন্ধটাই গোটা শাস্ত্রী মশাই মানুষটা। তিনি প্রতিবাদকে কখনও উত্তপ্ত করে তোলেন না, সমর্থনকে কখনও আবেগ চঞ্চল করেন না। তিনি নিজে যেমন, তাঁর গদ্যও তেমন—সপ্রাণ অথচ নিরুচ্ছ্বাস।

সঙ্গে সঙ্গে উচ্চার্য, তাঁর সংস্কার-বিমুক্ত উদারতার প্রসঙ্গ। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সম্বোধনে তিনি বলেছেন: 'বাঙ্গালায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিতমহাশয়েরা তাহার তর্জমা করিলেন পর্যবেক্ষণিকা। কথাটা একে ত' চোয়াল ভাঙ্গা,তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অতশত বুঝে না—তাহারা উহার নাম রাখিল তারা ঘর। মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে চালাইতে দোষ কি?' শুধু হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের ভাষাকে পাঙক্তেয় করার জন্য তাঁর আগ্রহই লক্ষণীয় নয়, তাঁর সংস্কৃত জড়তা থেকে মুক্ত, নাগরিক বিকার-শূন্য কবিত্ব-গ্রাহক প্রবৃত্তিটিও উল্লেখযোগ্য। আর সেই হরপ্রসাদী রসিকতা। যা অবলীলাক্রমে প্রতিপক্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলত, কিন্তু দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তিও হাস্য সম্বরণ করতে পারত না—যেমন, 'একজন সেদিন বড় রাস্তাকে রাজমার্গ ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে বংশ পরিচালনা লিখিয়া বড়ই

বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।' লক্ষ করার বিষয়, শাস্ত্রী মশাই বড়রাস্তাকে রাজপথও বললেন না। এসব রসিকতাও উচ্চারিত হয়েছে পরম নিরাসক্ত চিত্তে। প্রকৃষ্ট রচনা-শৈলীর মূলে কথা হল নৈর্ব্যক্তিকতার সংগে ব্যক্তিকতার সমন্বয়। স্টাইলের বড়কথা এই যে, সে ব্যক্তিত্ববাচক হয়েও 'ব্যক্তিগততা' থেকে মুক্ত। শাস্ত্রী মশাইয়ের গদ্যেরও প্রধান গুণ এটাই। তাঁর অনুভব, চিন্তা এবং ব্যাখ্যা যে মানস পরিস্থিতিতে জাত ও বিকশিত, তার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর গদ্যে। তাই তা বিচারশীল (judicial) আধুনিক গদ্য হয়েও আশ্চর্য ভাবে সংবেদনশীল। মেঘদূতের একালের আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু উত্তর মেঘের ১০৪ সংখ্যক শ্লোকে যক্ষ-পত্নীর কাছে নিবেদিত যক্ষের প্রশ্নটিকে ('ভালো আছ তো') বলেছেন, 'একজন নীতিজ্ঞ জড়বাদীর' প্রশ্ন। বুদ্ধদেব বসু আরো জানিয়েছেন তাঁর সুন্দর ভূমিকায়—'হে বন্ধু আছ তো ভালো?' (বুদ্ধদেব বসু এই পঙক্তিটিকে চমৎকার বলেন, 'মেঘদূতের প্রতিধ্বনি')—'স্বপ্ন' কবিতার 'রবীন্দ্রনাথের (এই) প্রশ্নের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে এক জন্ম-জন্মান্তরের বেদনা, যা হৃদয়ের মধ্যে অনবরত উত্থিত হয় কিন্তু কোথাও যার উত্তর নেই।'[৫] বুদ্ধদেব বসুর এই তৌল বিচারে কোনো ভুল থাকতে পারে না। শুধু আমরা যারা শাস্ত্রী মশায়ের কাছাকাছি আছি, আমরা ভুলতে পারি না, ব্যাপারটি বিগত শতাব্দীতেও শাস্ত্রী মশায়ের কাছে 'নীতিজ্ঞ জড়বাদী'র প্রশ্ন বলে প্রতিভাত হয়নি। তিনি লিখছেন:

> 'তুমি কেমন আছ? এ কথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া থাকি। সুতরাং এ কথাটিতে অনেক পাঠক কোন নূতনত্ব দেখিবেন না। কিন্তু যে প্রণয়ী, যে কখনও পরের জন্য ভাবিয়াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদের সময়ে যাহার হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, সে-ই জানে—তুমি ভাল আছ?—এই কথার মর্ম্ম কত গভীর।' —মেঘদূত।

প্রশ্নটির 'গভীরতা' বিষয়ে শাস্ত্রী মশাই কৃতনিশ্চয় হয়েছিলেন—এবং এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে স্পর্শ করেন নি, তার প্রমাণ হল 'কল্পনা'র অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতাটি রচনার দিনাঙ্ক ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ৯ জ্যৈষ্ঠ। আর শাস্ত্রী মশাইয়ের 'মেঘদূত' আলোচনা বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছে ১২৮৯-এর অঘ্রাণ, পৌষ ও ফাল্গুনে। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রী মশায়ের গদ্য-শৈলী চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছেছে। তাঁর অক্লান্ত অন্বেষা, বিপুল

---

৫. বুদ্ধদেব বসু, "সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত", কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, ১৯৫৭ পৃ. ৪৮

অধ্যয়ন ও অম্লান মনন শক্তির প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে নানা কাজে। তা গবেষকদের সংপদ।[৬] কিন্তু তাঁর সমস্ত রসবোধ, তাঁর সমস্ত অন্তরঙ্গতা, যা কিছু আলাপী কুশলতা সবই যেন একত্র হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায়।

শাস্ত্রীর যে ছবিটি 'হরপ্রসাদ রচনাবলী'তে দেওয়া হয়েছে, আর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের যে ছবিটির সংগে আমরা এতদঞ্চলের লোকেরা পরিচিত, তা মিলিয়ে দেখলে তাঁর গদ্যের ছবিটি টের পাই। নৈয়ায়িক নাসিকা—যা আগ্রহ এবং মানসিক আভিজাত্যের চিহ্ন; তীক্ষ্ন চোখ, কিন্তু কোমলতার আভাস সেখানে নিত্য বিদ্যমান, চোখদুটো আপাত পরিহাসে কিংবা অবিশ্বাসে ঝিক্ মিক্ করতে পারে—কিন্তু দেখতে চায় গভীরকে। চিবুক, প্রথমে যা ছিল ঈষৎ একগুঁয়েমিতে ভরা—পরে তাই হয়ে উঠল প্রত্যয়ের প্রতীক। তাঁর গদ্যে কি আমরা এই ব্যক্তিটিকেই প্রতিবিম্বিত দেখি না? একটা সজাগ মন কান পেতে শুনেছিল সকল সামাজিকের বহতা কথাস্রোতের প্রাণময় কলধ্বনি। কেউ সেখানে আপাঙক্তেয় নয়—হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান, ওড়িয়া, মৈথিলি, পাহাড়ি সকলের কাছ থেকেই নেবার থাকতে পারে—ইংরেজি আর সংস্কৃতই শুধু দাতা নয়। ভাষা ব্যাপারে এই গণতান্ত্রিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সুহৃদেরই যোগ্য। এ শুধুই গদ্যরীতির ক্ষেত্রে উপযোগবাদ নয়।

হরপ্রসাদ 'শরৎনাথ' থাকা পর্যন্ত গৌরীভা-নৈহাটি-কাঁটালপাড়া-ভাটপাড়া-মুলাজোড় প্রায় পঞ্চ গ্রামের মতো গ্রামীন সূত্র-শৃংখলায় গ্রথিত ছিল। আজকের নৈহাটি ছিল একটি বড় ধরনের গ্রাম। গ্রাম দেবতা পঞ্চানন এবং পাড়াগুলির প্রাচীন বিন্যাস তখনও ক্ষয় পায় নি—চুনুরি পাড়া, শাঁখারিপাড়া, কুমোরপাড়া, মিত্রপাড়া, বাড়ুজ্জেপাড়া এখনো এখানে প্রবীণদের কাছে পাড়া পরিচয়।[৭] একটা গ্রামীণ সংস্কৃতি-জীবন তখনও শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ে নি।[৮] 'শরৎনাথ'-এর বাক্‌রীতি-গঠনে এই বাঙ্ময় জনপদের দান কতটা তা অনুসন্ধেয়। এতদঞ্চলের আমরা সবাই ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের প্রভাবেই অনেক সময় 'মতো' বোঝাতে 'ন্যায়' শব্দ ব্যবহার করি। শাস্ত্রী মশাই এই প্রয়োগটির প্রতিও কিছুটা পক্ষপাত দেখিয়েছেন। বাক্যের পূর্ণ গঠনে অনেক সময় প্রান্তিক সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাদ দিলে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় চলিত রীতির কাছাকাছি,—শাস্ত্রী মশায়ের কান ছিল সে-বিষয়ে আধুনিকের মতোই সচেতন।

---

৬. অনিলকুমার কাঞ্জিলাল, "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী", ভারতকোষ ৫ম খণ্ড।

৭. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। এবং আমার এখানকার অভিজ্ঞতা।

৮. বলরাম সেন, শ্রুতি ও স্মৃতি (১৮৫৮, ১৯১৫)—মনোনীত সেন সম্পাদিত।

'বাল্মীকির জয়'-এর শুরু এই : 'বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল—সুনীল—গাঢ় নীল—বর্ণনার অতীত নীলরঙের ছটার মাঝে বড় বড় তারা জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। ...উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ ; যেখানে এই দুইয়ে মিশিয়াছে সেখানে বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই প্রকাণ্ড চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।' 'বাল্মীকির জয়'-এর শেষ এই : 'বাল্মীকি দেখিলেন সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান কনককুণ্ডলধারী কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুঃ শঙ্খ চক্রধারী মুরারী বিরাজ করিতেছেন। ...বাল্মীকি অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক বক্তু, অনেক নেত্র, দংষ্ট্রাকরাল অনন্তরূপ দেখিলেন।' শুরুর সহজ সাবলীলতা পথ ছেড়ে দিয়েছে শেষের সুগম্ভীর সাধু রীতিকে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমগ্র জীবনের গদ্যচর্চা অন্যকথা বলে। শুরুতে তা ছিল এই : 'হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বর পরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকীদিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গ সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।' - (ভারত মহিলা)। শ্লথ গতি, ভারাক্রান্ত এই গদ্য তার সব জড়িমা, সব সংকোচ, সব পূর্বানুবৃত্তি পরিহার করে পরিণতিতে পৌঁছে পেয়েছিল এই শ্রী ও লাবণ্য : 'রাজা পুরুরবা চাঁদের নাতি। বুধের ছেলে। তাহার মায়ের নাম ইলা। সুতরাং মানুষ হইলেও দেব অংশেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ। সে জ্যোতিতে কখন জোয়ার-ভাটা নাই। তাঁহার এত বয়স হইয়াছে। তিনি এত দেশ জয় করিয়াছেন—একটা মহাদেশের সমস্ত তাঁহার মাথার উপর। কতবার তিনি দেবতার হইয়া অসুরদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মুখখানি দেখিলে মনে হয়, তিনি এখন ১৮ ছাড়িয়া ১৯-এ পড়েন নাই।'—(উর্ব্বশী বিদায়)। এটাকেই বলা যাবে শাস্ত্রী-শৈলী। এখানে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠস্বর।

শাস্ত্রী মশায়ের এই গদ্যরীতি আলোচনাকালে 'রীতি' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করেছি তা বলে রাখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা (লিখিবার ভাষা ' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে বলেন—'এই রীতি অবলম্বন) করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী শব্দৈশ্বর্যে পুষ্টাএবং সাহিত্যালংকারে বিভূষিতা হইবে, 'তখন তিনি 'রীতি' বলতে অংশত আদর্শ এবং অংশত সাধারণ পদ্ধতি বা common style-এর কথা বলেছেন। শাস্ত্রী

মশায়ের গদ্যরীতি আলোচনাকালে আমরা ব্যক্তিগত গদ্য-রীতির দিক থেকে বিষয়টি বুঝতে চাই। ব্যক্তিগত গদ্য-রীতির সাফল্যের মূলে থাকে দুটি বৈশিষ্ট্য —এক. লেখকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং দুই. বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য। বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য বলতে যেখানে বিষয়ানুভূতির স্বাতন্ত্র্যও বোঝায়—সেই অর্থে সেখানে সেটাও হয়ে ওঠে বিষয়ীর স্বাতন্ত্র্য। শাস্ত্রী মশায় সাধারণত যে গদ্য লিখতেন তা functional prose হতে গিয়েও হয়নি। হয়নি যে, তার কারণ খুঁজতে হয় তাঁর তথ্য-নিষ্ঠ যুক্তিশীল ব্যক্তিত্বে। তাঁর উপন্যাস গল্পগুলির মধ্যে সমকালবর্তী বিষয়ের পরিমাণ কম। প্রবন্ধ ক্ষেত্রেও তিনি নিজকালের ভাষা-ব্যাকরণ-সমস্যা ছাড়া অন্য কোনো সমস্যায় বিশেষ প্রবেশ করতে চাইতেন না। পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন বিষয়েই তাঁর হাত খুলত ভালো, মন বসত বেশি। এবং সকল ধরনের প্রবন্ধেই তিনি যে গদ্য-রীতি আশ্রয় করেছেন তাকে বলা যায় ব্যাখ্যাধর্মী বা বিবরণধর্মী গদ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধ যেমন যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা, সেখানে যেমন তুলনায়, বিশ্লেষণে, স্বীয় কল্পনার আলোকসম্পাতে 'উত্তর চরিত' হয়ে উঠেছে প্রতিভার দান, হরপ্রসাদের সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় তা আশা করা যায় না। তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক অনবদ্য প্রবন্ধগুলি মূলত ব্যাখ্যাকর্ম। তার গুণও এটা, সীমাবদ্ধতাও এটাই। মননের দীপ্তি এখানে খেলে কম।[১]

কিন্তু ব্যাখ্যাকর্ম হলেও এটা অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা। 'মাস্টারি' বা 'পণ্ডিতী' ব্যাখ্যা নয়। সখা সম্মিত ব্যাখ্যা। তাই তার ছন্দে আছে লৌকিক কথ্য-ছন্দের লাবণ্য। তার লয়ে আছে সহৃদয় সামাজিকের ধীরতা। তার কথার সুর স্বর একান্তভাবেই বাঙালির সুর স্বর। এই সুর-স্বরের জন্য বাঙালিকে কারো স্বারস্থ হতে হয় না। শাস্ত্রী অবলীলাক্রমে লিখেছেন 'জিঁয়াচ পোয়াতি', লিখেছেন 'হিমালয় যেমন বর কনেটি ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই', লিখেছেন 'সংসারে যে পান থেকে চুণ খসিবার জো নাই', লিখেছেন 'পাঁপোর ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়,' লিখেছেন, 'কালিদাসের নাটকে মেয়ে দেখানর বেশ একটা কায়দা আছে' এবং এ উদাহরণ-মালা ক্রমশই লম্বা করা চলে। অথচ বাণভট্ট বা রবীন্দ্রনাথের সংগে তুলনীয় না হলেও শাস্ত্রী মশায়ের ছিল একটি জীবনের ঐশ্বর্য সচেতন বর্ণানুভূতি। 'উর্বশী বিদায়ে'র প্রথম অনুচ্ছেদটি স্মরণীয়। সে অনুভূতিও তিনি প্রকাশ করেন তাঁর 'বাঙালা'য় ঃ 'আজ আকাশে মেঘ নাই, পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদ পূব দিকে

১. শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

হইতে উঠিতেছে আর যেন নির্জলা দুধের মত শাদা আলোয় পৃথিবীকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভরা গঙ্গার শাদা জলের উপর দুধ ঢালা—যমুনার কাল জলের উপর দুধ ঢালা। যমুনার কাল রং ডুবাইয়া দিয়া যেন শাদা রংয়ের ঢেউ উঠিতেছে। মারবেলের বাড়ীর উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—যেন সব বাড়ীটীকে দুধে নাওয়াইয়া রাখিয়াছে। মারবেলের ছায়া গঙ্গার জলে পড়িয়াছে, ছায়া হইলে কি হয় সেও যেন শাদা হইয়া গিয়াছে।'

যদিও আমরা বুঝতে পারি না 'সাহেবী বাঙ্গালা' বিষয়ে শাস্ত্রী মশায়ের সতর্কতার আতিশয্য, বুঝতে পারি না কেন তিনি 'হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান'—এই বাক্যকে সাহেবী বাংগালা বলবেন, তবু 'খাঁটি বাঙলা' কথাটির যদি কোনো মানে থাকে—তবে সে খাঁটি বাঙলা এই। এবং লক্ষণীয়, 'বাল্মীকির জয়'-এর বাল্মীকির মতোই এ গদ্যেরও কোনো অভিমান নেই। তন্নিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যেই এ গদ্য নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে—তাতে তার স্রষ্টারই ছায়া। এটাই শাস্ত্রী মশাই-এর বিশুদ্ধ বাঙলার প্রধান কথা।

ডঃ ভবতোষ ভট্টাচার্যের কাছে গল্প শুনেছিলাম, কোনো বিদগ্ধ সমাবেশে জনৈক য়ুরোপীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খোঁজ করেছিলেন 'হোয়্যার ইজ দি শাস্ত্রী'—এই বলে। 'দি' আর্টিকেলের এমন অপূর্ব প্রয়োগ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেই মানাত।

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাঙলা গদ্যের ঐতিহ্য এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এক.

ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধান যে কোনো দেশের রেনেশাঁস বা নবজাগরণের মর্মবস্তু। কিন্তু সে ঐতিহ্য প্রাণবন্ত, মুক্তিবহ তথা ভবিষ্যৎ বিকাশের অনুকূল না হলে সেই সন্ধান নতুন সৃষ্টির প্রাণশক্তি অর্জনের সুযোগ পায় না। আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালির নবজাগরণের মূল কেন্দ্র ফ্লরেন্সের হিউম্যানিস্টদের মধ্যে তার দুটি ধারা লক্ষ্য করি। একটি ইতালির স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের ইতিহাসের গৌরবে সামাজিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন, নিস্পৃহ, প্রাজ্ঞের জ্ঞানচর্চার নিরংকুশ মহিমায় বিশ্বাসী, ল্যাটিনের আভিজাত্যের অন্ধ অনুগামী এবং স্বভাবতই দেশজ ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা পরায়ণ। দ্বিতীয়টি, সীজার তথা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে রোমান রিপাবলিকের ও স্বাধীনতার ঐতিহ্যে ফ্লরেন্সের ইতিহাসের মূল সন্ধানে আগ্রহী, পারমার্থিক সার্থকতা অপেক্ষা ঐহিক জীবনের বিকাশেই অধিকতর আস্থাবান। সমাজজীবন থেকে বহুদূরে অবস্থিত নির্জন প্রকোষ্ঠে নয়, সামাজিক দায়িত্ব পালনেই পাণ্ডিত্যের সার্থকতাসন্ধানী, Volgare অর্থাৎ ইতালির দেশজ ভাষা ও তার ঐতিহ্যের অনুরাগী। এই মানসের একটি সুন্দর উদাহরণ মেলে এক শ্রেণীর ল্যাটিনভক্ত হিউম্যানিস্টদের দান্তে, পেত্রার্কা ও বোক্কাচিওর নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে লিখিত পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের ইতালির হিউম্যানিস্ট Cino Rinuccini-র পুস্তিকা *Invettiva*-র এই উক্তিটিতে, 'তাঁরা (ল্যাটিনভক্ত ক্ল্যাসিসিস্টরা) বলেন, দান্তে, যিনি কবিদের মধ্যে মহত্তম, তিনি মুচিদের কবি, তাঁরা বলেন না যে তাঁর কবিতার বাকছন্দ ঈগলের মত সকলকে

ছাড়িয়ে যায়, ল্যাটিনে লিখে তাঁর সহনাগরিকদের যেটুকু কাজে লাগতেন, তার থেকে নিজেকে আরো বেশি কাজে লাগাবার জন্য কবি মানুষের কীর্তিকলাপ Volgare-এ বর্ণনা করাই শ্রেয় মনে করেছেন ; দান্তে Volgare-এর একটি মাত্র ছন্দেই বিস্ময়কর পরিমিতি ও লাবণ্যে দুটি কি তিনটি উপমা সন্নিবিষ্ট করেছেন যা ভার্জিল তাঁর কুড়িটি হেক্সামিটারের প্রয়োগেও পারেন নি।'[১]

অবশ্যই সে যুগের মানসের মানচিত্র স্পষ্টরেখ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল না। দুটি ধারার দ্বন্দ্বময় জটিল সম্পর্ক নানাভাবেই চোখে পড়ে, একই ব্যক্তির মধ্যে তাদের টানাপোড়েন দেখা যায়। Volgare মানসের মূল আশ্রয় হলেও ল্যাটিনের প্রতি আনুগত্য কেউ কেউ ছাড়তে পারেন নি। একথা মনে রেখে ঐ দুটি ধারাকে মোটামুটি একটা ছক হিসেবে ধরে নিয়ে আমাদের এগোতে হয়। আমরা ইয়োরোপের পরবর্তীকালের গদ্যসাহিত্যের বিকাশের স্বরূপ বোঝার নির্ভরযোগ্য পটভূমি পেয়ে যাই। ব্রিটেনের মত দুটি একটি দেশের ব্যতিক্রম ছাড়া রেনেশাঁসের কালেই ইয়োরোপের বেশির ভাগ দেশের নিজস্ব ভাষার গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকেরা ল্যাটিনের প্রকাশরীতি, শব্দভান্ডার ইত্যাদির সাহায্যে দেশজ ভাষাসমূহের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করার চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো ল্যাটিনের অনুকরণ-নির্ভর আলংকারিক প্রসাধনে অভিজাত কুলীন করে তোলার এবং লোকভাষার সংগে দূরত্ব রচনার প্রয়াসে সেই ভাষাগুলো জন-জীবনের সমস্ত সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন, আড়ষ্ট ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। আবার নানা ঐতিহাসিক শক্তির চাপে, নতুন চৈতন্যের টানে সেই অতিমাত্রায় এলিটিস্ট, প্রথাবদ্ধ রীতির সংকীর্ণতার প্রতিকূলে স্রোত ঠেলে আর একদল হিউম্যানিস্ট ও সাহিত্যিক লোকায়ত ভাষার প্রাণময় উৎসে গদ্যের স্বরূপ তথা নিজেদের মানসের পুরুষার্থ সন্ধান করেছেন। সেই প্রক্রিয়ায়ই দেশজ ভাষাগুলি বিকাশের গতিশীলতা অর্জন করে।

ইংরেজি গদ্যের কথাই ধরা যাক। ইংরেজি সাহিত্যে রেনেশাঁসের বহু আগে গদ্যের চর্চায় ল্যাটিন ও কথ্যভাষা ভিত্তিক দেশজরীতির টানাপোড়েন লক্ষণীয়। ল্যাটিনের প্রকাশরীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘ জটিল পিরিয়ড বা একাধিক খণ্ডবাক্য (clause) সংবলিত পূর্ণাঙ্গ বাক্য, যার প্রতিটি অংশ মূলের অধীনতায় দৃঢ়ভাবে শৃংখলিত। বাক্যের দৈর্ঘ্য যত বিশালই হোক, প্রতিটি অংশই সুনিয়ন্ত্রিত। এই গঠনে শেষ শব্দটি লিখিত না হওয়া পর্যন্ত

বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এর ছন্দোময় প্রকরণসমূহ অত্যন্ত জটিল ও চাতুর্যপূর্ণ। খণ্ড বাক্যাংশের এই ক্রমিক, আনুগত্যমূলক বিন্যাসকে বলা হয় hypotaxis। দেশজ রীতির বাক্যগঠনের মূল ভিত্তি হল co-ordination এবং parataxis : বাক্য ও বাক্যাংশগুলো পর পর কিছুটা স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত হয়ে থাকে। প্রথম রীতিতে সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা তাদের যুক্ত করা হয়, দ্বিতীয়টিতে কোনো সংযোজক শব্দ থাকে না, থাকে দৃঢ় যতি (Juncture)। প্রতিটি অংশই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রবাহিত হয়ে সজীব ধারাবাহিকতায় অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়। এই Parataxis বা টুকরো, কাটা কাটা বাক্যের বিন্যাস অল্পবিস্তর পরিমাণে মৌখিক ভাষার বাক্‌ছন্দের অনুগামী।

দুই.

ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার গতিময় বিকাশের অংগ হিসেবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে রেনেশাঁস ঘটে, তারও পরবর্তী দু-তিন শতাব্দীর ইতিহাস এবং ইংরেজ শাসিত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ জাগরণ তুল্যমূল্য নয়। তবু সেই মূলত কলকাতা শহরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী কেন্দ্রিক নবজাগরণের সীমাবদ্ধ পরিসরেও আমাদের গদ্যসাহিত্যের স্বরূপ সন্ধানের ঐ ছককে লক্ষ্য করি। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই এই গদ্যসাহিত্যে ইংরেজির মত ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ছিল না। এই প্রসংগে দুটি দিক স্মরণীয়। প্রথমত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক জীবনের অভিশাপে নবজাগরণের হোতা শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংগে জনজীবন ও তার সংস্কৃতির যে দুস্তর বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল, ইয়োরোপের ইতিহাসের কোনো পর্বেই তা দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু আগেই জাতিভেদপ্রথা ও শাস্ত্রীয় আচার বিচারের গণ্ডিতে আবদ্ধ ভারতবর্ষের সমাজ ঐতিহাসিক বিকাশের শক্তি হারিয়ে বসেছিল। আর এলিটশ্রেণীর কোনো অংশই জনজীবনের প্রবক্তা বা প্রতিনিধি রূপে, অথবা তার সংগে সম্বন্ধ নিরূপণের সূত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানচর্চার সংস্থা রয়াল সোসাইটি কারিগর, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং ব্যবসায়ীদের ভাষাকে সচেতনভাবে প্রকাশ মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিল। এই শতকের বিখ্যাত লেখক, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাহীন সাধারণ টিন-মিস্ত্রী জন বানিয়ান তাঁর অবিস্মরণীয়

সাহিত্যকর্ম 'দি পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস'-এর ন্যারেটিভ ভাগ, যা এই রচনার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ, তাকে তাঁর নিজের শ্রেণীর কথ্যভাষার প্রাণময় উৎসেই আশ্চর্যভাবে বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তুলেছেন। উনবিংশ শতাব্দী ত দূরের কথা, নিতান্ত সাধারণ মানুষের এই ধরনের দেশজ ভাষার শেকড়ের স্তরের কাজ এ যুগেও অকল্পনীয়। দ্বিতীয়ত, মধুসূদন প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণের কবিদের সামনে ছিল বাঙলা কাব্যভাষার দীর্ঘকাল বিস্তৃত ঐতিহ্য। মধুসূদনের রক্ত-স্নায়ু-মজ্জায় বাঙলা কাব্যভাষার উত্তরাধিকার জীবন্ত ছিল বলেই তিনি সেই জমিতে নতুন পুরুষার্থ চেতনার সূত্রে বিদেশী কাব্যকলার পরীক্ষা সফল করে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাঙলা লেখ্য বা সাহিত্যিক গদ্যের কোনো ঐতিহ্যই ছিল না। ইংরেজি ভাষার গদ্য লেখকেরা প্রায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে প্রবাহিত ইংরেজি গদ্যের দেশজ ধারার সজীব ঐতিহ্যের আশ্রয় পেয়েছেন। ঐতিহ্যের অভাব বাঙলা গদ্যের বিকাশকে পঙ্গু করেছে।

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচার এবং ইংরেজ সাম্রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে যেভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম বাঙলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় সে ইতিহাস সুপরিচিত। আধুনিক ভাষাবিদ্‌দের সংজ্ঞাকে বর্তমান আলোচনার প্রয়োজন মত ব্যবহার করে তার পটভূমিকাগত উপাদান সম্বন্ধে বলতে পারি: সেই সময়কার বাঙলা গদ্যের Langue বা সমগ্র ভাষা-ব্যবস্থার অংগ ছিল সাধু-রীতি ও সংস্কৃত ভাষার উপাদান, তৎকালে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ, ইংরেজি বাক্যগঠন ও শব্দ-পদ বিন্যাসের ছাঁদ এবং কথ্যভাষা। এই আবর্তে, বিভিন্ন উপাদানের যথেচ্ছ মিশ্রণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা গদ্যের রূপ ছিল অরাজক, বিশৃংখল। স্বভাবতই বাঙলা গদ্যকে সংস্কৃতানুসারী করে তোলার ঝোঁক ছিল সব থেকে প্রবল। সংস্কৃতের কাছে বাঙলার ঋণ যত গভীরই হোক, সংস্কৃত মূলত inflectional অর্থাৎ সন্ধি-সমাস-প্রত্যয়-বিভক্তি নির্ভর, জনজীবনের পশ্চাদপট বর্জিত, মৃত, পুরোপুরিভাবে সাহিত্যিক ভাষা; আর বাঙলা analytical অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন শব্দ-পদ প্রধান, কথ্যভাষার পটভূমিধৃত জীবন্ত ভাষা। সেই মৌল জাতিগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে সংস্কৃত পাণ্ডিত্যাভিমানী লেখকেরা বাঙলাকে সংস্কৃতানুগামী করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী পদ, ধাতু ও সন্ধি; ইয়া ও ইতে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার বদলে শতৃপ্রত্যয় জাত পদ (যেমন: 'তাহার অনুচর পক্ষিকর্ত্তৃক দণ্ডারণ্য মধ্যেতে চরত আমি দৃষ্ট হৈলাম'—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার) ইত্যাদির ব্যবহার, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ—সেই সংস্কৃতানুগামিতার

উদাহরণ।[২] এই লেখকেরা বাঙলা ভাষার মৌল প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী এমন সমস্ত বাক্য রচনা করেছেন, লেখ্য গদ্যের আদর্শের অভাব যতই বাধা হয়ে দাঁড়াক, সাধারণ পাঠকদের কাছাকাছি যাবার আগ্রহ এবং কথ্যভাষার বাক্‌ছন্দ সম্পর্কে কিছু মমতা থাকলে তাঁরা তা লিখতে পারতেন মনে হয় না।

বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সমকালীন নানা ঘটনা, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিষয়বস্তু আলোচনার প্রয়োজনে এবং অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছোবার তাগিদে অল্পবিস্তর কথ্য-ভাষার অনুগামিতায় বাঙলা গদ্য ক্রমে অনেক সহজ, প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। সেই ধারায়ই রামমোহন তাঁর মানবিক যুক্তিবাদী, উদার, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রে বাঙলা ভাষাকে মার্জিত, সুষম ও প্রাঞ্জল করে তুলে আধুনিক মননের উপযোগী করেন। ঔপনিবেশিক অস্তিত্বের স্ববিরোধিতা তার মধ্যে অবশ্যই ছিল কিন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আধুনিকতার উদ্গাতা এবং ভাষ্যকাররূপে একটি জাতীয় ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন স্বীকার করতে হয়। সেইজন্যই আমরা রামমোহনের গদ্য রচনায় রক্ষণশীল, নিশ্চল hypotaxis-এর বদলে Co-ordination অর্থাৎ 'তবে', 'জে', 'তাহার', 'জেহেতু', 'অধিকন্তু', 'সুতরাং', 'আর', 'অথচ', 'এবং', এই সমস্ত সংযোজক শব্দ ; অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত স্বচ্ছন্দভাবে প্রবহমান বাক্যগঠনরীতি লক্ষ্য করি, যা তাঁর রচনায় বাক্যের রূপ নির্মাণের মূলনীতি রূপে গৃহীত হয়েছে। এই রীতিতে একটি গতিশীল ছন্দ সুস্পষ্ট, যার পেছনে আছে যুক্তি-বিচারশীল চলিষ্ণু মন। বাক্য গঠনের ঐ নমনীয় রূপে প্রতিটি অংশই পরিবর্তনশীল, স্বতন্ত্র, অথচ বক্তব্যের টানে স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ সম্বন্ধে যুক্ত। অংশগুলির প্রবহমানতায় গতিশীল চিন্তাধারা অনুভব করি। রামমোহনের বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু তিনি যুক্তিবাদী আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রেরণায় বাঙলা ভাষার দেশজ রীতিকেই যে বেশি মান্য করেছেন তার প্রমাণ মেলে দুরূহ আভিধানিক শব্দ বর্জনে, 'দর্শন করিতেছি', 'শ্রবণ করিলে' ইত্যাদি সংস্কৃতানুসারী, সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে তদ্ভব ক্রিয়া-পদের ব্যবহারে : যেমন, 'ওই পুরাণাদিতে দেখিতেছি', 'শূদ্রের এ ভাষা সু(শু)নিলে', 'লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বীদের উপকার আছে।'

২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাঙলা গদ্যে সব থেকে দুঃসাহসিক ও সম্ভাবনাময় পরীক্ষা করেছিলেন রামমোহনের যুক্তিবাদী মানবিকতার ঐতিহ্যবাহী প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। এই রচনার সাধু ভাষার কাঠামোয় চলিতরীতির প্রয়োগ যতই অসমঞ্জস হোক, সেই প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনদৃষ্টি-নির্ভর, দেশজ সংস্কৃতি ও ভাষার ঐতিহ্যের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত ভাষাভঙ্গির সজীবতা এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতায় সেই সম্ভাবনাকে পরিণতির দিকে পৌঁছে দেবার কোনো একাগ্র প্রয়াস দেখা গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র আলালী-ভাষার প্রশস্তিতে মুখর হলেও দেশজ মানসের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগ খুব গভীর ছিল মনে হয় না। বঙ্কিমের 'আলালের ঘরের দুলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও বোধ হয় কতকটা বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ প্রণোদিত', ড° সুকুমার সেনের এই মন্তব্য হয়ত অযৌক্তিক নয়। প্যারীচাঁদ নিজেও তাঁর চলিতভাষার পরীক্ষাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পরিণতিদানে অগ্রসর হন নি, আলালের ঘরের দুলালের পরবর্তী 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি রচনায় বিচ্ছিন্ন ন্যারেটিভ অংশগুলো ছাড়া মূল তত্ত্বালোচনার অংশে দেশজরীতি চর্চার প্রভাব বিশেষ পড়ে নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ন্যারেটিভঘটিত দেশজরীতির অনুশীলন ইংরেজি গদ্য সাহিত্যের বিকাশে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তিন.

রামমোহনের পরবর্তী যুগের বাঙলা গদ্য চর্চার ইতিহাসে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম-চন্দ্রের ভূমিকা সব থেকে স্মরণীয়। এঁদের দুজনকে বাঙলা গদ্যের দুটি মানস ও রীতির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করতে পারি। সেকালের বাঙলার বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় দেশজ জীবন ও সংস্কৃতির শেকড়ের সঙ্গে সত্তাগত গভীর যোগ ছিল বলেই বিদ্যাসাগরের মধ্যে ইয়োরোপীয় আধুনিক মুক্তবুদ্ধি ও মানবিকতা এক অসাধারণ চারিত্র লাভ করেছিল। আমরা জানি, সে যুগের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মত নিজেদের শ্রেণীগণ্ডিতে প্রতিষ্ঠালাভে এই মানুষটি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন নি। একটি স্থানে থেমে যান নি। সংকীর্ণতা ও নীচতায় আকীর্ণ নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে কর্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের মধ্যে তাঁর সজীব মনুষ্যত্ব সন্ধান মধ্যবিত্তশ্রেণীর সত্তাসংকট ও উত্তরণ প্রয়াসের ঐতিহাসিক মর্যাদাই পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতিতেও সেই জীবন ও মানসের গতিশীলতার ছাপ চোখে পড়ে। বিদ্যাসাগরের প্রথম

দিকের রচনায় শব্দ নির্বাচন এবং যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে সংস্কৃত নির্ভরতা অনেক বেশি। অন্য দিকে, বাক্যের রূপ নির্মাণে তাঁকে ইংরেজি বাক্য গঠনের আদর্শ সামনে রাখতে হয়েছে। ফলে তাঁর রচনায় কমা, সেমিকোলনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, কোথাও কোথাও ইংরেজি ঘেঁষা বাক্যইত্যাদি ত্রুটি (পরবর্তী কালের রচনায়ও) লক্ষ্য করি। বাঙলা গদ্যের রূপ নির্মাণে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের এই ধারণাকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর গণ্ডি-নির্দিষ্ট নিছক এলিটিস্ট মনোভাবের উদাহরণরূপে গ্রহণ করলে সম্ভবত তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। সেই যুগের মধ্যবিত্তশ্রেণীর সীমাবদ্ধতার দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁর একার ছিল না। বিদ্যাসাগরের কালে ত বটেই, তারপরেও বাঙলা গদ্যের রূপ সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত প্রত্যয় গড়ে ওঠে নি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ষোড়শ শতাব্দীতেই ল্যাটিনের দুটি রীতি দাঁড়িয়ে যায়। একটি হাইপোট্যাক্সিস ভিত্তিক, আলংকারিক, দীর্ঘ জটিল বাক্যের নকশা সংবলিত, সিসেরোনিয়ান ; অপরটি তার বিরোধী, প্যারাট্যাক্সিস-নির্ভর, অপেক্ষাকৃত সহজ, ঢিলেঢালা, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গির দিকেই যার ঝোঁক, সেনেকান বা অ্যাটিক। কারো কারো মতে, দ্বিতীয় রীতিটি যুক্তিবাদী আধুনিক মননের উপযোগী[৩]। ইরাসমুস, মতাঁঞ, বেকন প্রভৃতি ছিলেন সিসেরোনিয়ান রীতির বিরোধী। এই রীতি দেশজ ভাষায়ও প্রভাব বিস্তার করে, তার পক্ষে মুক্তিবহ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজি গদ্যে যে আলংকারিকতামুক্ত, সহজ, স্বচ্ছন্দ রীতি আদর্শ-রূপে গৃহীত হয়েছিল, তার মূলে সেনেকান বা অ্যাটিক রীতির যেমন, তেমনি বিজ্ঞান চর্চার প্রভাবও ছিল। আমাদের দেশের রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখকদের নিজেদের বোধের ওপর নির্ভর করেই পথ তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তাঁদের সমস্যা কত কঠিন ছিল ঐ বিদেশী দৃষ্টান্তের তুলনায় তা বুঝতে পারি।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত (১৮৫৪) রচনায় দেখা যায়, মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হয়েও এবং এদেশের শাস্ত্রাদিতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলেও দেশবাসীর কাছে শুধু-যুক্তি বিচারের পথে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও মানবিক দিক তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তাঁকে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণে অগ্রসর হতে হয়েছিল। বৈষয়িক স্বার্থ সাধনের জন্য ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ, বাইরে সাহেবদের সঙ্গে খানাপিনা আর পারিবারিক জীবনে হিন্দুয়ানি, প্রাচীন আচার-বিচার সযত্নে রক্ষা— মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঔপনিবেশিক অস্তিত্বের এই স্ববিরোধিতা বিদ্যাসাগরকে

৩. Morris W. Croll, *Style, Rhetoric and Rhythm*. Princeton, 1966.

আঘাত করে তাঁর শক্তির মর্মান্তিক অপচয় ঘটিয়েছিল। বিধবাবিবাহ বিষয়ক আলোচনায় তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রবচনের অনুবাদসহ সনাতন ঐতিহ্যগত শাস্ত্রীয় মীমাংসার কাঠামোটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার চাপেও এই রচনার ভাষা কোথাও কোথাও সংস্কৃতানুসারী হয়েছে। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতায় তাঁর মানস প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রটি না পেলেও ঐ সনাতন শাস্ত্রীয় বিচারের কাঠামোয় নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ হতে দেননি। সেই চাপের মধ্যেই নতুন বিচার-আলোচনা প্রণালীতে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছেন। পদ্য-ছন্দে আবদ্ধ সংস্কৃত শাস্ত্র সংহিতার তর্ক মীমাংসা বিমূর্ত (abstract) তত্ত্বালোচনা, তাতে মীমাংসাসূত্র, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিকে বিমূর্ত পরম সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার মনোভাবই লক্ষণীয়। এই শাস্ত্রীয় আলোচনায় জানীহি, অবগচ্ছ, কিংবা তার টীকায় জ্ঞাতব্যম্, বিজ্ঞাতব্যম্—জানতে হবে—বুঝতে হবে ইত্যাদি অনুজ্ঞা বাচক নির্দেশে ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি গুরুর আদেশের ভঙ্গিটিই পরিস্ফুট।[৪] বিদ্যাসাগর কোনো সময়েই বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনায় বা বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিজের মীমাংসাসূত্র ও সিদ্ধান্তকে পরম সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি। এদেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সব থেকে অসহায় শিকার নারী সমাজের শোচনীয় দুর্গতির যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার জমিতে দাঁড়িয়ে, আমাদের সমাজের অধুনিকীকরণের আগ্রহে শিক্ষিত সমাজের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষাভঙ্গিকে সাধারণভাবে রেজিস্টার (Register) - এই নাম দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনন ও তার প্রকাশরীতির স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে এই রেজিস্টারের ধারণা আমাদের সাহায্য করতে পারে। লেখকদের রেজিস্টার নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত রচনার বহির্গঠনে ঐতিহ্যগত শাস্ত্রীয় বিচার-মীমাংসার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্তর্গঠনে যে রেজিস্টার গৃহীত সেটিই তাঁর মানসের প্রকৃত অভিজ্ঞান : নৈতিক উপদেশ বা শিক্ষাদানের উচ্চমঞ্চ থেকে নয়, এবং সমভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রোতৃমণ্ডলী বা পাঠকসমাজের উদ্দেশে প্রত্যক্ষ ভাষণ, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের যুক্তি-বিচার এবং মনুষ্যত্ববোধের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। রচনাটির প্রথমাংশে তিনি পণ্ডিতদের বিচার সম্বন্ধে বলেছেন, পণ্ডিত মণ্ডলীকে একত্র করে বিচার করলে কোনো বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানার প্রত্যাশা

৪. সহকর্মী অধ্যাপক অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বর্তমান লেখককে সাহায্য করেছেন।

নেই। উভয় পক্ষই নিজেদের জয়ী এবং প্রতিপক্ষকে পরাজিত স্থির করেছেন, 'সুতরাং ঐ বিচারে কিরূপ তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন।' লেখক অনেকের ঔৎসুক্য দেখে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, 'এবং প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে, দেশের চলিত ভাষায় লিপিবন্ধ করিয়া, প্রচারিত করিতেছি। এক্ষণে, সকলে পক্ষপাতশূন্য হইয়া পাঠ ও বিচার করিয়া দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।' এই উক্তির পেছনে আমরা বিদ্যাসাগরের গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয়ই পাই। নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পাঠকসমাজকে সচেতন করে তোলায় এই আবেদনমূলক imperative বা অনুজ্ঞা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর কোথাও কোথাও বুদ্ধিগত বিচার-বিতর্কের নৈয়ায়িকতা ছেড়ে বালবিধবাদের দুঃসহ যন্ত্রণার বাস্তব অভিজ্ঞতা বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে চেয়েছেন। বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকের শেষ অংশে কুসংস্কার ও দেশাচারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে মমত্বহীন ও বিবেকহীন পুরুষ-সমাজকে কঠিন ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত আবেগ-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। আর শেষ অংশের বিখ্যাত দুটি বাক্যে বিদ্যাসাগর তাঁর হৃদয়োৎসারিত ক্ষোভ-রোষ-বেদনা একেবারে উজাড় করেই ঢেলে দেন, আমরা তাঁর হৃদয়ের আবেগকম্পিত স্বরটি প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারিত হতে শুনি :

> 'হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই. ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।'

এই অংশের বাক্‌রীতি দেশজ ভাষার নিজস্ব ছন্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই ভাষা এমন স্বচ্ছ, সজীব ও গতিশীল রূপ পেয়েছে।

পরবর্তী রচনা 'কথামালা'-য় (১৮৫৫) বিদ্যাসাগরের গদ্য বহুল পরিমাণে কথাভাষার বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছে। এই রচনার বিভিন্ন আখ্যানের বাক্যগঠন প্যারাট্যাকটিক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রিয়াপদ দেশজরীতির (যেমন : মরা মানুষ ছোঁয় না, কাণ্ড আনিয়া আঁটি বাঁধিতে বলিলেন, কিনিয়া রাখিলেন, তফাতে থাকিতেছি ইত্যাদি), সহজ সরল শব্দই নির্বাচিত, সংস্কৃত ঘেঁষা এবং সন্ধি সমাসের আড়ম্বরময় শব্দ-পদ ব্যবহার কম। 'দাঁড়কাক

ও ময়ূরপুচ্ছ' বা 'দুঃখী বৃদ্ধ ও যম' রচনায় আমরা লক্ষ্য করি, বহির্গঠনে (Surface structure) এই ভাষা সাধুরীতির হলেও অন্তর্গঠনে (Deep structure) পুরোপুরিভাবে কথ্যভাষার জীবন্ত বাক্‌ছন্দের অনুগামী, তাই তার রূপ এত সজীব ও গতিশীল।

বহুবিবাহ সংক্রান্ত রচনায় (১৮৭১ ও ১৮৭৩) দেখা যায়, লেখকের সমাজ-সমালোচনা ক্রমশ তীক্ষ্ন হচ্ছে। পুরুষ শাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সমস্ত কুপ্রথা, দেশাচার, ব্যক্তিজীবনের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন ইত্যাদির সমর্থক সংস্কৃত-শাস্ত্র ব্যবসায়ী, সনাতন ধর্মের ধ্বজাধারী পণ্ডিতদের প্রতি তাঁর ক্ষোভও সুপরিচিত। তিনি যে যৌবনে সমাজ সংস্কারের বুলিতে মুখর ও পরিণত বয়সে অভ্যাসিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তায় আত্মতৃপ্ত ইংরেজি শিক্ষিত 'নব্য সম্প্রদায়' সম্পর্কেও আস্থা হারিয়েছিলেন, বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে তার পরিচয় পাই। সম্ভবত সেইজন্যই এই রচনায় তিনি ঐতিহ্যগত শাস্ত্রীয় বিচারের কাঠামো অনুসরণ করেও তার গণ্ডিতে বিশেষ আবদ্ধ থাকেন নি। বিধবাবিবাহের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে পাঠকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজের সমালোচনা এবং প্রতিপক্ষকে প্রত্যক্ষ, তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আক্রমণ করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ সমালোচনার ব্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের প্রতিনিধির প্রতি যেমন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি ইংরেজি শিক্ষিত 'নব্য সম্প্রদায়' সম্বন্ধেও তাঁর ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে।

নিজের সমাজের ঐ যন্ত্রণাদায়ক বাস্তব অভিজ্ঞতার চাপে এবং দুর্লভ সততায় বিদ্যাসাগর শুধু শাস্ত্রীয় বিচারে তৃপ্ত না থেকে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'-এর কয়েক স্থানে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ন্যারেটিভের বিন্যাসটি গ্রহণ করে কুলীন কন্যাদের দুর্গতির রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন :

> 'এ স্থলে, একটি কুলীন মহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীন মহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার না কি বহু-বিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আমি কহিলাম, কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এবারে কৃতকার্য হইতে পারিব। তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে না; কুলীনের মেয়ের নিতান্ত

পোড়া কপাল ; সেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি।'

এই অংশে লোকভাষার জীবন্ত কণ্ঠস্বর কৌলীন্য প্রথায় নির্যাতিত নারীদের যন্ত্রণাকে বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্যরূপে প্রকাশ করে, তার মধ্য দিয়েই লেখক সমাজের বিবেককে ঘা দেবার চেষ্টা করেছেন। 'অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস' প্রভৃতি রচনায় সমাজের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ক্ষুরধার, প্রায় হিংস্র হয়ে উঠে সনাতন সংস্কারের সমর্থক, সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতসমাজ বর্জনে গিয়ে পেঁৗছেছে বলা যায়। এই রচনাগুলোয় বিদ্যাসাগর বাক্যের মূল গঠনে প্রায় পুরোপুরিভাবেই কথ্যভাষাকে অনুসরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষার বেড়া ভেঙে দিয়ে চলিত ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করেছেন। প্রবাদ-প্রবচন ও বিশিষ্ট দেশজ বাক্রীতি ব্যবহারে সেই ব্যঙ্গের ধিকারকে নির্মম, লক্ষ্যভেদী করে তুলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্যসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা কুশলী শিল্পী। তিনি বিভিন্ন ধরনের বাক্য ও খণ্ড বাক্যকে আলংকারিক কৌশলে যুক্ত করে যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নিপুণ নকশা তৈরি করেন, সাধারণ পরীক্ষায়ই তা ধরা পড়ে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই অসামান্য শিল্পকুশলতাকে মধ্যবিত্ত সমাজের সত্তা-সংকটের স্বরূপ সন্ধানের বাহন করে তোলেন না, এবং সেই সূত্রে জনজীবন ও সংস্কৃতির উৎসে উনবিংশ শতাব্দীর ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৌল অসঙ্গতি নিরাকরণের দায়িত্ব গ্রহণে কুণ্ঠিত হন। তাঁর গদ্য ভাষা যথার্থ আধুনিক মানসের অভিজ্ঞানরূপে অনাবশ্যক আলংকারিকতা বর্জন এবং লোকভাষা থেকে শক্তি গ্রহণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক গতিশীলতা অর্জন করে না, শেষ পর্যন্ত সংকীর্ণ, পশ্চাদমুখী গণ্ডিতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিড়ম্বনা-অসঙ্গতি সম্বন্ধে সচেতনতা ও বেদনাবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের অবশ্যই ছিল, তাঁর রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ কয়েকটি নকশায়, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এ এবং 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধে তার প্রমাণ মেলে। এই সমস্ত রচনায় সমাজ সমালোচনার অংশগুলোয় দেশজ বাক্রীতির আশ্রয়ে গদ্য যে সহজ অথচ তীক্ষ্ন, প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে তা বঙ্কিমের অতিমাত্রায় অহংসচেতন রেটরিকে দেখা যায় না। এখানেও তাঁর দুকূল রক্ষা করার স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘটিত গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্বলতা এবং কৃষক

সমাজের দুর্গতি তীক্ষ্নভাবে নির্দেশ করেও তার পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন না। সেই অসম্পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত সমাজ সমালোচনার চেতনাটুকুও পরিত্যাগ করে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশের হিন্দুয়ানির রক্ষণশীল, এলিটিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণ গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করেন। প্রাচীনকাল থেকে বাঙলাদেশের লৌকিক ধর্ম-সাধনায়, ব্রতকথায় ছড়ায় পাঁচালীতে দেশজ সাহিত্য সংস্কৃতির যে জীবন্ত ঐতিহ্য প্রবাহিত, যা কিছুটা পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিরোধী, প্রত্যক্ষ বাস্তবের দিকেই যার ঝোঁক, বঙ্কিমচন্দ্রের এলিটিস্ট হিন্দুমন সেই মুক্তিবহ ঐতিহ্যের স্রোতের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অহং বা আত্মবাদী, নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সদাসচেতন এলিটিস্ট মনোভাবের ছাপ তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বের রচনার গদ্য-রীতিতেও পরিস্ফুট। তিনি পাঠকদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণরীতি গ্রহণ করেন, তাতে পরোক্ষভাবেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ রচনার আগ্রহ দেখা যায় না। আত্মশ্রেষ্ঠত্বের উচ্চমঞ্চ থেকে শিক্ষাদানের, নৈয়ায়িক নৈপুণ্য প্রদর্শনের এবং পাঠকদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মনোভাবই প্রকাশ পায়: 'উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না, (গীতিকাব্য); 'সকলেই অহরহ সৌন্দর্য্য তৃষ্ণায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন একথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি' (আর্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্প); 'ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর' (দ্রৌপদী); 'প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ', 'পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ' (অনুকরণ)। এই সমস্ত অংশের অনুজ্ঞার ধাঁচে আদেশ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিত গোষ্ঠীর গদ্য লেখকদের সংস্কৃতে ঘেঁষা গদ্যরীতির যত নিন্দাবাদই করুন, তাঁর নিজের রচনায় সন্ধি সমাস অনুপ্রাসের আড়ম্বরে, সংস্কৃতানুগামিতায় নিতান্তই আলংকারিক, কৃত্রিম ধ্রুপদী গাম্ভীর্য সৃষ্টির চেষ্টা নিতান্ত কম নয়।

চার.

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যজীবনের উন্মেষ, আমরা জানি। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে, বিশেষত প্রথম দিককার রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচনারীতির অনুসরণ সুস্পষ্ট। যেমন বঙ্কিমীরীতিতে

অনুচ্ছেদের ভূমিকাংশ রচনা : 'এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল' (ভারত মহিলা) ; 'এখানে এক প্রশ্ন হইতে পারে' (ভারত মহিলা,—তুলনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্রৌপদীর একটি অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের অংশ 'জিজ্ঞাসা হইতে পারে') ; 'পূর্বেই উক্ত হইয়াছে' (ভারত মহিলা) ; 'জীবনের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইলে আগে জীবন কাহাকে বলিতেছি, তাহা জানা চাই' (মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য)। কল্পিত বা সম্ভাব্য বিরোধীপক্ষকে আলংকারিক সম্বোধন : 'শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভট্টাচার্য মহাশয়, ইয়ুরোপীয় ফিলজফর মহাশয় রাগ করিবেন না' (প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ) ইত্যাদি। 'যৌবনে সন্ন্যাসী', 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য', 'হৃদয়-উদাস' ইত্যাদি রচনা তো প্রত্যক্ষভাবে কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বারা প্রভাবিত। এই পর্বের পদ ও শব্দ সমাবেশে সংস্কৃতঘেঁষা রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু হরপ্রসাদ সহজেই এই স্তর অতিক্রম করেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, লেখকজীবনের সূত্রপাত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেও এবং পণ্ডিত বংশের টোলের শাস্ত্র চর্চার ঐতিহ্যে লালিত হয়েও তিনি হিন্দুয়ানি বা ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণ গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ হতে দেন নি। শাস্ত্রীমশাই ছিলেন বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী উদার মানসের ঐতিহ্যবাহী।[৫] ছাত্রাবস্থায় লিখিত 'ভারত মহিলা' প্রবন্ধে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন সংহিতা ইত্যাদি অবলম্বনে প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর বিদ্যাচর্চা, মানসিক উন্নতি, অবরোধমুক্ত জীবন, নারীর প্রতি সদ্ব্যবহারের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, তাতে তাঁর বিদ্যাসাগরীয় আধুনিক মানসিকতারই পরিচয় পাই। সেইজন্যই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় এই নিবন্ধটি প্রকাশ করতে রাজি হন নি। কালিদাসের রঘুবংশের প্রতি সংস্কৃত পণ্ডিতদের, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপতা সত্ত্বেও হরপ্রসাদ যে তার রসগ্রাহিতায় অবিচলিত থাকেন, এর পেছনে হয়ত বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্যের রসবোধ এবং কালিদাসপ্রীতির পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে ড° সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণীয় :

> 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সার্থক সাহিত্য সমালোচনা দেখা গেল। এই নিবন্ধটিতে এবং মেঘদূতের সংস্করণের ভূমিকায় ও মেঘদূতের শ্লোকগুলির বিচার ও পাঠ নির্ণয়ে বিদ্যাসাগর যে পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতার পরিচয়

---

৫. এ বিষয়ে শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী এবং শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি বাঙ্গালাদেশে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও নহেন।'[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একান্ত অনুরাগী হয়েও শাস্ত্রীমশাই তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিতে বঙ্কিমের উপন্যাসের ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন,

> 'বঙ্কিমবাবু খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে চাহিতেন না। তিনি বড় বড় জিনিসগুলিই দেখিতেন; ভাল ও বড় জিনিসগুলিই দেখিতে চাহিতেন, বাছিয়া লইতেন। তাই তাঁহার বইয়ে দুঃখী গরীবের স্থান নাই; যাহারা খেটে খায় তাহাদের স্থান নাই।'

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রভাবও শাস্ত্রীমশাইয়ের মানসের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। সেই গবেষণার সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিদর্শন তথ্য ইত্যাদির অনুসন্ধান-ভিত্তিক পদ্ধতির চর্চায় যুক্তিনিষ্ঠ, মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিনির্ভর একটা মেজাজ তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ সেই ইতিহাস চর্চার ঐতিহ্যহীন যুগে প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসকে মান্য করার সহজ পথ গ্রহণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও উপযোগবাদের মত আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্বের খোলস পরিয়ে হিন্দু ধর্ম-সংস্কারকে ইংরেজি শিক্ষিত গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ইচ্ছাপূরণ মূলক প্রয়াসের প্রতি প্রলুব্ধ হন নি। বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং ইতিহাসের ব্যাপ্ত বোধ নিয়েই বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অনুসন্ধান-বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর ও দুর্লভ আধুনিক জীবনবোধের সূত্রে বাঙালি জাতির বর্ণসংকরত্ব স্বীকার করেন, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব লোলুপ 'আর্যামি'-কে প্রশ্রয় দেন না (সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ), পৈতা যে সংস্কারমাত্র একথা নির্দ্বিধায় বলেন (বৌদ্ধধর্ম্ম)। ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বিরোধী বৌদ্ধধর্মের গণতান্ত্রিক, চরম ভোগ ও চরম বৈরাগ্য ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উদার মনোভাব, জনজীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং করুণার মানবিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের আলোচনায়ও শাস্ত্রীমশাইয়ের সংস্কারমুক্ত মানস আত্মপ্রকাশ করে:

> 'গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এইভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্ব্বাণের

৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮৭.

> অভিলাষী, তাহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যে কথা শোভা পায় মানুষের মুখে সে কথা আরও অধিক শোভা পায়। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহাদের করুণা কত গভীর।' (বৌদ্ধধর্ম)

তিনি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর দেবতা ধর্মঠাকুরের স্বরূপসন্ধানে আগ্রহী হন। হরপ্রসাদের মানসে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি স্থান পায় নি। বাঙলা যে শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও দেশ, তিনি তাঁর সেই সামগ্রিক সত্তাকে বাস্তব সত্যরূপেই উপলব্ধি করেছেন। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন-এ সেই ঐতিহাসিক বোধের প্রমাণ পাই।

বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির দেশজ, লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে শাস্ত্রীমশাইয়ের রক্তগত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। প্রাচ্যবিদ্যা এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির জ্ঞান ও বুদ্ধির সমন্বয়ে গঠিত আধুনিক মননের জন্যই তিনি দেশজ ধারার মূল্য ও শক্তিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শাস্ত্রীমশাইয়ের গদ্যরীতিতে সেই আশ্চর্য রকমের প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল উদ্ভাস লক্ষ্য করি। দেশজরীতি ভিত্তিক বাঙলা ভাষার নিজস্বতা সম্বন্ধে তাঁর বোধ ছিল গভীর ও যথার্থ। হরপ্রসাদের প্রবন্ধের বহির্গঠন (Surface structure) সাধুভাষা রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার অন্তর্গঠন (Deep structure) দেশজ কথ্যভাষার। শাস্ত্রীমশাইয়ের আধুনিক মননের টানে কথ্যভাষার বাক্রীতি তাঁর গদ্যভাষাকে যেভাবে স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দগতি এবং সজীব করে তুলেছে তার তুলনা এখনও দুর্লভ।

হরপ্রসাদ তাঁর গদ্যরচনায় যে রেজিস্টার বা ভাষাভঙ্গির ছক গ্রহণ করেন তা ন্যারেটিভের দেশজরীতি। আমরা এখানে ন্যারেটিভকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করছি। একজন আধুনিক ফরাসি ঔপন্যাসিক যথার্থই বলেছেন :

> 'ন্যারেটিভ হচ্ছে এমন একটি ব্যাপার যা সাহিত্যের গণ্ডির বাইরেও প্রসারিত ; এটি বাস্তবকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের অন্যতম ; আমরা সকল সময়েই ন্যারেটিভের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি, প্রথমে আমাদের পরিবারে, পরে বিদ্যালয়ে, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং পাঠের মাধ্যমে।'[৭]

আধুনিক দার্শনিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনা অনুসরণ করে বলা যায়, ন্যারেটিভ মানুষের মৌল ভাষাগত কার্যকলাপ (Linguistic activity), বাস্তবকে উপলব্ধি করার প্রাথমিক ক্যাটিগরি ; বিমূর্ত (abstract)

৭. Michel Butor, "The Novel as Research", Warner Berthoff, *Fiction and Events*, New York, 1971. গ্রন্থে উদ্ধৃত।

বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্থান তার পরে। কাহিনী কথকের সঙ্গে তাঁর শ্রোতা পাঠকসমাজের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। আর প্রতিটি মানুষইতো কাহিনী কথক।

এই ন্যারেটিভ—জনজীবন, জনসংস্কৃতির গভীরে যার মূল প্রসারিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জীবনাভিজ্ঞতার টানে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাতেই তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানচর্চা মোটামুটিভাবে এক প্রাণময় সমগ্রতায় সার্থকতা পেয়েছিল। আমাদের দেশের আদ্যিকালের গল্প কথনের প্রক্রিয়ায় বাক্যের যে বিশেষ ছাঁদ ও বিন্যাস তৈরি হয়, শাস্ত্রীমশাই তাঁর গদ্যরূপ নির্মাণে প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থানে এবং 'বেণের মেয়ে'-র মত পরিণত উপন্যাসে প্রকাশরীতির প্রাথমিক ইউনিটরূপে সেই ছাঁদ ও বিন্যাসই ব্যবহার করেন। এটাও তাঁর এক ধরনের সমগ্রতাবোধ এবং চারিত্রের প্রমাণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে শাস্ত্রীমশাই বলেছেন, বাঙলা ভাষার সর্বপ্রধান লেখকও তাঁর 'কথামালা' থেকে অনেক উপকার লাভ করতে পারেন। বিদ্যাসাগরের এই ছাত্র-পাঠ্য পুস্তকটিকে শাস্ত্রীমশাই যে গুরুত্ব দেন, ন্যারেটিভঘটিত ভাষার জীবন্ত কথ্যছন্দের প্রতি আকর্ষণই কি তার কারণ নয়? বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায়ও শাস্ত্রীমশাইয়ের গদ্যরীতি চর্চার এই সজীবতা স্পষ্ট হয়।

লেখকরা অনেক সময় তাঁদের পাঠকসমাজের রুচি ও প্রবণতার চাপ মেনে নিয়ে, কখনও বা তাকে অতিক্রম করে নিজের মানস বা পুরুষার্থ অনুযায়ী একটা সুসংহত পাঠকসমাজ বা শ্রোতৃমণ্ডলী কল্পনা করে নেন। তাদের রচনা পাঠকেরা কীভাবে পড়বে বা গ্রহণ করবে তার জন্য রচনায় নানা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সূত্র, কলাকৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠকদের বিশেষ ভূমিকা তৈরি করে দেন। কোনো কোনো সমালোচক এর নাম দিয়েছেন ফিকশনাল রীডারস্। এটা তাঁদের রচনার সাংগঠনিক ছকেরই অংশ, এর মধ্য দিয়ে লেখকেরা নিজের অভীপ্সা অনুযায়ী পাঠকদের দ্বারা ভূমিকা পালন করিয়ে নেন। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকসমাজ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শাস্ত্রীমশাইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, মানসী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকসমাজের সঙ্গে হরপ্রসাদের পাঠকদের চরিত্রগত কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু শাস্ত্রীমশাই তাঁর প্রবন্ধের পাঠকদের গল্পকথন, কথকতা জাতীয় আসরের শ্রোতারূপেই কল্পনা করে নিয়েছেন। এলিটিস্ট মনোভাবের বশে তাদের কাছ থেকে পাণ্ডিত্য, উচ্চমানের বিদ্যাবুদ্ধি, তাঁর কাছে পৌঁছোবার যোগ্যতা অর্জনের দাবি

করেন নি। পাঠকদের কাছে নিজের বৈদগ্ধ্য, নৈয়ায়িক বুদ্ধির চাতুর্য এবং রচনাকুশলতা প্রদর্শন করতে চান নি। তাঁর বাস্তব পাঠকদের শ্রেণীচরিত্র যাই হোক, তিনি সেই সীমায় নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ না করে বৃহত্তর পাঠকসমাজকে নিবিড়ভাবে পেতে চেয়েছেন। স্বভাবতই ন্যারেটিভের দেশজরীতি এর সর্বোত্তম মাধ্যম। বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের প্রচণ্ড চাপের কথা মনে রাখলে (ব্যতিক্রম সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) গদ্যরীতির ক্ষেত্রে শাস্ত্রীমশাইয়ের এভাবে নিজের পথ তৈরি করে নেওয়ার আত্মনির্ভর সাহসিকতা তথা চারিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্তত এ ক্ষেত্রে তার কোনো প্রত্যক্ষ অবলম্বন ছিল না।

হরপ্রসাদ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখায় বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর এবং উনবিংশ শতাব্দীর 'ইংরেজিওয়ালা'-দের অতিমাত্রায় সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের গুরুগম্ভীর চালকে সমানভাবে ধিক্কার দিয়েছেন। হরপ্রসাদের সমগ্র বাঙলা ভাষা রীতির চর্চায় এলিটিস্ট মনোভাবের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোবার জন্য উৎকণ্ঠার ইঙ্গিত পাই। 'তবে ভাল কথা বলিতে যদি মন্দ কথা বলি' (বাঙ্গালা ভাষা) ; 'কথাটি এই যে' (ঐ) ; 'বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর একরকম' (হিন্দু ও বৌদ্ধ তফাৎ) ; 'উর্বশী অপ্সরা, থাকেন স্বর্গে' (কালিদাসের মেয়ে দেখান) ; 'ইরাবতী তো দাসী' (ইরাবতী) ; 'আরও একটা কথা, দেবতাদের একজন নূতন সেনাপতির দরকার' (পার্বতীর প্রণয়) ; —অনুচ্ছেদের এই মুখবন্ধ-বাক্য বা খণ্ডবাক্যগুলোয় (কিংবা 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে'র একটি অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে : 'দেখুন, প্রায় বাহান্ন বছর পরেও সেদিনের কথা আমার কেমন মনে আছে') ন্যারেটিভঘটিত কথ্য ভাষার চালে গল্পকথকের মত লেখকের অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বরটি পরিষ্কারভাবেই শুনতে পাই। অনুচ্ছেদ আরম্ভ করার ধাঁচ লেখকের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য বোঝার অন্যতম উপায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাসস্থান জেমোগ্রামে তাঁর স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় শাস্ত্রীমশাই সম্মেলন স্থানটির একটি ছবি এই অংশে তুলে ধরেছেন :

> 'স্থানটি অতি মনোরম। কান্দীর স্কুলের একটু দক্ষিণে একটি ছোট খাল—খালের উপর একটি পুল—পুলের একটু দক্ষিণে পান্থশালা ও তাহার দক্ষিণে পুষ্করিণী। মাঠ তিন দিকে ধূ ধূ করিতেছে—উত্তরে স্কুল কোর্ট কাছারী ডাকবাঙ্গালা ও কয়েকজন উকীলের বাড়ী।

> সামিয়ানার নীচে বেঞ্চ ও চেয়ার সাজান। কিন্তু চারিপাশে বেশী লোকই দাঁড়াইয়া। রৌদ্রে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইয়াছিল, রৌদ্র পাড়ল, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল।' (পুরান বাংগালার একটি খণ্ড)

এখানে স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাক্যগুলোয়, ক্রিয়াপদ বর্জিত সংক্ষিপ্তরূপে, বাঙলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌বিধি অনুযায়ী শব্দ-দ্বিরুক্তিসহ শুধু মাঝখানে ক্রিয়াপদের সাহায্যে আঁকা শূন্যতার ছবিতে, পঞ্চম বাক্যটির অন্তে বিশেষণের মত অসমাপিকার ব্যবহারে—লেখকের কণ্ঠস্বরাশ্রিত এই ন্যারেটিভরীতিসুলভ প্রত্যক্ষ বাস্তব বর্ণনার সূত্রে বর্ণিত বিষয়ের একেবারে মাঝখানে পাঠককে টেনে এনে লেখকের অভিজ্ঞতার অংশীদার করা হয়েছে। পাঠকের চোখের সামনে পুরো ছবিটা বর্তমানের দৃশ্য হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। প্রথমের দৃশ্য বর্ণনায় 'করিতেছে'-এর বর্তমান ক্রিয়াপদ থেকে লেখক যখন ঘটনা-বিবৃতির অংশে 'হইয়াছিল' 'পড়িল' ইত্যাদি অতীত কালের ক্রিয়াপদে চলে আসেন তখনো কোনো ছন্দপতন ঘটে না। সমালোচকেরা যাকে বলেছেন ন্যারেটিভ, অতীতকালের ক্রিয়া পদের বর্তমানকালীনতা, তার সচল টানে বিধৃত হয়ে দ্বিতীয় অংশটি একটা অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার অংগরূপে পাঠককে টেনে রাখে। 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল-পাড়ায়' রচনাটিতে দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী মনীষীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়েও শাস্ত্রীমশাই তাঁকে ঘিরে কোনো অত্যুচ্চ মহিমার জ্যোতির্লোক রচনা কিংবা তাঁর ঘনিষ্ঠসান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ও আত্মগৌরব প্রদর্শনের মোহে নিজের সংগে পাঠকদের দূরত্ব সৃষ্টি করেন নি, এখানেও তাদের অন্তরংগ বন্ধুর মতই পেতে চেয়েছেন। মংগলকাব্যের মত দেশজ ন্যারেটিভ রীতির কাব্যধারায় প্রত্যক্ষ বাস্তবের রসগ্রাহী যে ঐহিক দৃষ্টিভংগী দেখা যায়, শাস্ত্রীমশাই তার টানে, সেই ন্যারেটিভের বিন্যাসেই খুঁটিনাটি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির আশেপাশের পরিবেশকে বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তোলেন। যেমন এই অংশে :

> 'রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চক্‌চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়; প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রী হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাদি লাগিয়া যায়, আট দশ খানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটরভাজা, চিঁড়ে,

চিঁড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়োর ও খাজা থাকিত ; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না।'

বর্ণনায় এই দ্বিধাহীন বস্তুগত ঝোঁক, যত আপাততুচ্ছই হোক, প্রতিটি খাদ্য-বস্তুর সযত্ন মমতাময় উল্লেখ প্রমাণ দেয় যে লেখকের মানস আত্মাভিমান, উচ্চ-শিক্ষা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বাধ (inhibition) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি নিজের সঙ্গে পাঠকের কোনো ব্যবধান রাখতে চান নি। পাঠককে সমস্ত কিছু জানাবার আগ্রহে 'ময়রার দোকানে আগে যে ঘিয়োর ও খাজা থাকিত, এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না'—এই তথ্যটুকুও উল্লেখ করেছেন। পাঠকদের গল্পকথনের আসরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শ্রোতারূপে গ্রহণ করার প্রয়াসে ন্যারেটিভের দেশজ রীতিতেই এই বাস্তব জীবন-রসবোধ যথার্থ অবলম্বন পায়। বঙ্কিমচন্দ্রও ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত বাক্য ও খণ্ডবাক্য যোজনায় প্যারাট্যাক্সিসের ধাঁচ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সে শুধু বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তার আলংকারিক গতিছন্দ সৃষ্টির জন্য। শব্দ-পদ সমাবেশে তিনি রীতিমত সংস্কৃতপন্থী, আড়ম্বরপূর্ণ আলংকারিক সাজসজ্জার ভক্ত। আর শাস্ত্রীমশাইয়ের রচনার উদ্ধৃত অংশগুলোর প্যারাট্যাকটিক বিন্যাস পুরোপুরি ভাবে ন্যারেটিভের কথ্যভাষা-ভিত্তিক দেশজরীতির, তদ্ভব ক্রিয়াপদের রূপে (এমন কি ঘষে মেজে ইত্যাদি কথ্যভাষার রূপও নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়েছে) যেমন তেমনি শব্দ সন্নিবেশেও তিনি কথ্যভাষার ওপরই নির্ভর করেছেন।

হাতের কাছে বিকল্প থাকা সত্ত্বেও একজন লেখক যখন বারবার বিশেষ ধরনের শব্দ ও বাক্‌রীতি ব্যবহার করেন এবং সেই পুনরাবৃত্তি একটা সুস্পষ্ট প্যাটার্ন হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাঁর সেই মনোনয়ন বা বাছাই (আধুনিক শৈলীতত্ত্বে যাকে choice বলা হয়েছে) থেকে তাঁর মানস ও প্রকাশরীতির বৈশিষ্ট্যের একটা হদিশ পেয়ে যাই। শাস্ত্রীমশাই সাধুরীতির রূপ ব্যবহারের সহজ সুযোগ থাকলেও তার দিকে ঝোঁকেন নি, কথ্যরূপই ব্যবহার করেছেন : 'নদীর খোলা' (নদীগর্ভ, নদীর তলদেশ), 'কত চটালো' (প্রশস্ত), 'কত গহেরা' (গভীর), 'ঋষিদিগের অনেক বাঁধাবাঁধি নিয়ম একটু আলগা (শিথিল) হইতে লাগিল' (ব্রাত্য), 'তীর হইবার যো (উপায়) নাই' (মেঘদূত), 'শইগাছ' (সমীলতা, কালিদাসের মেয়ে দেখান), 'সোঁদালের' (কর্ণিকার, কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা) ; 'বিশ্বাস হইল না, কিন্তু মনে করিলাম, হবেও বা' (ঐ) ইত্যাদি। হবেও বা-র পরিবর্তে 'হওয়া অসম্ভব নয়' 'হইতে পারে' 'হইলেও হইতে পারে' ইত্যাদি ব্যবহার করলে অর্থের দিক থেকে খুব একটা ক্ষতি হত

না, কিন্তু চলিত রূপের মধ্য দিয়ে পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারিত লেখকের কণ্ঠস্বর যে উষ্ণ হৃদ্যতার স্বাদ এনে দেয় সেটিকে আর পাওয়া যেত না। 'নৈলে বাহাদুরী হয় না' (বাংগালা ব্যাকরণ)—এখানে 'নৈলের' বদলে 'নতুবা' ব্যবহৃত হলে বাঙলা ব্যাকরণ রচয়িতাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের বাহাদুরীকে ধিক্কার দেবার যে জোরালো কন্ঠস্বরটি শুনি, সেটা হারিয়ে যেত। 'ইরাবতী' প্রবন্ধে পাঠকদের একটি ঘনিষ্ঠ আসরে জমায়েত শ্রোতারূপেই গ্রহণ করেন। ইরাবতীর ভাগ্যবিপর্যয়কে গল্প কথনের হার্দ্য কণ্ঠস্বরে, ছোট ছোট সহজ সরল বাক্যে পাঠকদের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলে তৃতীয় অঙ্কের ব্যাখ্যার শেষে একটি অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে বলেন, 'তৃতীয় অংকের শেষে রাজাতে ও ইরাবতীতে একরকম কাটান ছিড়ান হইয়া গিয়াছে।' আগেকার অংশে শ্রোতা-পাঠকদের কালিদাসের নাটকের রসগ্রহণের যে স্বচ্ছন্দ মেজাজ লেখক তৈরি করে দেন, তাকে লালন করতে গিয়ে রাজা ও ইরাবতীর সম্বন্ধের পরিণতি নির্দেশেও 'বিচ্ছেদ' না লিখে মৌখিক ভাষার শব্দ 'কাটান ছিড়ান' লেখেন। কাহিনীকথনের দেশজ ভাষার চালেই কালিদাসের আলংকারিক রচনার কাহিনীও পাঠকদের কাছে প্রত্যক্ষ ঘটনার বস্তুরসে সিঞ্চিত হয়। 'বিদ্যাসাগর প্রসংগে' শাস্ত্রীমশাই গল্প কথনের সেই দেশজ রীতিতেই বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত আচরণের একটি কাহিনী অত্যন্ত জীবন্ত ও হৃদয়-গ্রাহী করে তুলেছেন। এটি তাঁর বাল্যকালের কথা। নৈহাটিতে কায়স্থের পাত থেকে রুইমাছের মুড়ো কেড়ে খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের বাড়িতে প্রথমে মেয়েমহলে তুমুল সোরগোল তিনি শুনতে পান ঃ

> 'একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়ে মহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে —ওমা এমন ত কখনও শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুই মাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে। কেউ বলিল—ঘোর কলি! কেউ বলিল—সব একাকার হয়ে যাবে; কেউ বলিল—জাতজন্ম আর থাকবে না।'

এখানে বিভিন্ন নারীকণ্ঠের উক্তিগুলি যেন আমাদের কানে বাজতে থাকে। বিদ্যাসাগরের আচরণ সম্বন্ধে মেয়েমহলের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বাস্তব রস-সিক্ত চিত্রটি দেবার পর লেখক ন্যারেটিভের সেই সহজ ধারায়ই পরের অনুচ্ছেদের প্রথমে বাড়ির পুরুষদের সম্বন্ধে বলেন, 'বাড়ির পুরুষদেরও দেখিলাম সব মুখ ভার।'

বিদ্যাসাগরের এই ব্যবহার কারুর পছন্দ হয়নি, উল্লেখ করার পর শাস্ত্রী-মশাই একটি ছোট্ট মন্তব্য করেন, 'না করিবারই কথা'। এর মধ্য দিয়ে এই

বিরূপতার পশ্চাদপটের জন্য পাঠকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। তারপর তিনি 'না করিবারই কথা'-র নেপথ্য কাহিনী বিবৃত করেন। সেই বছরেরই প্রথম বর্ষায় একদিন তাঁর দাদা, নতুন ভগ্নীপতি এবং জ্যাঠতুত ভাই এই তিনজন গোয়ালঘরে লুকিয়ে মসুরি ডালের খিচুরি রেঁধে খেয়েছিলেন। সেই অপরাধে বাড়ির 'বুড়ো কর্তা' তিনজনকেই বাড়ি থেকে বার করে দেন। তাঁরা এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় শুয়ে থাকতেন। লেখকের মায়ের কাকুতি মিনতিতে বুড়ো কর্তা 'বৈধ গংগাস্নান' করিয়ে ভগ্নীপতিকে প্রায় পনের দিন পরে আসতে দেন। অন্য দুজনের আরও পনের দিন লেগেছিল। সুতরাং, 'সে-বাড়ির লোকে মেয়ে-পুরুষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ব্যবহারে যে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন, সে কথা কি আর বলিতে।' পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারিত কথ্যভাষার চালের এই শেষ বাক্যটির ব্যংগ ও পরিহাসমূলক স্বরভংগিতে শাস্ত্রীমশাই বিদ্যাসাগরের সংস্কারবিরোধী আচরণের কী তাৎপর্য পাঠকদের মনে ধরিয়ে দিতে চান তা আর অস্পষ্ট থাকে না। 'না করিবারই কথা' এই বাক্যে যে ব্যংগ-পরিহাসমূলক স্বরভংগির আভাস আমাদের কানে বাজে, বড়ভাই-ভগ্নীপতির প্রায়শ্চিত্তের কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে সেটি শেষ বাক্যের জোরালো (emphatic) উচ্চারণে অর্থময় মন্তব্যের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শাস্ত্রীমশাইয়ের মানসের নিজস্ব টানেই স্বাভাবিকভাবে গল্প কথনের আবহ তৈরি হয়ে যায়। পাঠক তার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। সেই ন্যারেটিভঘটিত সম্বন্ধ-পাতে, কথ্যভাষার চালে বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব বাস্তব, জীবন্ত সত্যরূপে পাঠকের মনে যেভাবে গভীর দাগ কাটে, গতানুগতিক বিশ্লেষণে তা সম্ভব হত মনে হয় না। এই রচনারই বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত আর একটি উক্তি স্মরণীয়। বিদ্যাসাগর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংগে কথা বলছিলেন:

> 'আশুবাবু উঠিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কোথা এসেছিলি? আমি বলিলাম—আপনি এত কাছে আছেন, তাই মনে করিয়াছি, যদি আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়ীতে পড়ে। বিদ্যাসাগর বলিলেন—কিন্তু তুই যে এদিক দিয়ে এলি? আমি ভাবিলাম—দুষ্টু বুড়া তাও দেখিয়াছে।'

শেষের খণ্ড বাক্যটিতে যে দেশজ কথনরীতির কৌতুকসরস প্রাণময়তা এবং আন্তরিকতার উষ্ণ স্বাদ মেলে আমরা তা হারাতে বসেছি। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এই নিঃসংকোচ, বাস্তব জীবনরসের উত্তাপে পূর্ণ, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বাক্‌ছন্দ কত যথার্থ বলে মনে হয়।

'বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়', 'কালিদাসের মেয়ে দেখান', 'পার্বতীর প্রণয়', 'বিরহে পাগল', 'শকুন্তলার মা', 'দুর্বাসার শাপ', 'এক এক রাজার তিন তিন রাণী', 'সীতার স্বপ্ন', 'কোমলে কঠোর', 'কর্ণের কোমল মূর্ত্তি'—প্রবন্ধের এই নামকরণেও তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যারেটিভের মেজাজ আভাসিত। 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসটির মুখবন্ধে শাস্ত্রীমশাইয়ের পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর লিখন পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি বহুকাল তাঁহার শ্রুতিধারক হইয়া তাঁহার প্রবন্ধাবলী লিখিয়া যাইতাম এবং তিনি বলিয়া যাইতেন, এইরূপে বহু প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল।' এটা তাঁর প্রবন্ধের কথ্য ভাষাভঙ্গির প্রধান কারণ মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আমরা যখন সাধারণভাবে কথা বলি, তখন আমাদের মানসিক প্রবণতা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমাদের উক্তিগুলো নানা ছাঁচ বা ভঙ্গির রূপ নেয়। আর শ্রুতি লিখনে বক্তা তাঁর মনের ভাবনা চিন্তা সচেতনভাবে, একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী যেভাবে বিভিন্ন উক্তিতে প্রকাশ করে যান, তাতে তাঁর ভাষাভঙ্গিগত কর্তৃত্ব থাকে অনেক বেশি। চূড়ান্ত স্তরে, শাস্ত্রীমশাইয়ের নিজস্ব পরিমার্জনায় তাঁর প্রবন্ধের ভাষারীতি পুরোপুরিভাবেই সচেতন শৈলীগত নির্বাচনের বিষয় হয়ে উঠত। বিনয়তোষ এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'তাঁহার শেষজীবনে তিনি সংস্কৃত বিভক্তি-প্রত্যয় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহারের পক্ষপাতী একেবারে ছিলেন না। প্রত্যেক প্রবন্ধ শুদ্ধ করিবার সময় এই জিনিসটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, সময়ে সময়ে সাধারণ সংস্কৃত শব্দগুলিও বদলাইয়া দিতেন। তিনি 'সহস্রের' পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বলিতেন ও লিখিতেন হাজার।'[৮] শাস্ত্রীমশাই নিজে লিখলেও তাঁর ভাষারীতির মূল চরিত্র একই থাকত, তবে শ্রুতিলিখনের ফলে কোথাও কোথাও তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত প্রবন্ধে বৈদগ্ধ্যমূলক, যুক্তিশৃংখলা নির্ভর বিশ্লেষণের পরোক্ষ বিন্যাসের গুরুগম্ভীর চাল প্রত্যাশিত, সেখানেও তিনি লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধের অন্তরঙ্গতাবোধে থেকে থেকেই ঐ দেশজ কথনরীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। যেমন, 'শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটিকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল' (হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ); 'বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর একরকমের' (অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য, ঐ); 'তার আগে সব ফস্কা' ('আমাদের ইতিহাস'-এর একটি অনুচ্ছেদ-এর শেষ বাক্য)। বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান বা এলিটিস্ট মনোভাব

৮. বর্তমান সংকলনে শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন-এর প্রবন্ধে শাস্ত্রীমহাশয়ের ভাষা সংশোধন-রীতির বিবরণ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৫৯

থাকলে 'তার আগে সব ফস্‌কা' এমন হাল্‌কা চালের বাক্য ব্যবহার সম্ভব হত না।

ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধের কঠিন ও জটিল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও শাস্ত্রীমশাই লেখক-পাঠকের সেই সহজ, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ছক তথা দেশজ কথনরীতি ত্যাগ করতে পারেন নি। যেমন: 'প্রজ্ঞাপারমিতা পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে এবং প্রজ্ঞাপারমিতার ক্রিয়াকর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরো বেশী দিন লাগে। এত ত তুমি পারিবে না বাপু, তুমি মন্ত্রটী জপ কর, তাহা হইলে সব ফল পাইবে। যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁটি হইয়া গেল।' 'এক বাপের দুই ছেলে' (অশ্বঘোষের একটি শ্লোকের অনুবাদ)। 'তাহা হইলে ত বেশ হইল' (অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য)। 'আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কি নূতন কথা বাহির করিয়াছেন?' 'তিনি (বুদ্ধদেব) বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভাল নয়; কেবল ভাল খাব, ভাল পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভাল নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভাল নয়',—ইত্যাদি। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি আর্যদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব সম্পর্কে শাস্ত্রীমশাই বলেছেন, 'যাহাদিগকে তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু-পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিলগণ তাঁহাদের কাছে বানর। কর্ণাটগণ হয়ত ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাঙ্গালার লোক পাখী।' ছোট ছোট বাক্যের দেশজরীতিসুলভ প্যারাট্যাকটিক বিন্যাসে, 'রোগ' শব্দটির বাঙলা ভাষার বিশিষ্টার্থক প্রয়োগে আর্যদের সংকীর্ণ মানসিকতা লেখক প্রত্যক্ষভাবেই নির্দেশ করেন। 'বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখীর দেশেই জন্মান' —পরের অনুচ্ছেদের এই প্রথম বাক্যটির দেশজরীতির সহজ চালে আর্য ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবক্ষেত্র পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্যগত পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যের ধারণা তিনি পাঠকদের মনে ছড়িয়ে দেন।

শাস্ত্রীমশাই অবলীলাক্রমে তাঁর প্রবন্ধের সাধুভাষার কাঠামোয় ক্রিয়াপদের চলিত রূপ ব্যবহার করেছেন। এমন কি কোথাও কোথাও শব্দে উচ্চারণের মৌখিক রূপটি পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। যেমন: 'সাঁকারির করাত', 'পাতরের', 'পুঁতুল', 'আঁবের কলম', 'নেবু', 'চ্যাটাল' ইত্যাদি। কোথাও বা আঞ্চলিক ভাষার (dialect) শব্দও ব্যবহার করেছেন: 'দিব্য মোটাসোটা নুনধুগড়িপানা ছেলে', 'নাদবুড়ো গন্ধ', 'দোবজা কাঁধ',

'বাঙ্গালদেগুলিকে', 'ঝিঁকুড়' (বামুনের দুর্গোৎসব); 'সুঁয়ার ঠিক নীচে', 'জিয়াঁচ পোয়াতী' (হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ) ইত্যাদি। নিজের গদ্যকে বৈদগ্ধ্যমার্জিত ও মসৃণ করে তোলার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে দেশজ জীবন ও সংস্কৃতির প্রাণরসে পুষ্ট নিজের সত্তার গভীরতম নির্দেশে চালিত হয়েছেন বলেই শিক্ষিত, জনজীবনের সম্পর্কবিহীন, পরগাছা মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বনায় তাঁকে আড়ষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয় নি। তাঁর গদ্যের সজীব স্রোতে লোকভাষার মিশ্রণ স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে।

অবশ্য একটি দিক থেকে শাস্ত্রীমশাইয়ের গদ্যচর্চার অপূর্ণতা নির্দেশ করা যায়। আধুনিক স্ট্রাকচারালিস্ট সমালোচকদের আলোচনা অনুসরণ করে থীম বা বিষয়বস্তুকে কণ্টেণ্ট ও ফর্মের সাবেক বিভাজন রেখায় না দেখে লেখকের চর্চার বা প্রকাশভঙ্গির অবিচ্ছিন্ন অংগ হিসেবে দেখতে পারি। থীম দুরকমের : প্রথমটি হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয় প্রসংগে নানা লোকের, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর চিন্তায় আলোড়ন-আন্দোলনে ও রচনায় যা সামাজিক অবয়ব পায়, চিন্তার প্রণালী-প্রকরণের ঐতিহ্য তৈরি করে; আর লেখকের নিজস্ব রূপায়ণে দ্বিতীয় থীম পাই। প্রথমটিকে বলতে পারি লেখকের মানস জগতের ল্যাংগু (langue), দ্বিতীয়টি তাঁর প্যারোল (parole)। থীমের গ্রহণে যেমন, তেমনি তার বর্জনেও (যা তাঁর এক জাতীয় রচনাশৈলীগত নির্বাচন, রচনাশৈলীরই একটি দিক) লেখকের মানসের বিশেষ প্রবণতা বা রচনাশৈলীগত বৈশিষ্ট্যের হদিশ কখনও কখনও মিলে যেতে পারে, বিশেষ গদ্য রচনার ক্ষেত্রে। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রধান প্রধান গদ্য লেখকেরা সকলেই সামাজিক-রাজনৈতিক নানা প্রশ্নে, প্রসংগে, মতামতের দ্বন্দ্বে আলোড়িত হয়েছেন, নিজেদের বিশ্বাস প্রত্যয় অনুযায়ী তর্কবিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কেউ কেউ তার জন্য ঝুঁকিও নিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সামাজিক আন্দোলনঘটিত বাদ প্রতিবাদে লিপ্ত হয়েছেন, প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন. তার ফলে তাঁর গদ্যে তীক্ষ্নতা ও বৈচিত্র্য এসেছে। আমাদের পরাধীন অস্তিত্বের গ্লানি ও সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছিল, তিনি তার সম্মুখীন হয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজস্ব ভাবাদর্শ অনুযায়ী সমাধান খুঁজেছেন। সেই সূত্রেই তাঁর নকশা জাতীয় রচনা ও বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধগুলো তীক্ষ্নতায় ও বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই মাত্রা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায় দুর্লক্ষ্য। বহু বিষয় নিয়েই শাস্ত্রীমশাই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তিনি চিন্তিত হননি, যেন সযত্নে পরিহার করেছেন। বিশেষত, বিদ্যাসাগরের সজীব, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং

বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেও শাস্ত্রীমশাই যে সামাজিক-রাজনৈতিক বিচার্য-বিষয় বা ইস্যু নিয়ে আলোড়িত-উদ্‌বেজিত হননি, নিছক অ্যাকাডেমিক সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে পা বাড়াতে চাননি, তাতে কিছুটা আশ্চর্য বোধই করতে হয়। বিতর্ক বা বিচার্য বিষয়ের পরিগ্রহণে যে তীক্ষ্ণতা ও গতিশীলতা (dynamism) রচনায় ফুটে ওঠে, শাস্ত্রীমশাইয়ের রচনায় তার অভাব সুস্পষ্ট। হরপ্রসাদের প্রবন্ধগুলোকে সামগ্রিক চেহারায় দেখবার চেষ্টা করলে মনে হয়, তাঁর রচনাভঙ্গী মূলত বর্ণনাত্মক, কণ্ঠস্বর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুত্তেজিত, স্থির, এক গ্রামে বাঁধা ; বিচার-বিশ্লেষণ, মতামতের সংঘর্ষে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজস্ব বিশ্বাস-প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তীক্ষ্ণ, দীপ্ত ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ নয়।

কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বাঙলা গদ্যের চর্চায় হরপ্রসাদের নিজস্ব ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে জনজীবন ও তার সংস্কৃতির যে দুস্তর বিচ্ছেদ এই আলোচনার প্রথমাংশে উল্লিখিত হয়েছে, আমাদের রেনেশাঁসের পুরোধাদের কেউ কেউ বিভিন্ন স্তরে সেই বিচ্ছেদ অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। সচেতন বা অচেতনভাবে সেই দেশজধারার সঙ্গে সম্বন্ধপাতে নিজেদের স্বরূপ সন্ধানের সমস্যা ও যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছেন, যার উদাহরণ মেলে মধুসূদন-দীনবন্ধুর রচনায়, বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মে। গদ্যরীতি চর্চার নিজস্ব চারিত্রেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের রেনেশাঁসের সেই ধারার নমস্য উত্তরসাধক।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা-সূত্র ইত্যাদি শৈলীতত্ত্বে যে রকম কিছুটা শিথিল ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

হরপ্রসাদের মানসচরিত্র

নৈহাটির নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য বংশে হরপ্রসাদের জন্ম হয় সিপাহী বিদ্রোহের চার বছর আগে। নৈহাটি থেকে বারাকপুর বেশি দূর নয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের খবর বা আতঙ্ক নৈহাটির মানুষের মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয় না। অন্তত হরপ্রসাদের শৈশব স্মৃতিতে তার কোনো উল্লেখ নেই। নৈহাটি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র ভাটপাড়ার অতি সংলগ্ন। এখানে হরপ্রসাদের পূর্বপুরুষের ন্যায়শাস্ত্রের টোল ছিল। বারো তেরো বছর পর্যন্ত হরপ্রসাদ (তখন তাঁর নাম শরৎনাথ) নৈহাটিতেই ছিলেন—কেবল মাঝে বছর খানেক কান্দীতে ছিলেন জ্যেষ্ঠাগ্রজের সঙ্গে। কান্দী অ্যাংলোসংস্কৃত স্কুলে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। কিছুদিন কাঁটালপাড়ার টোলে ও নৈহাটির স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করেন। জন্মের নয় বছরের মধ্যে পিতা ও জ্যেষ্ঠাগ্রজের মৃত্যুতে অশেষ অর্থকষ্ট ভোগ করেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ চার বছর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সে সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। বোধকরি সেই সূত্রেই হরপ্রসাদ তের বছর বয়সে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়তে এসে বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে আশ্রয়লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে ছাত্র থাকাকালে তাঁর দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। খুব ভালো ছাত্র ছিলেন বলে বৃত্তিলাভ করেছিলেন এবং প্রধানত এই বৃত্তির উপর ভরসা করেই তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পর্যন্ত পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ছিলেন এগারো বছর—১৮৬৬ থেকে ১৮৭৭। এই এগারোটি বছর কলকাতার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৭ সালে চৈত্র-সংক্রান্তিতে হিন্দু মেলার

প্রথম অধিবেশন হয়। পরবর্তী কয় বছর বেশ সমারোহে হিন্দু মেলার অধিবেশন হয়েছিল। কলকাতার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এই সব অধিবেশনে রচনা পাঠ করে পুরস্কার লাভ করেছেন। অন্যদিকে এই সময় (১৮৬৫-১৮৬৯) ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রবল বিরোধ হয়। ফলে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে আসেন। আবার ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নতুন বিরোধ দেখা দেয়। ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৮৭৬ সালে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় এই সময় (১৮৭২) পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নীলদর্পণের অভিনয় নিয়ে বেশ উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। ১৮৭৬ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব ঘটনা থেকে মনে হয়, এই এগারো বছরের ইতিহাসে কলকাতা অনেক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে। হরপ্রসাদ তখন কলকাতায় থেকেও এর কোনোটির সঙ্গে যুক্ত হন নি। বোধকরি দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে তার অবকাশও বিশেষ ছিল না। ছাত্রাবস্থায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৭৫ সালে এক পুরস্কারের প্রত্যাশায় 'ভারত মহিলা' নামে প্রবন্ধ রচনা। প্রবন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত রচয়িতাদের ধারণা অনুযায়ী ভারতীয় নারী চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে লেখকের নিজস্ব মত কিছু ব্যক্ত হয়নি। প্রাচীন পণ্ডিতবর্গের ধ্যান-ধারণা শ্রদ্ধার সঙ্গে সংকলিত হয়েছে। এই কলেজীয় প্রবন্ধেই হরপ্রসাদের মনের দুটি প্রবণতার সূচনা—প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও রক্ষণশীলতা। বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ক্রমে বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত' বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত হরপ্রসাদের সাহিত্য চর্চার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, যদিও তাঁর ভাষার স্টাইল তাঁর নিজস্ব। হোলকার পুরস্কারের প্রত্যাশায় প্রবন্ধ রচনা না করলে এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় সে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে ছাপানোর সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না ঘটলে হরপ্রসাদের বাঙলা সাহিত্য চর্চায় প্রবেশ সহজ হত না। বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ বলেছেন, 'প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্যে কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা বঙ্কিমবাবুকে

খুশী করিব।' হরপ্রসাদের বাঙলা রচনার পিছনে আরেকজনের কৃতিত্ব আছে। তিনি সংস্কৃত কলেজের লেকচারার শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে হরপ্রসাদ বলেছিলেন 'আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির চেলা।' এই জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র খুশি হয়ে বলেন, 'ও! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গালা বাহির হইবে না।'

কেবল কাঞ্চনমালা ও বেণের মেয়ে উপন্যাসের রচয়িতা রূপে হরপ্রসাদ বাঙলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারতেন বটে, কিন্তু হরপ্রসাদের কাছে এ দেশের যে ঋণ তা কেবল উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, এমন কি সাহিত্য চর্চা বা বাঙলা গদ্যে এক বিশেষ স্টাইলের জন্যেও নয়। হরপ্রসাদ তাঁর জীবনসাধনার স্বক্ষেত্র খুঁজে পান সংস্কৃত কলেজ থেকে বেরিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সান্নিধ্যে এসে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হরপ্রসাদের জীবনে নানা দিক থেকে তাৎপর্যমণ্ডিত। পুরাতত্ত্বচর্চায় আগ্রহ, এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যোগ, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে উৎসাহ এবং সর্বোপরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত মন—এ তিনি রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে যুগে 'বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল' হরপ্রসাদ সেই যুগে 'জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার' যোগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাধন প্রণালী সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের প্রভাব যেমন ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত কলেজের গোঁড়ামি থেকে হরপ্রসাদকে মুক্তি দিয়েছিল, পুরাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত বিচারশক্তি প্রয়োগে তাঁকে তেমনি সাহায্য করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথের মনে যে 'এই দুইজনের চরিত্রচিত্র মিলিত' হয়েছিল, তা অমূলক নয়। হরপ্রসাদের সংস্কারমুক্ত বিচারশক্তির এক বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা যায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রমানাথ সরস্বতীর 'ঋগ্বেদসংহিতা'-র সমালোচনা সূত্রে বেদ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে। মন্তব্যটি একটু সবিস্তারে উল্লেখ করা হল: 'বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়ভক্তিসম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়।—অজ্ঞ লোকের সংস্কার, বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য।...কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্নভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র।—যাঁহারা কেবল সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত; তাঁহারা এই অংশটী

পাঠ করিতে বিরত হইবেন। প্যালগ্রেভস গোল্ডেন ট্রেজারী অফ সংস্ এণ্ড লিরিকস…হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই।…গীত-সংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্ম্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথা ব্যথা কেন? প্রধান কারণ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার আর সন্দেহ নাই।…আর এক কথা এই যে, যে কালে বেদ রচিত হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই,…সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক।' এমন নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বেদের কথা হরপ্রসাদ ছাড়া আর কে বলেছেন?

হরপ্রসাদের মানসচরিত্র গঠনে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর পরিবারেই শোনেন। তারপর সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর বাড়ির ছাত্রাবাসে কিছুদিন আশ্রয় পেয়েছিলেন। পরে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ হয়। বিদ্যাসাগরের নিরভিমান অথচ দৃঢ় চরিত্রের মানবিকতা হরপ্রসাদকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য সামাজিক ব্যাপারে হরপ্রসাদ সর্বদা বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর চরিত্রে ও মতবাদে যেটুকু রক্ষণশীলতা ছিল, তা তিনি পেয়েছিলেন পারিবারিক ও বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রে। সাহেবিয়ানা বলতে যদি business-like ক্ষিপ্রতা ও যুক্তিনির্ভরতা বোঝায়, তা তিনি পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে। আর যে মানবিক সহানুভূতির সংগে পরিহাসপ্রিয়তার সম্মিলনে জীবন সম্পর্কে এক সুস্থ মনোভাব গড়ে ওঠে, তা তিনি পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল ও বিদ্যাসাগর এই তিন যুগন্ধর পুরুষের সাহচর্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মানসচরিত্র গঠনে সাহায্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল ও বিদ্যাসাগর এই তিন ব্যক্তিপুরুষ ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর ভূমিকা তাঁর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমকালের তিন পুরুষ ও দুই প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকলেও হরপ্রসাদ মূলত সমাজ আন্দোলন নিরপেক্ষ individualist ছিলেন। হরপ্রসাদের উপর যা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি সে হল সমসাময়িক যুগ। সেই কারণেই প্রথম যৌবনে কী হিন্দুমেলা, কী ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রৌঢ় বয়সে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন বা কংগ্রেস—কোনোটির সংগেই তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। হরপ্রসাদের নাম যে তাঁর মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে জনচিত্ত থেকে অপসৃত হয়েছে তাও সম্ভবত এই কারণেই। সামাজিক

বা রাজনৈতিক আন্দোলন নিরপেক্ষ পুরুষকে সাধারণ মানুষ বেশি দিন মনে রাখে না। পণ্ডিত সমাজেও যে তাঁর নাম যথেষ্ট স্মরণীয় হয়ে থাকেনি তার একটি কারণ বোধ করি পুরাতত্ত্ব চর্চার নানা ক্ষেত্রে তাঁর পুরোযায়ীর ভূমিকা। পুরোযায়ী গবেষককে অনেক অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয় এবং পরবর্তীকালে নতুনতর তথ্য উদ্ঘাটিত হলে পুরোযায়ীর অনেক সিদ্ধান্ত নাকজ হয়ে যায়। হরপ্রসাদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছে।

তবে একটি বিষয়ে হরপ্রসাদের কৃতি পরবর্তী যুগের মানুষের অগোচরে চলে যাওয়ায় তিনি প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসা, পুরাতত্ত্বের জ্ঞান ও সাহিত্যবোধ সম্মিলিত হয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে রচিত অসাধারণ প্রবন্ধগুলিতে। এই সব প্রবন্ধেই হরপ্রসাদের পুরাতত্ত্ব চর্চা ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটেছিল। প্রবন্ধগুলি দীর্ঘদিন সাময়িকপত্রের গর্ভে চাপা পড়ে থাকায় একালের পাঠকের কাছ থেকে যথাযোগ্য সমাদর পায় নি, সমাদর না পাবার আর কোনো কারণ ছিল না।

পবিত্র সরকার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব

এক.

ভূমিকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই ধরনের মানুষ, যাঁর ক্ষেত্রে 'শাস্ত্রী' কথাটি উপাধিগত সংকীর্ণতা অতিক্রম করে অনেক বড়ো একটি অর্থ গ্রহণ করেছে। তাঁর আজীবন সাধনা ও বিদ্যার উপার্জন এখনকার শাখা ও প্রকোষ্ঠে বিভক্ত জ্ঞানচর্চাকে প্রতি-মুহূর্তে উপহাস ও তিরস্কার করে। তার উপর, তা আমাদের এই বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ করে যে, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ঐ অতিকায়ত্বই বুঝি সংগত ও স্বাভাবিক, এবং এই রকম সর্বতোভদ্র চিত্ত ও সর্বস্বর আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি আমাদের চাকুরি-নিবন্ধ, পদোন্নতি-লোলুপ ব্যাবসায়িক বিদ্যাচর্চা নেহাতই ধিক্কারযোগ্য। ফলে একালের হয়ে হরপ্রসাদকে দেখতে গেলে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো বিপত্তি ঘটতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী? হরপ্রসাদের যোগ্য দর্পণ তিনি নিজে বা সুনীতিকুমার প্রভৃতির মতো বিরল দু-একটি মানুষ। আমাদের নিজেদের আয়তন যেহেতু অনেক ছোটো, সেহেতু আমাদের প্রয়োজনের মাপে হরপ্রসাদকে ছোটো এবং খণ্ডিত করে নিতেই হবে। এখানেই আসল বিপদ। বিপদ এই কারণে যে, হরপ্রসাদের জ্ঞানাত্মক রচনাবলি এ ধরনের বিখণ্ডীকরণের অনুকূল নয়। বহু বিষয়, বহু জিজ্ঞাসা ও বহু অনুসন্ধান ও আবিষ্কার—সমস্তই তাঁর ক্ষেত্রে কোনো একটি মূল কেন্দ্রে সংবদ্ধ ও বিন্যস্ত হয়েছে। সেখানে তাঁর প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন কীর্তি তাঁর কীর্তির অন্যান্য বিভাগ থেকে শক্তি, প্রতিষ্ঠা ও কিরণ গ্রহণ করে, ফলে তাঁর উপার্জনের সমগ্রতার যে

গৌরব ও ঐশ্বর্য, তার সমতুল গৌরব তাঁর পৃথক পৃথক কীর্তিতে নাও থাকতে পারে। বস্তুত তা প্রত্যাশা করাও অন্যায়। সুতরাং সামগ্রিক কীর্তির উপাদানগুলির একটি থেকে আর একটিকে অক্ষতভাবে বিচ্ছিন্ন করে আনা খুব সহজ নয়। এই আপাত-অসম্ভব, এবং সম্ভবত হরপ্রসাদের পক্ষে অসম্মানজনক চেষ্টাই এ প্রবন্ধে করতে হচ্ছে।

দুই.

'ভাষাতাত্ত্বিক' বলতে এখন আমরা যা বুঝি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঠিক তা ছিলেন না। ভাষার কোনো সার্বজনিক বা সার্বভৌমিক 'তত্ত্ব' তিনি পৃথিবীর বিদ্বৎ-সমাজকে উপহার দেননি। তাঁর সমকালে জার্মানিতে ভাষাচর্চার কঠোর অনুশাসন এবং ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের ঐতিহাসিক বিবর্তন অনুধাবনের সুশৃংখল উত্তেজনার মধ্য থেকে দু-একটি তত্ত্ব বা মূলসূত্র তৈরি হচ্ছিল। যেমন তার মধ্যে একটি, 'ভাষার নিয়ম অব্যতিক্রমী'[১]। এ রকম কোনো সত্য হরপ্রসাদ আবিষ্কার ও প্রচার করেন নি। তিনি কি এ সব তত্ত্ব বা মূলনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? তারও খুব স্পষ্ট হদিশ আমরা তাঁর লেখায় পাই না। বরং তাঁর অনুজ সমকালীন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মনে হয় 'য়ুংগ্রামাটিকের'[২] বা নব্যবৈয়াকরণদের এই পজিটিভিস্ট-সুলভ ধ্যানধারণার খোঁজ

---

১. য়ুংগ্রামাটিকের-রা (Junggrammatiker) গত শতাব্দীর শেষ পাদে জার্মানিতে ভাষাতত্ত্ব চর্চায়, বিশেষত ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে, এই রকম একটি কঠোর ও সুনির্দিষ্ট মতবাদে পৌঁছেছিলেন। আসলে ঐ মতটিই তাঁদের প্রধান পরিচয়। হেরমান অসটফ্ (১৮৪৭-১৯০৯) ও কার্ল ব্রুগমান (১৮৪৯-১৯১৯) তাঁদের মুখপাত্র স্থানীয় ছিলেন। দুজনের সম্পাদিত একটি গবেষণা পত্রিকায় এই ধরনের কথা বলা হয়েছিল যে, ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এমন সব নিয়মে সেগুলি ঘটে যার কোনো ব্যতিক্রম নেই (ausnahmslose Lantgesetze)।

২. এঁরা (টীকা ১ অধিকন্তু দ্রষ্টব্য) ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বকে একটি অভ্রান্ত বিজ্ঞানের স্তরে তুলে আনতে চেয়েছিলেন। এই দলের সদস্য ছিলেন বের্টহোল্‌ট ডেলব্র্যাক (১৮৪২-১৯২২), হেরমান পাউল (Paul, ১৮৪৬-১৯২১), ভিলহেল্‌ম মেইয়ার ল্যুব্‌কে (১৮৬১-১৯৩৬) প্রভৃতি। পরবর্তীকালে ফ্রানসের আঁতোয়ান মেইয়ে (Meillet, ১৮৬৬-১৯৩৬), মার্কিনী লেওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৮৮৭-১৯৪৯) প্রভৃতি অনেকেই য়ুংগ্রামাটিকের গুরুর কাছে শিক্ষাদীক্ষা নিয়েছিলেন।

অনেক বেশি রাখতেন এবং নিজেও সে সবে বিশ্বাস করতেন[৩]। তা ছাড়া, এই শতাব্দীর গোড়ায় (১৯০৬-১৯১১) জেনিভাতে সুইডিশ পণ্ডিত ফার্দিনান্দ দ সোস্যুর তাঁর ছাত্রদের কাছে সামান্য ভাষাতত্ত্ব বা General Linguistics-এর যে মূল তত্ত্বগুলি প্রকাশ ও বিস্তার করছিলেন, সেগুলিও যে হরপ্রসাদের মনস্কতার জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিল—এমন কোনো প্রমাণও আমাদের কাছে নেই। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা (প্রাগ)-তে যে ভাষাচর্চার কেন্দ্র[৪] গড়ে উঠছিল তার খবরও তাঁর কাছে পৌঁছেছিল কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ পৃথিবীর ভাষাতত্ত্বচর্চার উত্থান-পতনশীল ঢেউগুলি সম্পর্কে তাঁর অবগতির পরিমাণ খুব বিস্তৃত ছিল না বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর মত হিউম্যানিস্ট প্রজ্ঞার অধিকারীর পক্ষে এ অপরাধ কোনো অপরাধই নয়। তিনি নিজেই একটি উপলক্ষে স্বীকার করেছেন, 'আমরা পুরাণ পদ্ধতিতে মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।'[৫] তাঁর কাছে মাতৃভাযার চর্চায় 'নূতন পথ' দেখিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর প্রসিদ্ধ *ODBL* বা *Origin and Development of the Bengali Language* (১৯২৬) গ্রন্থে। সুতরাং তাঁর 'পুরাণ পদ্ধতি' এবং ভাষা-

৩. "সমস্তই নিয়মের ফল; ভাষাও নিয়মের ফল"—এমন একটি কথা রামেন্দ্রসুন্দরই বলেছিলেন। তাঁর এ বিষয়ে আরো সুনির্দিষ্ট কথা—"নিয়মহীন ভাষা চিন্তার অগোচর। নিয়ম আছে; তবে বিনা অন্বেষণে তাহা বাহির হইবে না।" দ্র. 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ", (শব্দ কথা), রামেন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ', পৃ. ১২৭।

৪, ১৯২৯-এ প্রাগে স্লাভিস্টদের প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস থেকে প্রাগের ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সমিতিবদ্ধ হন বলা চলে। কিন্তু ১৯২৬ থেকেই তাঁরা একসঙ্গে বসে মীটিং ও আলোচনা ইত্যাদি চালাচ্ছিলেন। এই দলের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ভিলেম ম্যাথেসিয়াস, বহুস্লাভ হাভ্রানেক, রোমান ইয়াকবসন, জে. মুকারোভস্কি, বহুমিল তৃকা প্রভৃতি। পরে রাশিয়া থেকে প্রিন্স ট্রুবেৎস্‌কোয় এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

প্রাগ ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রধান খ্যাতি ফোনিমতত্ত্বের উদ্ভাবন ও ব্যাখ্যায়। তবে রূপতত্ত্ব (morphology), রীতিবিজ্ঞান (stylistics), ভাষাশিক্ষণ (language teaching) প্রভৃতি বিষয়েও তাঁদের চর্চা ও উপার্জন সশ্রদ্ধভাবে গৃহীত হয়েছে। এঁদের ভাষাতত্ত্বের সাধারণ নাম Functional Linguistics। কখনো তা অন্যদিক থেকে Structural Linguistics হিসেবেও বর্ণিত হয়। ভাষার উপাদানগুলির function ও structure—এ দুই সম্বন্ধেই তাঁদের বিস্তৃত অনুসন্ধান ও অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য করা গেছে।

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা", হরপ্রসাদ রচনাবলী (এর পর থেকে 'হ-র') ১ম, ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি, কলকাতা ১৯৫৬, পৃ. 'দ'। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ১৯৩-২১৩।

তত্ত্বের তাঁর 'নূতন পথ'-এর ধারণা এ দুই থেকেই তাঁর চিন্তার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু চেষ্টা করলে, অন্তত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁর কথাগুলি থেকে, ব্যাকরণ-সংক্রান্ত কোনো একটি 'তত্ত্ব' কি খুঁজে বার করা যায় না? যায়। হরপ্রসাদ কখনোই তত্ত্বের আকারে এ সব কথা বলেননি, বাংলা ব্যাকরণের চেহারা কী হওয়া দরকার, সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু কথা বলেছেন তিনি, তারই ভিতর থেকে একটি তত্ত্ব যেন উঁকি দিচ্ছে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই 'তত্ত্ব' আমি আরোপ করছি না, আর তা ছাড়া রচনাবলীর সম্পাদকও স্বয়ং বলেছেন যে, ব্যাকরণ ব্যবসায়ী না হলেও অন্তত বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে হরপ্রসাদের একটি 'অনন্যসাধারণ ও সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল।'[৬] তা থেকে ব্যাকরণের কোন 'তত্ত্ব' বেরিয়ে আসছে? সে তত্ত্ব এই যে, যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কিছু হওয়া উচিত না, সে ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী তা হওয়া উচিত।[৭] এই সিদ্ধান্ত আর কিছুই না, descriptive বা বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ সম্বন্ধে পক্ষপাতেরই একটি দিক। যদিও ঐ প্রবন্ধেই হরপ্রসাদ ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করেছেন etymology হিসেবে, আমরা তার প্রচলিত অর্থাৎ grammar অর্থই ধরছি। হরপ্রসাদও আলোচনাকালে এই অর্থই মনে রেখেছেন।

৬. ঐ, পৃ. ২১০, (পাদটীকা)।

৭. মনে রাখতে হবে, এই তত্ত্বের উদ্ভাবক বা প্রচারক বাংলাদেশেও হরপ্রসাদ প্রথম নন। সম্পাদকের পূর্বোল্লেখিত পাদটীকাতেই রামমোহন রায় এবং "অল্প দুই একজন বাঙ্গালী ব্যাকরণকার"-কে তাঁর পূর্বসূরিত্বের সম্মান দেওয়া হয়েছে। ঐ দু-একজনের মধ্যে ব্যাকরণকার না হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) নাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আরেকজনও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তিনিও প্রসিদ্ধভাবে ব্যাকরণকার নন, কিন্তু তাঁরই কাছে হরপ্রসাদের ঋণ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। ইনি হলেন তখনকার দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি ('ক্যালকাটা রিভিউ'-তে No. CXXX, 1877, pp. 395-417—পরে এর থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময় আমরা পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ইংরেজিতেই দেব)। তাঁর প্রবন্ধ "Bengali Spoken and Written" সম্ভবত হরপ্রসাদের (এবং আরো অনেকের) সমস্ত বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্যরীতি সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তার সাক্ষাৎ ও স্থায়ী অনুপ্রেরণা। হরপ্রসাদ নিজেই মুক্তকণ্ঠে এই ঋণ স্বীকার করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা" (দ্রষ্টব্য: "বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়", হ-র ১, পৃ. ১২)। শ্যামাচরণের প্রবন্ধটির উল্লেখ আমাদের বহুবার করতে হবে।

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে ভাবা যাক। ১৯০১-এ ছাপা এই প্রবন্ধ, তখনও ইয়োরোপের ভাষাতত্ত্বে ঐতিহাসিক ব্যাকরণের জয়জয়কার। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব থেকে স্বাধীনভাবে ব্যাকরণ রচনার যে ধারা—তাতে ইয়োরোপে রেনেশাঁসের সময় থেকেই গ্রীক-ল্যাটিন মডেল থেকে মুক্তির একটি ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, বিশেষত এম্‌পিরিসিজ্‌ম-এর কেন্দ্র ইংলন্ডে, যদিও বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব জিনিশটা অনেক দূরবর্তী ঘটনা। হরপ্রসাদের কথাবার্তাতেও সমান্তরালভাবে সেই ব্যাপারটাই ফুটে উঠেছে,—বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃতের বা ইংরেজির মডেল থেকে মুক্তি দিতে হবে। এমন কি দুয়ের খিচুড়ি কোনো মডেলও চলবে না। এর পিছনে যে ভাবনা, তাকে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের দর্শনের[৮] সঙ্গে সর্বাংশে এক করে দেখা ঠিক হবে না। কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব যে-সব premise বা সূত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তার অন্তত একটি হল ভাষায় কী আছে তাই আগে দেখতে হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণ হবে ভাষা-নির্ভর; তার সিদ্ধান্তগুলি হবে পর্যবেক্ষণজাত, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। এবং সেই সঙ্গে, তা normative বা prescriptive হবে না। এই normative বা 'শুদ্ধ'-ভাষা-নির্দেশক ব্যাকরণের মুশকিল সম্বন্ধে হরপ্রসাদ খুব পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না, কিন্তু মডেল-আক্রান্ত ব্যাকরণের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুব স্পষ্ট:

> 'সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইয়াছে; একটী মুগ্ধবোধ-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটী হাইলি-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার মাস্টারগণ।...এক প্যাটেণ্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা, আর এক প্যাটেণ্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জমা। বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি মাগধী অর্দ্ধমাগধী, সংস্কৃত পার্সি ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না। অনেকে আবার দুই

৮. নির্দিষ্ট ভাষার বর্ণনার প্রকরণ-সঙ্কিংসু বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব মূলত মার্কিণদেশে উদ্ভাবিত হয়। লেওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৮৮৭-১৯৪৯)-এর *Language* (১৯৩৩) বইটি থেকে এই তত্ত্ব বিশেষ প্রবর্তনা লাভ করে। ঐ দেশে ঐ সময়কার প্রভাবশালী মনোদর্শন Behaviourism দ্বারা অনুপ্রাণিত এই ভাষাতত্ত্বের মূল কথা ব্লুমফিল্ড একটি বাক্যে বলে দিয়েছেন—"the only useful generalizations about language are inductive generalizations". *Language*, London 1938, George Allen and Unwin, p. 20)।

> প্যাটেণ্ট মিশাইয়া একপ্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। সে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই; বহুদর্শিতার নামও নাই।'[৯]

হরপ্রসাদ ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণকার ছিলেন না, সুতরাং তাঁর এই সমস্ত উচ্চারণে প্রকাশ্যভাবে কোনো তত্ত্ব যদি উপস্থিত না থাকে তা হলে খুঁত ধরার কিছুই নেই। বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলি আমরা পরে আলোচনা করছি। এ অংশে শুধু ঐ সব প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত একটি ব্যাকরণ-তত্ত্বের আভাস নির্মাণ করবার চেষ্টা করা হল! তা যে মৌলিক বা অভিনব নয়, তাও জানা কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাঠ্য ব্যাকরণ রচনায় মাছিমারা কেরানিসুলভ মডেলের অনুবর্তনের মধ্যে হরপ্রসাদের মত তখন যেমন ছিল, এখনও তেমনি মাইনরিটির মত হয়ে আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দুর্ধর্ষ প্রয়াসও স্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণকারদের মৌমাছিতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে ভাঙতে পারে নি।

তিন.

তিনি যে ভাষাবিদ্ (এখনকার ভাষায় practical linguist) ছিলেন, সে-কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু ভাষাবিদ্যারও রকমফের থাকে। উপস্থিত কাজ চালানোর জন্যে ভাষা জানা এক কথা, আর ভাষার নাড়ীনক্ষত্র জেনে তাকে ইতিহাসের নানা পর্বে স্থাপন করে তার ক্রমবাহিত রূপটি জানা আরেক কথা। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) শিষ্য প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ হরপ্রসাদ যে প্রাচীন ভারতীয়, বিশেষত আর্যভাষাগুলি জানবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সংস্কৃত কলেজে ঢোকার অনেক আগেই তাঁর সংস্কৃত চর্চার সূত্রপাত হয় বাড়িতে—তাঁর জন্মই 'সংস্কৃতজীবী অধ্যাপক পণ্ডিতের ঘরে।' পালি, প্রাকৃত, বৌদ্ধ-বা-জৈন-সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সংস্কৃত কলেজেই ঘটেছে, তবে এসব ভাষায় অধিকার নিশ্চয়ই রাজেন্দ্রলালের সাহচর্যে অনেক পরিপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু এসব ভাষার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান জন্মেছে পুরাতত্ত্বচর্চা থেকে। শিলালিপি-চর্চায় তাঁর যে আজীবন আসক্তি ছিল সে খবর সুশীলকুমার দে আমাদের দিয়েছেন।[১০] আর বাংলা তথা নব্য-ভারতীয়

৯. "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", হ-র ১, পৃ ২০৩।

১০. "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী", হ-র ২, পৃ. 'ছ'। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ২১৪-২২৩।

আর্যভাষার প্রাচীনতম পুথি চর্যাপদ আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনার অতিশয় দামী উপাদানও হরপ্রসাদ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত বা বাংলা—কোনো ভাষারই আনুপূর্বিক ইতিহাস তিনি রচনা করেন নি। 'সংস্কৃত বাঙ্ময়'[১১] -এর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই কথা বলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন এই রকম অনুমান করেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজটি পেলে তিনি এই বইটি লিখে উঠতে পারতেন, তার বদলে ঢাকার চাকরিটি পাওয়ায় তাঁর শক্তির অন্যত্র, জ্ঞানচর্চার চেয়ে বিভাগের সংগঠনে অধিকাংশ, অপচয় হল[১২]—তখন আমাদের আক্ষেপ হয়। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান কথা বলতেন। বদলে আমরা যা পাচ্ছি, তা ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো কিছু উক্তি। তাতে কোনো অভিনব তথ্য নেই। যেমন 'বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?' প্রবন্ধটিতে[১৩]। এতে পালি ভাষার উদ্ভব ও ঠিকুজী বিচার করতে গিয়ে সংস্কৃতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রসঙ্গও এসেছে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় এ কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের লেখা ভাষার ইতিহাস নয়, কেননা, তাতে সাংস্কৃতিক তথ্য যতটা, ভাষাতত্ত্বের তথ্য ততটা নেই। তাছাড়া এতে তাঁর একটি অনুমান যে, অন্ধ্রের 'অমরাবতী অর্থাৎ প্রাচীন ধান্যকটকে পালিভাষার উৎপত্তি হয়',[১৪] তা পণ্ডিতদের কাছে গৃহীত হয়নি। ইতস্তত অনেক মন্তব্য, যেমন থেরবাদী বৌদ্ধরা 'বই লিখিতে লাগিলেন চলিত ভাষায়—প্রাকৃত পাঠে। ইহা তিন চারিশত বৎসর পরে পালিতে গিয়া দাঁড়াইল'[১৫] ইত্যাদি—এক ধরনের ব্যস্ততা ও ভাষার ইতিহাসের সূক্ষ্ম পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। কিন্তু অন্তত এই প্রবন্ধটিতে ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস অনুধাবন করার একটা চেষ্টা দেখি।

১১. ইংরেজি "লিটারেচার" কথাটির একটি সম্প্রসারিত প্রতিশব্দ হিসেবে হরপ্রসাদ "বাঙ্ময়" কথাটিকে ব্যবহার করেছেন, বলেছেন, "বাঙ্ময় লেখাই হোক, না লেখাই হোক সর্ব্বত্র যাইবে। মানুষের মুখ হইতেই হোক, আর কলমের মুখ হইতেই হোক, বাক্ হইলেই বাঙ্ময়ের অধিকার আসিয়া যাইবে।" দ্র. "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ", হ-র ১, পৃ. ২৪৭।

১২. বর্তমান গ্রন্থের ২০৪ পৃ. দ্র.

১৩. দ্র. হ-র ২, পৃ. ৪৭৬-৯১।

১৪. ঐ, পৃ. ৪৭৯।

১৫. ঐ, পৃ. ৪৯১।

আক্ষেপ শুধু এই যে, সে ইতিহাস তাঁর আলোচনার কেন্দ্রে জায়গা নিল না কখনো।

বাংলা ভাষার একটি অতি-সংক্ষিপ্ত কুলজী নির্মাণ করতে গিয়েও ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসের একটি নিষ্কর্ষ তিনি দিয়েছেন 'অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন'-এ[১৬]। কিন্তু এখানেও তাঁর সিদ্ধান্ত অভিনব বা মৌলিক নয়, এবং তার মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা নয়, বরং সংস্কৃত বাংলার 'অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী' অর্থাৎ 'সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অনেক দূর'—এই মোটা সিদ্ধান্তটি যতটা সত্য, ভাষাগত ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে তাঁর দেওয়া অনুপুঙ্খগুলি, অর্থাৎ সংস্কৃত→বুদ্ধ ভস্মপাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ ভাষা→অশোকের শিলালেখের ভাষা→মিশ্র সংস্কৃত→সুঙ্গ ও খারবেলদের শিলালেখের ভাষা→সাতকর্ণিদের শিলালেখের ভাষা→পালি→নাটকের প্রাকৃত/মাগধী ও অর্ধমাগধী→....অষ্টম শতকের বাংলা—এই ক্রম, কালনির্ণয়ে বিভিন্ন শিলালেখের ভূমিকা এবং সর্বোপরি 'অষ্টম শতকের বাংলা' এই বস্তুটিকে নিয়ে ঘোরতর সংশয় আছে।

কিন্তু যে সময়ে তিনি লিখছেন সে সময় এই ধরনের ভুলভ্রান্তি অস্বাভাবিক বা অনপেক্ষিত নয়। এবং তাঁর সমসাময়িক দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের তুলনায় তার পদস্খলন যে সংখ্যায় খুব বেশি, একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। বরং ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে, বিশেষত ভারতীয় ভাষাগুলির ক্রমবিকাশের ধারার বিষয়ে সমসাময়িক সমস্ত মতামতই তাঁর নখদর্পণে ছিল। এবং প্রাকৃত অপভ্রংশ পালি ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র যে-কথা বলেছেন[১৭] তাতে বোঝা যায় চিন্তার এক জাতের স্বচ্ছতা তাঁর কাম্য ছিল, এবং মনোভাবের দিক থেকেও তিনি ছিলেন বিচারপ্রবণ ও আধুনিক।

চার.

আর একথা তো সকলেরই জানা যে, ভাষার লক্ষণ বিচারে তাঁর সার্থকতাও অবিমিশ্র নয়। ১৯০৭-এ নেপাল দরবারের লাইব্রেরি থেকে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', দুটি 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব' এই চারটি পুথি যে নিয়ে এসেছিলেন, তার চারটির ভাষাই 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা' বলে তিনি সাব্যস্ত

১৬. দ্র. হ-র ১, পৃ. ২৭৯-৮০।
১৭. ১১ পাদটীকার উৎস দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৩৮।

করেছিলেন।[১৮] সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, হরপ্রসাদ 'সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া·· চর্যাগীতির ভাষাকে বাঙ্গালা বলিয়াছিলেন।'[১৯] তাঁর সহজ বুদ্ধির লজিকটা এই রকম ছিল: ক. তেঙ্গুর বা 'তাঞ্জুর'-এ যে সব পদ-কর্তাদের পরিচয় বাঙালি হিসেবে উল্লেখ করা আছে, তাদের রচিত পদ নিশ্চয়ই বাংলা হবে; দ্বিতীয়ত, খ. এই সব পদগুলিতে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি সুনিশ্চিতরূপে বাংলা—অন্য কোনো ভাষায় সেগুলি পাওয়া যায় না। চর্যাগুলির vocabulary ছেঁকে ব্যবহৃত বাংলা শব্দের লিস্টও তিনি করেছেন এই 'সম্বোধন'-এ। অর্থাৎ জীবনীগত তথ্য এবং শব্দভাণ্ডারের (lexical) প্রমাণ তিনি গ্রহণ করেছেন, ভাষার অন্বয় (syntax), রূপতত্ত্ব (morphology), প্রবচন (Idioms) ইত্যাদির হিসেব তিনি করেন নি। যাই হোক, পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিচার করে দেখিয়েছেন যে,[২০] ঐ চারটি বইয়ের মধ্যে কেবল চর্যাপদগুলির ভাষাকেই বাংলা বলা যেতে পারে, যদিও খানিকটা পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রভাব পড়েছে তাতে—'The dialect of the Caryas alone is Old Bengali....' সুনীতিকুমার মূলত রূপতত্ত্বের হিসেব করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সরহের এবং কাহ্নের 'দোহাকোষ' দুটির ভাষা এক ধরনের পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ। 'ডাকার্ণব'-এর ভাষাও মূলত ঐ অপভ্রংশের আর একটি উপভাষা, তবে তাতে নানা ভেজাল মিশেছে। বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো দূরের। কাজেই 'ডাকার্ণব'-এর 'শেষ দোহাগুলি আমার বাঙ্গালা বলিয়া মনে হয়'—হরপ্রসাদের এই বিশ্বাস[২১] শেষ পর্যন্ত টেকে নি।

কিন্তু এখানেও হরপ্রসাদের মুক্তবুদ্ধি ও মহত্ত্বের পরিচয় যে নেই তা নয়। যদি নিজের মতামত সম্বন্ধে অনড় গোঁড়ামিই তাঁর চরিত্রের একমাত্র লক্ষণ হত তাহলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে তিনি ঐ মনোজ্ঞ সংবর্ধনাটি দেবার কথা ভাবতেন কিনা সন্দেহ।

আর চর্যাপদের পুথি আবিষ্কার করে পূর্বভারতের সমস্ত আধুনিক আর্যভাষার বয়স যে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন, এ কথা কে অস্বীকার করবে? শুধু এরই জন্যে ইতিহাসে তাঁর স্মরণ অক্ষয় হয়ে থাকা উচিত।

১৮. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা-র ভূমিকা ছাড়াও দ্রষ্টব্য "সম্বোধন" হ-র ২, পৃ. ১৪১-১৮৯।

১৯. চর্যাগীতি-পদাবলী, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স ১৯৬৬, পৃ. ৪৬।

২০. *ODBL*, vol. I, Calcutta University 1926, pp 110-118.

২১. হ-র ২, পৃ. ১৬২।

পাঁচ.

বাংলা ব্যাকরণের চরিত্র কী হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুবই চিত্তাকর্ষক এবং ভাষার ধর্ম সম্বন্ধে তা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। তিনি জানেন, 'এ ভাষা অমুক ভাষার মেয়ে বা নাতনী'—এই নিছক বংশ পরিচয়ের দ্বারা কোনো ভাষার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। প্রত্যেক ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ধ্বনিগত, রূপগত, অন্বয়গত লক্ষণগুলি যেমন ভিন্ন, তেমনি তার সাংস্কৃতিক পটভূমির ধারাবাহিকতাও আলাদা। ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসই একটি ভাষার শরীর ও অন্তরকে বদলায়, সুতরাং সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা এসেছে—এ কথায় বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের এক শতাংশও ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ। আবার ইংরেজি জানা লোকেরা যে ইংরেজির ছাঁচে ফেলে বাংলা ভাষার বিচার করতে বসেন, তারও বৈধতা সন্দেহজনক।

বলা বাহুল্য, হরপ্রসাদ চান খাঁটি বাংলা, অর্থাৎ তদ্ভব বাংলার ব্যাকরণ রচিত হোক। এখন ব্যাকরণ রচনার নানা দিক আছে। প্রথম প্রশ্ন হল, কাদের জন্য ব্যাকরণ? বাংলা যারা মাতৃভাষা হিসেবে বলে, তারা মাথার মধ্যে এ ভাষার নিয়মশাসন সব ভরে রেখেছে, অর্থাৎ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তারা জানে—নইলে বাংলায় কথা বলবে কী করে? তারা অনেকে কোন্ শব্দটা 'বিশেষ্য', কোন্‌টা 'অব্যয়' একথা জিজ্ঞেস করলে হয়ত হকচকিয়ে যাবে, কিন্তু এসব নাম না জেনেও তারা 'বিশেষ্য' এবং 'অব্যয়' এবং এজাতীয় নানা শব্দগুলিকে সে-সবের ঠিকঠিক জায়গায় বসায়—কখনো অব্যয়ের জায়গায় বিশেষ্য অথবা বিশেষ্যের জায়গায় অব্যয় বসায় না। 'শিষ্ট' সাধুভাষা শেখার জন্যে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে ব্যাকরণ রচনার সময় যে-সব কথা ভাবতে হবে, 'শিষ্ট' চলিত ভাষা শেখানোর জন্যে ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে সে-সব কথা পুরোপুরি না ভাবলেও চলবে। বিদেশীদের জন্যে লেখা ব্যাকরণের ধাঁচ হবে একরকম, আবার ডায়ালেক্ট বা উপভাষার ব্যাকরণের ধাঁচ হবে আর-এক রকম। তুলনামূলক ব্যাকরণের আদল আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা ভাষার 'তত্ত্ব' বা চেহারা বোঝানোর জন্য যে ব্যাকরণ রচনার কথা বলবেন সেটার মুখ্য লক্ষ্য হবে না ছাত্রপাঠ্যত্ব, কিংবা বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীর সুবিধে কিংবা 'শিষ্ট' 'অশিষ্ট'-এর প্রভেদ নির্ধারণ।[২২] সেটি ভাষার 'নিজস্বতা' ফুটিয়ে তুলবে

২২. ৩ অক্টোবর ১৯৭৬ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বাংলা ব্যাকরণ সংক্রান্ত যে সংক্ষিপ্ত সেমিনারের আয়োজন করেছিল, তাতে ড. সুকুমার সেন এই প্রশ্নগুলিকে বিশদ করে বলেছিলেন। গত ১৯ এপ্রিল ১৯৭৭ এই লেখকের সঙ্গে

—তার ধ্বনিগত (phonological) নিজস্বতা, তার রূপ (morph) ও সেগুলির সন্নিবেশের নিজস্বতা, তার বাক্যগঠন বা অন্বয়ের নানা নিয়ম-কানুনের নিজস্বতা। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তিটি আর একবার স্মরণ করতে পারি আমরা—'নিয়মহীন ভাষা চিন্তার অগোচর। নিয়ম আছে; তবে বিনা অন্বেষণে তাহা বাহির হইবে না।' স্কুলপাঠ্য এবং প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ গুলিতে চলতি বাংলা ভাষার তদ্ভব স্তরের নিয়মকানুন প্রায় কিছুই দেওয়া হয়নি বলেই যে তা নেই তা মোটেই নয়।[২৩] হরপ্রসাদের বাংলা ব্যাকরণ রচনা সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলিকে আমরা এভাবে সাজাতে পারি:

১. উচ্চারণ স্তরগত (Phonetic)

এই এলাকায় হরপ্রসাদ কিছু বাংলা ধ্বনির (তখনকার ভাষায় 'বর্ণ'-এর) উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাধারণভাবে পাঠ্য ব্যাকরণে প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বলে একটি অধ্যায় থাকে। তাঁর দ্বিধাহীন নির্দেশ—এ অধ্যায়টি অপ্রয়োজনীয়। এ অধ্যায়ের উপর সংস্কৃতের প্রেতাত্মা ভর করে আছে—এই তাঁর প্রধান আপত্তি। তাছাড়া যেখানেই বাঙালি ব্যাকরণ রচয়িতারা নিজস্ব গবেষণার চেষ্টা করেছেন সেখানেই কীরকম অনভিপ্রেত হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তারও উদাহরণ আছে এই সংজ্ঞায়—'শ ষ স এবং হ উষ্মবর্ণ, কারণ এই সকল বর্ণের উচ্চারণকালে মুখ দিয়া গরম বাতাস নির্গত হয়।' অনুস্বার ও বিসর্গকে এঁরা যে কারণে 'অযোগবাহ' বর্ণ বলেন পাণিনি তা শুনলে মূর্ছিত হতেন।

'চলন্তিকা' অভিধানটির আলোচনায় দেখছি,[২৪] হরপ্রসাদ বাংলা উচ্চারণের অন্তঃস্থ 'ব' আছে বলে মত প্রকাশ করছেন। তাঁর এই মত পর্যবেক্ষণের

কলকাতা টেলিভিশনে একটি সাক্ষাৎকারেও এই প্রশ্নগুলি তিনি তোলেন। বাংলায় যে কোনো ভাবী বৈয়াকরণকে এগুলির পরিষ্কার উত্তর দিয়ে তবে কাজে নামতে হবে।

২৩. এখানে ড সেনের একটি মন্তব্য আমার মনে পড়ছে। তিনি নিজে 'তদ্ভব' বাংলার ব্যাকরণের একটি খসড়া তৈরি করেছেন, তার আয়তন নাকি দাঁড়িয়েছে সাধারণ এক্সারসাইজ খাতার দশ পৃষ্ঠা! অর্থাৎ তদ্ভব বাংলার ব্যাকরণের নিয়মকানুন আঙুলে গোনা যায়! এই উক্তি আমার নিজের কাছে একটু বিভ্রান্তিকর। সম্ভবত বিষয়টি তাঁর আরো একটু মনোযোগের অপেক্ষা করছে।

২৪. হ-র ২, পৃ. ১৯৮।

দিক থেকে মিথ্যা নয়, কেননা পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকেরাও[২৫] বলেছেন যে, সাধারণ কথায় দ্রুত উচ্চারণে 'ব' [b] কখনো কখনো 'র' [β] হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্তগুলি, যথা 'বেদ, বৈদ্য, বিবিধ'—যথার্থ নয়। সাধারণত বাঙালি এগুলিকে [ব] ধ্বনি দিয়েই উচ্চারণ করে। হয়ত সংস্কৃত-মনস্ক হরপ্রসাদের নিজের ভাষায় (idiolect-এ) ঐ রকম উচ্চারণ তিনি করতেন। বাংলায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব-এর কোনো নিয়মিত (systematic) উচ্চারণ পার্থক্য নেই। আর দ্রুত বা অসতর্ক (casual) উচ্চারণে 'র' [β] বা [w] হয়ে গেলেও সতর্ক ও শিষ্ট উচ্চারণে তা ব [b]-ই থাকে। অর্থাৎ বক্তা জানে যে ওটা ব-ই, w বা β নয়। সুতরাং ঐ শিথিল অন্তঃস্থ ব-এর কোনো ভাষাগত phonemic মর্যাদা বাংলায় নেই। আজকালকার ভাষাবিজ্ঞানীরা বলবেন ব-এর ঐ শিথিল উচ্চারণ ভাষার উপরিতল বা surface-এর ব্যাপার, ভাষার স্থায়ী নিয়মগুলির সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

২. ধ্বনিমস্তরগত (Phonological)

> [ক] বাংলা উচ্চারিত ধ্বনির প্রতিরূপ হিসেবে বর্ণমালার দীর্ঘ 'ৠ', ঌ, দীর্ঘ ঌ ইত্যাদি অক্ষরগুলিকে তুলে দেওয়া সংগত

ঐ চলন্তিকার আলোচনাতেই তিনি একথা বলেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িকদের মতো লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষার পার্থক্যটি সম্বন্ধে তাঁর বোধ ছিল প্রখর, যদিও তাঁদেরই মতো ধ্বনি বোঝাতে তিনি বর্ণ কথাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রত্যয়ও চমৎকার আভাসিত হচ্ছে যে, মুখের ভাষাই আসলে ভাষা, এবং ভাষার বর্ণমালা বা লিপিকে যতদূর সম্ভব মুখের ভাষায় ধ্বনিগুলিকে

২৫. দ্র. Chatterji, Suniti Kumar, "Bengali Phonetics" in *Bulletin of the School of Oriental Studies*, vol. II, Pt. I, 1921, p. 10 এবং Ferguson, Charles A. and Chowdhury Munier, "The Phonemes of Bengali", in *Language*, vol. 36, No. 1, 1960। এতেও গ্রন্থকারদ্বয় লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের একটি "tendency to Spirantization" আছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায়ও (Kostić, Djordje, and Das, Rhea S., *A Short Outline of Bengali Phonetics*, Statistical Publishing Society, Calcutta, 1971) বলা হয়েছে যে, "In casual pronunciation, incomplete stoppage due to loose bilabial contact is even more frequent for *b* than for *p*." (p. 49)

প্রতিফলিত করতে হবে। বলাবাহুল্য, তাঁর এই মতও বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে নতুন নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগের 'বিজ্ঞাপন'-এ বলেছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষায়, দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ৯ কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত, ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।' বিদ্যাসাগরের এই যুক্তি সম্ভবত লিখিত ভাষার সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ এমন কোনো বাংলা শব্দ লেখা হয় না যাতে ঐসব বর্ণের ব্যবহার আছে। হরপ্রসাদের যুক্তি উচ্চারণের, অন্তঃস্থ-ব রাখার জন্যে তাঁর আলোচনা থেকে সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না।

[খ] 'ড়' 'ঢ়'-কে স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দেওয়ার দরকার নেই, কারণ পদের আদিতে যেখানে 'ড' 'ঢ' থাকা সম্ভব, সেখানে ঐ জায়গায় 'ড়' 'ঢ়'-এর অবস্থান অসম্ভব। কাজেই এ দুটি স্বতন্ত্র অক্ষর নয়, 'শব্দের মধ্যস্থিত ড ও ঢ-কারের উচ্চারণ'।

১৯১২ সংবতে বিদ্যাসাগরও ঠিক একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু আকার ও উচ্চারণের ধ্বনিগত detail-এর পার্থক্য আছে বলে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে দুটির উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর লিখছেন 'বর্ণপরিচয়', এবং হরপ্রসাদ করছেন অভিধানের সমালোচনা, সুতরাং উপস্থিত উপলক্ষ্য থেকেই দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণও বুঝতে পারা যায়। তবে হরপ্রসাদের মতামত আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের বেশি পছন্দ হবে। কারণ হরপ্রসাদ যে 'ড়' 'ঢ়'-র আলাদা স্বাতন্ত্র্য মানতে রাজি নন, এতে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের phoneme তত্ত্ব খানিকটা আভাসিত হয়েছে—জানিনা হরপ্রসাদ তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কি না। সম্ভবত ছিলেন না। 'ড' 'ঢ' স্বনিম বা phoneme এবং 'ড়' 'ঢ়' তার contextual variant অর্থাৎ প্রাতিবেশিক রূপান্তর, অর্থাৎ একধরনের বিস্বন বা allophone। কাজেই 'ড়' 'ঢ়'-এর ভাষায় কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত বেশ পুরোনো, বিদ্যাসাগরই সে কথা বলছেন, শুধু পরিভাষাগুলি নতুন। হরপ্রসাদ এ পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না।

৩. ধ্বনিরূপান্তরগত (Morphonological)[২৬]

তৎসম শব্দের সন্ধির নিয়ম খাঁটি বাংলা ব্যাকরণে বর্জন করতে হবে। এই একই কথা তিনি অন্তত দুজায়গায় বলেছেন, যথা 'চলন্তিকা'-র ঐ

২৬. আমি একটু প্রাচীন, অর্থাৎ ১৯৫৭-র আগেকার ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ব্যবহার করে ভাষার স্তর ভাগ করছি। এখন এই সব স্তর একসঙ্গে জুড়ে একটা মজার ব্যাপার করা হচ্ছে।

আলোচনায় এবং 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে। তাঁর কথা এত বেশি সংগত যে, এ নিয়ে বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক বলে মনে হয়। তবু সংশয়ীদের কাছে জিনিসটি স্পষ্ট করে তুলে ধরা দরকার। হরপ্রসাদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এই: প্রথমত, চালু ব্যাকরণগুলিতে সন্ধির নিয়ম দেওয়া আছে, কিন্তু কখন কোথায় এবং কেন সন্ধি হবে তা বলা হয় না কখনোই। ফলে 'তখন অবিনাশ বলিল' কেন 'তখনাবিনাশ বলিল' হবে না, এ ব্যাপারে পণ্ডিত মশায়ের কোনো জবাব নেই। দ্বিতীয়ত, ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধিপ্রকরণ দিয়ে দেওয়ায় ঐ সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার অবকাশই তৈরি হয় না। তৃতীয়ত, অনেক সন্ধির নিয়ম আছে যা তৎসম বাংলার জন্যেও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, যেমন এ নিয়মটি —'পদের অন্তে স্থিত ন কারের পর ল থাকিলে ন কারের স্থলে ল হয় এবং আনুনাসিকত্বসূচক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়।' এরই ফলে 'বিদ্বান্+লিখিত দাঁড়ায় 'বিদ্যাল্লিঁখিত'। তা ছাড়াও আছে লুপ্ত অ-কারের বিধান।

কিন্তু চতুর্থ যুক্তিটিই সবচেয়ে মূল্যবান, কারণ এতেই আছে বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম রক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ও সব সন্ধির নিয়ম আমাদের দরকার নেই, কারণ তৎসম শব্দগুলি বাংলায় loanwords বা ধার করা শব্দ এবং 'সেগুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে পাইয়াছি এবং আমরা তাহাকে একপদরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি।' এটাই সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি। বাঙালি ছেলে-মেয়েদের 'ভবন' 'পবন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে হলে সে সবের সন্ধিগত ব্যুৎপত্তি জানার কিছু দরকার নেই, অর্থাৎ 'ভো+অন' 'পো+অন' ইত্যাদি মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই। সংস্কৃত থেকে আমরা আস্ত-আস্ত শব্দ ধার করেছি, কাজেই বাংলা ব্যাকরণে সেগুলিকে আবার ভেঙে টুকরো করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। ইংরেজির সঙ্গে তুলনা দিলে বিষয়টা আর-একটু বোঝা যাবে। ইংরেজিতে গ্রীক ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা থেকে অনেক শব্দ ধার করা হয়েছে, সে সবের মূলে সন্ধি ও সমাসের ব্যাপার ছিল। খুব পরিচিত দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। ইংরেজি accelerate কথাটা ল্যাটিন থেকে ফরাসি হয়ে এসেছে। ল্যাটিনে ac- উপসর্গটি মূলত ছিল ad-, পরে সমীভবন নামক ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মে, অর্থাৎ যে-কারণে বাংলা 'রাঁধ্+না' হয় রান্না অনেকটা সেই কারণে, 'c'-র আগে ad- হয়ে যায় ac-। যে ইংরেজ accelerate কথাটা ব্যবহার করবে তার ঐ মৌলিক সন্ধির নিয়ম অর্থাৎ উপসর্গান্তের 'd' 'c'-র আগে 'c' হয়ে যায়—এবং তারই ফলে ad+celer-=acceler-ইত্যাদি শিখে কী লাভ হবে? না শিখলে accelerate কথাটিকে কি সে নির্ভুলভাবে ব্যবহার

করতে পারবে না? প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ইংরেজিভাষী কি তা করছে না? এই রকম আরো তিনটি উদাহরণ succeed, suffer এবং suggest। মূলে সবগুলিই sub- উপসর্গের সঙ্গে নানা ধাতু জুড়ে তৈরি হত এবং সমীভবনের ফলে ঐ sub- কখনো হয়েছে suc-, কখনো suf- এবং কখনো sug- (বৃটিশ উচ্চারণে saj-)। যারা প্রতিদিন অজস্রবার এই শব্দগুলি নির্ভুলভাবে বলছে লিখছে তাদের একথা জানার কী দরকার যে, শব্দ তিনটি যথাক্রমে sub+cedere, sub+fer- এবং sub+ger- ইত্যাদি থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে? ভাষায় কৃতঋণ শব্দগুলির জন্য উৎস-ভাষার (source language) ব্যাকরণের টুকরো ধার করার দরকার নেই। যে সমস্ত ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ বাঙালি অহরহ ধার-করা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে তাদেরও কি ইংরেজি পদ গঠনের নিয়ম কানুন জানতে হবে? যারা স্টেশন, প্রমোশন, মোশন, ফাংশন হরদম বলছে, তাদেরও কি জানা দরকার কথাগুলির মূলে stat+ion, promot+ion, mot+ion, funct+ion এই সব সন্ধিগত ব্যুৎপত্তি কাজ করছে? কোনো দরকার নেই। কাজেই বাংলা ব্যাকরণে তৎসম শব্দের সন্ধি-প্রকরণ রাখার বিন্দুমাত্র ব্যাবহারিক ঔচিত্য নেই।[২৭] হরপ্রসাদ নিজে ইংরেজি শব্দের তুলনা টেনেছেন। তাঁর দৃষ্টান্ত 'মানোয়ারি গোরা'। এর প্রথম শব্দটি 'man of war' থেকে যে এসেছে, তা কটা লোক জানে? তিনি ফার্সি দৃষ্টান্তও দিয়েছেন এবং হিন্দী, ফরাসি ইত্যাদি শব্দের প্রসঙ্গও তুলেছেন। তাঁর চমৎকার স্পষ্ট কথা —'সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যাঁহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা সংস্কৃতে ব্যাকরণ পড়ুন।'

৪. রূপান্তরগত (Morphological)

এই এলাকায় হরপ্রসাদের কথাবার্তা বেশির ভাগই পরিভাষার যাথার্থ্য ও গ্রহণীয়তা নিয়ে। Parts of speech কী? ইংরেজিতে আটটা parts of speech, প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও নিরুক্তে চারটে—নাম, খ্যাত,-উপসর্গ

২৭. এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'তৎসম', 'অর্ধতৎসম' ইত্যাদি কথাগুলিকে কেবল সংস্কৃত থেকে ধার-করা শব্দের বেলায় ব্যবহার করার কোনো যুক্তি নেই। বাংলায় ইংরেজি বা ফার্সি 'তৎসম', 'অর্ধ তৎসম' শব্দও যে নেই তা নয়। একটি প্রস্তুয়মান প্রবন্ধে আমি এসব কথা বিস্তারিত করে বলার চেষ্টা করেছি।

আর নিপাত, আবার পাণিনীয় মতে মাত্র দুটি parts of speech—সুবন্ত ও তিঙন্ত—এর মধ্যে কোনটা ঠিক ? হরপ্রসাদ ঠিকই ধরেছেন যে, ইয়োরোপীয় ব্যাকরণের parts of speech-এর বিভাগ বেশ অবৈজ্ঞানিক, কারণ শব্দের আভিধানিক অর্থ থেকে parts of speech বোঝার উপায় নেই—'ব্যবহার দেখিয়া অথবা বিভক্তি দেখিয়া বুঝিতে হয়।' হরপ্রসাদ শব্দ বিন্যাসের ক্ষেত্রে পাণিনির সুবন্ত তিঙন্ত বিভাগকেই মেনেছেন। সুবন্ত শব্দ দু শ্রেণীর—এক শ্রেণীর সুবন্ত শব্দে বিভক্তির উপস্থিতি চোখে পড়ে, আরেক শ্রেণীর সুবন্ত শব্দ বিভক্তিহীন। পাণিনি বলেন, সেগুলিতে বিভক্তি ছিল, কালক্রমে তার লোপ হয়েছে। ম্যাক্সমুলার তাতে ঠাট্টা করেছিলেন, বলেছিলেন বিভক্তির লোপের কল্পনাটা একটা fiction মাত্র। হরপ্রসাদ ম্যাক্সমুলারের মতে সায় দেননি, এবং তার ফলে খুব আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের সমকালীন হয়ে পড়েছেন। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, গণিতের ক্ষেত্রে o 'শূন্য' যেমন ভারতবর্ষের একটা মস্ত বড়ো দান মানবসভ্যতায়, তেমনি ব্যাকরণে শূন্য বিভক্তির অর্থাৎ লোপের ধারণাও একটা মূল্যবান উপহার।

যে সুবন্ত শব্দগুলির বিভক্তিলোপ ঘটেছে, সেগুলিই অব্যয়। অব্যয় আবার তিনরকমের। কতকগুলি ধাতু বা root এর সঙ্গে জুড়ে যায়, সেগুলি উপসর্গ ; যেগুলি জুড়ে যায় না, কিন্তু শব্দরূপে বিভক্তির বদলে বা সহায়ক হিসেবে বসে—সেগুলি কর্মপ্রবচনীয়—এখনকার নাম অনুসর্গ (post position)। বাকি অব্যয়ের নাম নিপাত।

বলা বাহুল্য, আধুনিক ভাষাতত্ত্বে parts of speech-কে কোনো স্থায়ী শ্রেণীবিভাগ বলে স্বীকার করা হয় না, বাক্যে শব্দের অবস্থান ও ভূমিকা (function) দেখে তার জাত-গোত্র ঠিক করা হয়। পাণিনির সুবন্ত-তিঙন্ত ভাগ কিন্তু তার ফলে খুব অচল হয়নি, অন্তত parts of speech-এর মতো অকেজো হয়ে পড়েনি। তবে আজকাল শব্দের শ্রেণীবিন্যাসে রূপ, অন্বয় ও অর্থের এত জটিল বিবেচনা করা হয় যে, পাণিনির ঐ সহজবুদ্ধি-সম্মত শ্রেণীবিভাগকেও এখন খানিকটা সাদামাঠা ও আদিম ধরনের মনে হয়।

রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে কারক ও বিভক্তিকে আলাদা করে রাখার ব্যাকুল চেষ্টায়। 'বাঙালা ব্যাকরণ'-এ তিনি ১৩০৮-এই বলেছেন, 'কারক অর্থসাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দ সাপেক্ষ। সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে ; কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে

নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয়… ।'[২৮] অর্থাৎ কারক ক্রিয়াশব্দী —ক্রিয়ার সঙ্গে যার সম্বন্ধ তাই কারক—পুরো ধারণাটাই শব্দার্থের এলাকায় পড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে পাণিনিও অবহিত ছিলেন। বিভক্তি থাক, কর্মপ্রবচনীয় থাক, এক বিভক্তির জায়গায় আর-এক বিভক্তি থাক, কিংবা এর কিছুই না থাক—ক্রিয়ার সঙ্গে শব্দবিশেষের সম্পর্ক মানের দিক থেকে বুঝতে পারা গেলেই বলতে হবে যে, কারক তৈরি হচ্ছে। বিভক্তি ও কারকের মধ্যে এক-এক সম্পর্ক বা one-one correspondence নেই। বিভক্তি থাকলেই যে কারক হবে তার কোনো দরকার নেই—যেমন 'সম্বন্ধ' কারক নয়, পদ, কিন্তু তাতে বিভক্তি রয়েছে। আবার অন্যদিক থেকে বলা যায়, কারক হল constant, কিন্তু বিভক্তি হল variable, কাজেই দুয়ের অন্যোন্য সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের রচয়িতারা তাই করে যাচ্ছেন।

বিলিতি case-এর সঙ্গে দেশী কারকের তফাত বুঝিয়ে দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ এই জিনিশটা আরো বাজিয়ে দেখেছেন। ইংরেজিতে 'নাউনের কণ্ডিশন' যাতে দেখানো হয় এবং বাক্যস্থিত এক পদের সঙ্গে আর-এক পদের সম্পর্ক যাতে ফুটে ওঠে—তাই case। ফলে দেশী মতে সম্বন্ধ 'পদ', কিন্তু বিলিতি মতে তা possessive case। আর বিলিতি suffix আর দিশি বিভক্তি এক জিনিশ নয়।· বিভক্তি সংস্কৃত ব্যাকরণের কেবল inflexion বা শব্দরূপ-ধাতুরূপের অংশ, আর suffix, অতিশয় ব্যাপক একটি ধারণা, যা ধাতু বা শব্দমূল বা radical নয় তা-ই suffix, root বা radical-এর সঙ্গে জুড়ে যায় তাই suffix। তা শব্দরূপ ধাতুরূপের হতে পারে, লিঙ্গের হতে পারে, বচনের হতে পারে, আবার derivation বা নতুন পদগঠনের (দেশী ভাষায় 'কৃৎ' ও 'তদ্ধিত' প্রকরণের) হতে পারে। হালের পরিভাষায় suffix গুলিকে সাধারণভাবে bound morpheme-ও বলা হয়ে থাকে, কেননা সেগুলি বাক্যে স্বাধীনভাবে বসতে পারে না, অন্য শব্দের সঙ্গে তাদের জুড়ে যেতেই হবে।

তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, বিভক্তি থেকে কারক বোঝা যায় না। হরপ্রসাদ এ জন্য খুব খোলাখুলি বলেছেন যে, 'যদি বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য্য লক্ষণ প্রয়োগ প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ শব্দের যোগে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ অর্থে কোন্ বিভক্তি হয়, এইগুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলে প্রণালীশুদ্ধরূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।' ১৩০৭-

---

২৮. হ-র ১, পৃ. ২০৪।

এ 'অভিধান'-এও বলেছেন, 'কারক ও বিভক্তি দুই শাস্ত্রের দুই জিনিস একত্র করিলেই গোলযোগ হইবে'।[২৯]

অনেক ব্যাকরণ প্রণেতা বিভক্তি ও কর্মপ্রবচনীয়ের মধ্যেও গুলিয়ে ফেলেন, —'দ্বারা' 'দিয়া'-কেও বিভক্তির ঝুড়িতে ছুঁড়ে দেন। মামুলি ব্যাকরণ-কারদের এই সব নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে হরপ্রসাদ স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, 'সম্প্রদান কারক' নামক কিম্ভূত বস্তুটিকে বাংলা ব্যাকরণে রাখার কোনো যুক্তি নেই। আর সংস্কৃতের নকলে প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তির 'লম্বা গাছ আঁকিবার প্রয়োজন'-ও নেই। বাংলায় বিভক্তি অনেক কম, তার উপর একই বিভক্তি অনেক কারকের হয়ে মুজরো খাটে, অর্থাৎ বিভক্তির বেলায় প্রাগের ভাষাতাত্ত্বিকেরা যাকে বলবেন neutralization বাংলায় তাই বেশ ঘটেছে। সুতরাং সংস্কৃতের ছক বর্জন করে চললেই ভালো।

হরপ্রসাদ চমৎকার লক্ষ্য করেছেন যে, 'মিশ্র ক্রিয়া' ব্যাপারটা নিয়ে বাংলা ব্যাকরণকাররা খুব গোলে পড়েছেন। বাংলায় বিশেষ্য + ক্রিয়া এই সংগঠনের একাধিক ক্রিয়ারূপ চলে, বিশেষত সাধু ভাষায়। কিন্তু কথ্য ভাষাতেও তা প্রচুর আছে। 'আহার করা', 'প্রচার করা' ইত্যাদি যেমন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ODBL*-এ এই ধরনের ক্রিয়াকে যৌগিক ক্রিয়া বা compound verb-এর মধ্যে ফেলেছিলেন,[৩০] সম্ভবত Kellogg-এর হিন্দী ব্যাকরণের অনুসরণে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১৯৬৭-তে 'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ-এ' তিনি এগুলিকে বলছেন 'সংযোগমূলক ধাতু'। ইতিমধ্যে conjunct verb কথাটা বিদেশী পণ্ডিতদের এ বিষয়ের আলোচনাতে চালু হয়েছে।[৩১] কিন্তু বাংলা ব্যাকরণকারদের মুশকিল মিশ্র ক্রিয়ার স্বরূপ[৩২] নিয়ে নয়। মুশকিল হচ্ছে

২৯. হ র ২, পৃ. ২০১-২০২।

৩০. *ODBL*, vol. II, 1926. p. 1051.

৩১. দ্র. Van Olphen, Herman, "Functional and Non-Functional Conjunct Verbs in Hindi", in *Indian Linguistics*, vol. 34, No. 4, Dec. 1973, pp. 237-50.

৩২. "মিশ্র ক্রিয়া" যৌগিক ক্রিয়া নয়। সাধারণভাবে সরল ক্রিয়া কম পড়লে কোনো রীতিতে (style-এ) বা কোনো উপভাষায় মিশ্র ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তার প্রথম পদটি বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং দ্বিতীয় ও শেষ পদটি কর্-, দে-, হ- ইত্যাদি সহায়ক ধাতু। অর্থের বিবেচনায় মিশ্র ক্রিয়া সরল ক্রিয়ারই মতো, যৌগিক ক্রিয়ার মতো তার মধ্যে কোনো অর্থগত জটিলতা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই সরল ও মিশ্র ক্রিয়ার মধ্যে বিকল্পন সম্বন্ধ আছে—একটির বদলে আরেকটি বসালে অর্থের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

তার সঙ্গে কর্তা-কর্মের ধারণা ফিট করানোর। 'আহার-করা' টাকে ক্রিয়া বললে 'অন্ন আহার করছেন' এই বাক্যে 'অন্ন'-কে কর্ম বলার সুবিধে হয়। হরপ্রসাদ বলছেন, তার দরকার কী? 'অন্ন' হল 'আহার' এই কৃদন্ত পদের কর্ম, এবং 'আহার' আবার 'করা' ক্রিয়ার কর্ম। এখানে তাঁর মতামত সংগত ও যুক্তিসহ এবং অতি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ধারণাকে আশ্চর্যভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। 'আহার' মূলে ছিল ক্রিয়া, পরে বিশেষ্য হয়েছে, আধুনিক পরিভাষায় বলতে পারি, nominalization transformation হয়েছে। সুতরাং তার কর্ম থাকতে বাধা নেই।

সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক অনেক চিন্তাই হরপ্রসাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। 'মিশ্র ক্রিয়া' সম্বন্ধে মতামত অবশ্য আমি অন্যত্র দেখিনি। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ঋণ হরপ্রসাদের সম্ভবত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির কাছে। পূর্বোল্লেখিত তাঁর ক্যালকাটা রিভিউর প্রবন্ধটিতে শ্যামাচরণ বরং আরো অনেক বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলেছিলেন।[৩৩] তিনি

যেমন রাঁধা। রান্না করা। যৌগিক ও সরল ক্রিয়ার মধ্যে সে সম্বন্ধ নেই। এ বিষয়ে আমার এম. এ. থিসিস (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়) "Aspects of the Compound Verb in Bengali"-তে (১৯৭৫) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৩৩. আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের, কিন্তু বসুবতার হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলীতে (২২৫-২৩১ পৃষ্ঠা) সংকলিত "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধটিতে শ্যামাচরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন।" যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, শ্যামাচরণ যে বাংলায় লিঙ্গভেদ মানেন না—এটা তাঁর একটা বাড়াবাড়ি। "পৃথিবী" কথাটি যে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ নয়, এটা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করবেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভুল, শ্যামাচরণই ঠিক। তথাকথিত সংস্কৃত শব্দবহুল সাধুভাষায় "শ্যামাবঙ্গভূমি", "মহতী জনসভা", "নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা" ইত্যাদির ব্যবহার আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাঁটি বাংলার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই—তা বাংলা ভাষার একটি অতিশয় সংকীর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। আর আমাদের ধারণা, ঐ লিঙ্গ প্রকরণও সংস্কৃত থেকে আস্ত ধার করা, যাই হোক, ঐ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কথা বাদ দিলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে লিঙ্গ কোথাও নেই। মনে রাখতে হবে লিঙ্গ ব্যাপারটা অর্থের নয়, ব্যাকরণের জিনিশ। স্ত্রীত্ববোধক শব্দ আর স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এক নয়। ব্যাকরণে লিঙ্গ কখন আছে বলা যায়? যখন দেখি একটি শব্দের লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে বাক্যের অন্য কোনো শব্দের (বিশেষণ/ক্রিয়া/নির্দেশক সর্বনাম…) চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। বাংলা শব্দে অর্থের দিক থেকে Sex-এর পার্থক্য আছে, কখনো-কখনো Sex-জ্ঞাপক প্রত্যয়ও পাওয়া যায়, যেমন মজুর-মজুরনী, মাস্টার-মাস্টারনী, কিন্তু gender নেই। Gender আছে হিন্দী, জার্মান, ফরাসি ইত্যাদি ভাষায়।

বাংলা ব্যাকরণে কারকের ধারণাটির পুনর্বিচার করতে বলেছেন (p. 398), সন্ধি সমাসকে তুলে দিতে বলেছেন (p. 401)। কিন্তু বলেছেন, genuine Bengali compound 'শ্বশুরবাড়ি' ইত্যাদি রাখতে হবে। তবে শ্যামাচরণের ব্যাপকতর প্রভাব লক্ষ্য করি বাংলা ভাষার লেখ্যরীতি সম্বন্ধে হরপ্রসাদের ধারণায়। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি।

ছয়.

বাংলা ব্যাকরণ ছাড়া হরপ্রসাদের মনোযোগের আরেকটি বৃহৎ ক্ষেত্র ছিল বাংলা ভাষার লেখ্যরীতি। তা কীরকম হবে? এক্ষেত্রে হরপ্রসাদ নিজে তাত্ত্বিক আলোচনা যেমন করেছেন, তেমনি স্বয়ং practitioner হিসেবে নিজের সুপারিশগুলিকে নিজেই কাজে লাগিয়েছেন। এখানে বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁর খুব কাজে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন 'সেকালে' ভদ্রসমাজে তিন প্রকার বাংলা ভাষা, অর্থাৎ তিনটি স্টাইল চলত। একটা ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রীতি, আর একটা ফার্সি-উর্দু শব্দবহুল আদালতের রীতি, আর একটা হল এ দুই ঝুঁকে-পড়া রীতির মধ্যপন্থী একটি রীতি, যার মধ্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংস্কৃত এবং দরবার-আদালতের ফার্সি-উর্দু—দুয়েরই ছিটে-ফোঁটা মেশানো থাকত। এটিকে হরপ্রসাদ বলেছেন বিষয়ী লোকের বাংলা।[৩৪] কথকদের ভাষা ছিল এই বিষয়ী লোকের ভাষা। এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আমাদের দেখিছেন যে, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের হাতে একদিকে যেমন তৎসম শব্দবহুল ঐকান্তিকতা দেখা গেল পণ্ডিতী রীতিতে, তেমনি অন্যদিকে দেখাচ্ছেন, ইংরেজি-ওয়ালাদের ইংরেজি অন্বয়ের প্রভাবে লেখা ইংরেজির দিকে ঐকান্তিক (extreme) বাংলা তৈরি হল।[৩৫] এতে ইংরেজির গন্ধই আছে। সংস্কৃতওয়ালাদের প্রধান অপরাধ, তাঁরা চলতি কথাকে বাদ দিয়ে সাধারণ লোকের কাছে অপরিচিত কথাকে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ চলতি কথার বিকল্প খোঁজেন। চলতি কথার উপর সংস্কৃতপন্থী লেখকদের বিদ্বেষের প্রধান কারণ দুটি। একটি সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ এর অনেক কথাই মুসলমান আমলে বাংলায় ঢুকেছে, অর্থাৎ ওগুলি এঁদের কাছে 'মুসলমানী' শব্দ। হিন্দু

৩৪. "বাঙ্গালা ভাষা", দ্র. হ-র ১, পৃ.১৯৯।

৩৫. "অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন." দ্র. হ-র ১, পৃ. ২৮১।

পণ্ডিতদের সেদিক থেকে একটা শুচিবাই আছে, প্রাণ গেলেও 'তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না।' ফলে তাঁরা এই রকম অদল-বদল করেন :

আছে	বসাও
'কলম'	'লেখনী'
'দোয়াত'	'মস্যাধার'
'পাট্টা'	'ভোগবিধায়ক পত্র'
'আদালত'	'বিচারালয়'

হরপ্রসাদ শ্যামাচরণেরই প্রতিধ্বনি করছেন এখানে, বলছেন, প্রচলিত 'মুসলমানী' শব্দ রাখতে হবে।[৩৬] শ্যামাচরণ চালু তদ্ভব বাংলা শব্দগুলি ব্যবহারের পক্ষপাতী, সেগুলিকে জল-অচল করে সেগুলির তৎসম রূপ এনে বসানোর বিরুদ্ধে তিনি মুখর : 'The displacement of familiar, Sanskrit-derived Bengali words by their Sanskrit originals can be justified on no reasonable grounds.'[৩৭] এই উদ্ধৃতির সূত্রেই আমরা এসে পৌঁছুই চলতি শব্দের প্রতি একদল লেখকের বিদ্বেষের দ্বিতীয় কারণটিতে। এটি শ্রেণীগত কারণ, status-এর বোধের সঙ্গে জড়িত আভিজাত্যের অহমিকাপ্রসূত : চলতি কথাকে তাঁরা 'ইতুরে' কথা বলে মনে করেন। তাই তাঁদের শাব্দিক বিনিময়ের ধাঁচটি এই :

আছে	বসাও
'সময় কাটানো'	'সময় কর্তন করা'
'বাড়িয়ে গুছিয়ে নেওয়া'	'পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া লওয়া'
'দল বাঁধিয়া কাজ'	'দলবদ্ধ হইয়া কাজ'
'গালগল্প'	'স্বকপোলকল্পিত'
'ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া'	'কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া'

'সময় কর্তন করা'-র দৃষ্টান্তটি শ্যামাচরণের প্রবন্ধেই আছে। তাঁর আরো চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত ছিল—'লোফা'-র জায়গায় 'উৎক্ষেপ করিয়া পুনর্বার হস্তে গ্রহণ করা'।

৩৬. দ্র. শ্যামাচরণের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. 405-6। এই প্রসঙ্গে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ"-এ হরপ্রসাদ মুসলমানদের আরো উৎসাহের সঙ্গে পরিষদে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে-কথাগুলি বলেছিলেন, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। দ্র. হ-র১, পৃ. ২৪৮-৯।

৩৭. পূর্বোল্লেখ, পৃ. 405।

এই দুই বিদ্বেষের—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর উন্নাসিকের বিদ্বেষের—বিরুদ্ধে হরপ্রসাদ শ্যামাচরণের মতোই স্বচ্ছ দৃষ্টি ও উদার কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্বাভাবিক দাবিতে ফার্সি-উর্দু শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। কাজেই এ ভাষার শব্দ হিসেবে তারাই বনেদী, তৎসম শব্দ অধিকাংশই পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। 'যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে।' এ হল একদিকের যুক্তি, ইতিহাসের যুক্তি। আরেক দিকের যুক্তিকে ইংরেজিতে বলতে পারি pragmatic। অন্তত অর্ধেক বাঙালি যখন মুসলমান এবং সম্ভাব্য পাঠকগোষ্ঠীর অন্তর্গত—তখন সংস্কৃত শব্দের ধুমধাড়াক্কা দিয়ে তাদের বিমুখ করে লাভ কী? হরপ্রসাদের স্পষ্ট কথা—'আমি বলি, যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চলতি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চলতি, তাহা ইংরেজীই হউক, পারসীকই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক।'[৩৮] এও শ্যামাচরণেরই কথা। তিনিও antique বা poetical words-এর বদলে living words চান, চান যে, 'রণ', 'সমর' বা 'সংগ্রাম'-এর বদলে 'লড়াই', বা 'যুদ্ধ' চলুক লেখার ভাষায়।

হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নিজেকে 'শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির চেলা' বলে জাহির করেছিলেন। এ কথা যথার্থ, কারণ বহু ক্ষেত্রেই হরপ্রসাদ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' (১২৮৫) প্রবন্ধে[৩৯] শ্যামাচরণের বহু কথারই পুনরাবৃত্তি আছে, এবং দুটি দীর্ঘ উদ্ধৃতিও রয়েছে। যাই হোক, রীতির দিক থেকে এমন এক বাংলা তৈরি করার আকাঙ্ক্ষা হরপ্রসাদের ছিল যাতে তিনি চেয়েছিলেন পরিচিত, চলতি শব্দাবলির পরিমাণ যেন বেশি

৩৮. হ-র ১, পৃ. ২৮২।

৩৯. এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ১২৮৫-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "বঙ্গদর্শন"-এ "বাঙ্গালা ভাষা" বলে অস্বাক্ষরিত যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই হওয়া উচিত, কেননা ১২৮৮-জ্যৈষ্ঠে ঐ নামেই, ঐ "বঙ্গদর্শন"-এই আরেকটি প্রবন্ধ বেরোয়। রীতির দিক থেকে প্রথমটি যেমন নির্ভুলভাবে বঙ্কিমী, পরেরটি স্পষ্টতই হরপ্রসাদের। সমস্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলীতেই "বিবিধ প্রবন্ধ"-এর অংশ হিসেবে প্রথম প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য সংসদ-এর "বঙ্কিম রচনাবলী"তে (যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ১৩৬১, পৃ. ৩৬৮-৩৭৪) কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া অংশ হল শ্যামাচরণের ঐ প্রবন্ধ থেকে দুটি বড় উদ্ধৃতি; এবং উদ্ধৃতির অনুস্মৃতিবাচক বাংলা বাক্যাংশ। সাহিত্য পরিষদের বঙ্কিম রচনাবলীতেও এই ব্যাপার আছে। বসুমতীর হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃতি দুটি রয়েছে। যতদূর মনে হচ্ছে মূলেও, অর্থাৎ "বঙ্গদর্শন"—এও তা ছিল।

থাকে—তা তাদের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বংশ পরিচয় যাই হোক ('কেন সাধু করিয়া চলিত শব্দ ত্যাগ করি'[৪০])। ফলে তদ্ভব শব্দ, ফার্সি-উর্দু থেকে, ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা থেকে, এমন কি সংস্কৃত থেকে ধার-করা যে-সব শব্দ সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার এক্তিয়ার পর্যন্ত পৌঁছেছে, অথচ যেগুলি 'ইতুরে' বা 'অশিষ্ট' নয়—সেগুলি বর্জন করলে চলবে না। অনাবশ্যক শুচিবাই বা purism-এ হরপ্রসাদের বিশ্বাস নেই। সংস্কৃত থেকে ধার-করা তৎসম শব্দ যেগুলি সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য, বা ইংরেজির অনুবাদে বা প্রভাবে অন্বয়ের ক্লিষ্টতা—এ সবই তিনি পরিহার করতে বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন সেই খাঁটি বাংলা, যাকে তিনি বলেছেন 'মাতৃভাষা' :

> 'আমি মাতৃভাষায় কথা কই ; অতি শিশুকালে বাপ-মা যে কথাগুলি শিখাইয়াছেন, সেই কথাগুলি আমার মুখে আইসে, কলমে বাহির হয়। সংস্কৃতে পোরা সাধুভাষা আর সেই ভাষায় ইংরেজী ভাবে ইংরেজী ইডিয়মের তরজমা দিয়া একটা জাঁকালো বক্তৃতা করিতে পারিব না।'[৪১]

হরপ্রসাদের নিজের স্টাইলও তাঁর বিশ্বাসের হাত ধরেই চলেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাও তাঁর 'স্বচ্ছ, সরল' 'খাঁটি বাংলা'-র জন্য যে রীতির তুলনা দুর্লভ। সুশীলকুমার দে এই স্বচ্ছতা এবং সরলতার একটি সম্ভাব্য উৎসের উল্লেখ করে বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সহজ ঘরোয়া ভাষা বোধ হয় অজ্ঞাতে তাঁহার সাহিত্যিক মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।'[৪২] 'বাঙ্গালা ভাষা' (১২৮৮) প্রবন্ধে দেখেছি যে, হরপ্রসাদ বিষয়ী লোকের রীতিটি বেশি পছন্দ করতেন এবং কথকতার শৈলী সম্বন্ধে তাঁর প্রচ্ছন্ন অনুমোদন ছিল। এ সম্বন্ধে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে সংকলিত তাঁর প্রবন্ধটিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৪৩] বলা বাহুল্য প্রথম থেকেই হরপ্রসাদ এই রীতিতে এসে পৌঁছোন নি। 'কাঞ্চনমালা'-তে (১২৮৯) তাঁর ভাষা গুরুগম্ভীর সংস্কৃতরীতি ও সহজবোধ্য খাঁটি বাংলার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উপন্যাসে বর্ণনার সময় যেখানে তিনি বঙ্কিমী অক্ষরডম্বরের দ্বারা আক্রান্ত—তিনি নিজেই এক সময়ে বিদ্যাসাগরের বাংলার চেয়ে বঙ্কিমের রীতিতে তৎসম শব্দের বাহুল্যের কথা

৪০. হ-র ১, পৃ. ২০৭।

৪১. "মেদিনীপুর পরিষদের সভাপতির কথা" (১৯১৭), হ-র ২, পৃ. ৪৬১।

৪২. হ-র ২, পৃ. 'ঋ'। বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২২০ দ্র.

৪৩. বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২৭৭-২৮৮ দ্র.

স্বয়ং বিদ্যাসাগরের কাছে শুনেছিলেন,[৪৪] সেখানে ১২৮৮-র 'বঙ্গদর্শন'-এর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তাঁর ভাষা ঐ খাঁটি বাংলার খুবই কাছাকাছি। উপন্যাস রচনায় সম্ভবত সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কিছু বেশি ছিল তাঁর উপর, অর্থাৎ যে ভাষায় 'সরু-মোটা খেলে'[৪৫] সেই ভাষার সম্মোহন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর রীতির সেই আত্মপ্রতিষ্ঠায় দেরিও হয়নি তত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনারীতির এই বিবর্তন লক্ষ্য করে বলেছেন যে, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠেন।'[৪৬] তাঁর রচনারীতির ক্ষেত্রে এই বিভাজন-রেখা বিশেষভাবে কৌতূহল জাগায়।

সাত.

বাংলা ভাষাতত্ত্বের অনেক গৌণ ক্ষেত্র সম্বন্ধেও হরপ্রসাদের আসক্তি ও অনুসন্ধান সামান্য ছিল না। 'পরিভাষা' এমন একটি ক্ষেত্র। শ্যামাচরণের দ্বারা অনুভাবিত হয়েই ('ক্যালকাটা রিভিউ'-র প্রবন্ধটির শেষ দিকে, 416-17 পৃষ্ঠায় শ্যামাচরণের এ সম্বন্ধে মতামত আছে), হরপ্রসাদ কঠিন ও সাধারণের পক্ষে দুষ্পাচ্য পরিভাষা-নির্মাণের বিরোধী ছিলেন। এখানেও লোকপ্রচলিত শব্দের প্রতি তাঁর পক্ষপাত দেখা যায়, যেমন observatory-র স্থলে সংস্কৃত পণ্ডিত যেখানে করেছিলেন 'পর্যবেক্ষণিকা', হরপ্রসাদ সেখানে চান হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের তৈরি অতিশয় সহজ ও পারঙ্গম 'তারা-ঘর' শব্দটিকে[৪৭]। তাঁর মতে পরিভাষা নির্মাণে প্রথমে বাংলা কথার খোঁজ করতে হবে। 'নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার যে ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত।'[৪৮] হরপ্রসাদ

৪৪. "বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ", হ-র ২, পৃ. ১৬।

৪৫. দ্র. "কাঞ্চনমালা"-র মুখবন্ধ, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য রচিত। হ-র ২, পৃ. ২৯৬।

৪৬. "ভূমিকা", হ র ১, পৃ. ঢ। বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ২০৭ দ্র.

৪৭. প্রথমে "নূতন কথা গড়া" (১২৮৮) প্রবন্ধে, তারপরে "অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন"-এ (দ্র. হ-র ১, পৃ. ২৮৩) তিনি এই পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন। এবং ভদ্রজনের মত নিজেই তাঁর কথা ও কাজের সমন্বয় করেছেন "ব্যানোগী টিব্বা" প্রবন্ধে। সেখানে তিনি "তারা-ঘর"-ই লিখেছেন (হ-র ১, পৃ. ১৪১)।

৪৮. হ-র ১, পৃ. ২৮৩। "নূতন কথা গড়া" প্রবন্ধটিতেই তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পণ্ডিতী "উপত্যকা"র তুলনায় হিন্দী "দুন" কথাটি কত ভালো।

ঠিকই ধরেছিলেন যে, পরিভাষা সমস্যা আসলে ধার করা culture-term-এর সমস্যা। ধারণা বা বস্তুটি যদি দেশের পক্ষে নতুন হয়, তাহলে মহাজন-ভাষা (source language) থেকে খাতক-ভাষাতে (target language-এ) তাদের জ্ঞাপক শব্দবলিকেও সরাসরি নেওয়া যেতে পারে—তাতে জাত্যভিমানের প্রশ্ন ওঠে না।[৪৯] শ্যামাচরণও বলেছিলেন 'borrow English, if necessary' (416)। ফলে হরপ্রসাদকে আমরা বহু ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করতে দেখি। তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দিচ্ছি:

> 'Anthropology, archæological report, bird's eye view, Burma, Cambodia, case, catalogue, column, communal interest, competition, concert, election, encyclopædia, enjoy করা, fiction, friend philosopher and guide, ideal, idealism, logic, metaphysics, morality, motion, museum, orbit, obedience, painter, personal interest, preach করা, preaching, quote করা, saint, special person, syllogism, volume.

নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) পরিভাষা সম্বন্ধে চমৎকার তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন হরপ্রসাদ।[৫০] একাধিক বাংলা পরিভাষার (যেমন 'উপন্যাস' ইত্যাদি) নানা ত্রুটিও তিনি এ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। যাঁরাই বাংলা পরিভাষা সমস্যা নিয়ে ভাববেন তাঁদের এ প্রবন্ধটি নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

এ থেকে যদি আমরা ভেবে নিই যে নতুন পরিভাষা নির্মাণ সম্বন্ধে হরপ্রসাদের বিমুখিতা ছিল তাহলে খুব ভুল করব। হরপ্রসাদ নিজেও বহু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, কখনো কখনো সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকেই উপযুক্ত প্রতিশব্দ তুলে এনে,—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সুনির্দিষ্ট করে। এ রকম কিছু উদাহরণ:

> character—পাত্র, contradiction in terms—সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য, etymology—ব্যাকরণ, humanitarianism—মনুষ্যানুরাগ,

---

৪৯. এ প্রবন্ধ লেখার পরে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে আহূত একটি আলোচনা সভায় (২৯. ৯. ৭৭) আমি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত করে বলেছি। "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকায় ১৪ অক্টোবর ১৯৭৭ সংখ্যায় তা প্রবন্ধের আকারে মুদ্রিত হয়েছে।

৫০. হ-র ২, পৃ. ১২১-২৬।

inference—অনুমান, ladies' man—সুভগ, masterpiece—উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, misanthrope—মনুষ্যবিদ্বেষী, perception—প্রত্যক্ষ, sentiment—ভাব, syntax—বাদার্থ, transition period—পরিবর্তন সময়।

তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতি থেকে বিলিতি থিয়েটারের নানা আমদানি করা কথার প্রতিশব্দ খুঁজে বার করেছেন।[৫১] এর কিছু কিছু কথা পুনরুদ্ধার করা সম্বন্ধে তাঁর প্রধান যুক্তি এই—'শব্দগুলি ছোট, মধুর এবং অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে।' এ থেকেই তাঁর মানসিক প্রবণতাটি বোঝা যায়।

আট.

শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধান বিষয়ে তাঁর আগ্রহ, বলা বাহুল্য, তার শব্দের বা পরিভাষার সুপ্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এসেছে। শব্দের প্রাচীন ও মৌলিক অর্থ সম্বন্ধে যেমন তিনি অবহিত ছিলেন, তেমনি তার ঐতিহাসিক অর্থান্তরের (historical semantics-এর) ধারাটিকেও তিনি অনুসরণ করতেন। 'চলন্তিকা'-র আলোচনায় 'অভিধান' কথাটির মৌলিক ও অর্থ তাঁকে ব্যাখ্যা করতে দেখি, আবার 'লিচ্ছবি জাতি' প্রসঙ্গে 'ক্ষত্রিয়' শব্দটির মানে কীভাবে 'ক্রমে বদলাইয়া গিয়াছে' তা তাঁকে আলোচনা করতে দেখি।[৫২] 'উপবাস' শব্দটি নিয়েও তিনি একইভাবে অর্থবিবর্তনের সূত্র ধরে এগিয়েছেন[৫৩]। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকায় 'চারণ' ও 'ভাট' প্রসঙ্গে যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন (বর্তমান গ্রন্থের ২১০ পৃ. দ্র.), তা এই প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। বস্তুতপক্ষে তাঁর বহু আলোচনাই শব্দের যথাযথ অর্থের সমীক্ষা।

বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর 'বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর' প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক। এতে অনুপুঙ্খের ক্ষেত্রে একটু-আধটু সংশয় থাকলেও বঙ্গাক্ষরের বিবর্তনের ছবিটি মোটের উপর বেশ ফুটেছে। বাংলা বানান সম্বন্ধেও তাঁর উদ্বেগের পরিচয় পাই, বিশেষ করে পণ্ডিতেরা যখন তদ্ভব শব্দের বানান তৎসম শব্দের কাছাকাছি টেনে নিয়ে 'কাজ'-কে 'কায', 'জাদু'-কে 'যাদু' ইত্যাদি বানিয়ে তোলেন। কিন্তু শ্যামাচরণ যেমন বাংলা বানান সম্বন্ধে বলেছিলেন,

৫১. "অর্ধেন্দুশেখর", দ্র. হ-র ২, পৃ. ৪৯

৫২. হ র ২, পৃ. ৪৭৫।

৫৩. হ-র ১, পৃ. ৪৪৫।

'The system is nearly as bad as the English' (409), সেরকম কোনো সর্বাঙ্গীণ অসহিষ্ণুতা, এবং তারই ফলে বানান-সংস্কারের একটি ব্যাপক কর্মসূচী, হরপ্রসাদে লক্ষ্য করি না।

নয়

উপসংহার

বাংলা ভাষাতত্ত্ব যে হরপ্রসাদের জিজ্ঞাসার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না, তা আমরা জানি। ফলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক জায়গায় আমাদের নেতিবাচক কথাই বলতে হয়েছে। কিন্তু এও দেখার মতো যে, গতানুগতিক চিন্তার বাইরে দাঁড়িয়ে যে বিষয়েই হোক কথা বলতে তিনি দ্বিধা করতেন না। ব্যস্ততার, এবং সুশীলকুমার দে যেমন বলেছেন—একটি সাংবাদিকসুলভ ব্যগ্রতার জন্য তাঁর পাণ্ডিত্য যে একটি স্থায়ী শান্তি ও স্থৈর্য লাভ করতে পারেনি, এ ক্ষতি সমগ্র দেশের। কিন্তু এমন সর্বব্যাপী জিজ্ঞাসার তুলনাই বা আর কোথায় ? হয়তো ব্যক্তিগত অভিমানও তাঁর পাণ্ডিত্য ও অর্জিত জ্ঞানকে শেষ পর্যন্ত থিতোতে দেয়নি, কিন্তু যথার্থ বিদ্বানের কৌতূহল, শক্তি, স্মৃতি, শ্রমশীলতা সবই তাঁর প্রচুর পরিমাণে ছিল। আর ছিল বিষয়কে সরস ও সহজ করে প্রকাশ করার আশ্চর্য ক্ষমতা, যা খুব কম বিদ্বানের থাকে। সব কিছুর উপরে, ব্যক্তিগত অভিমানের পাশাপাশি ছিল তাঁর বিনয়, হয়ত তাঁর অভিমানেরই ওপিঠ—যার প্ররোচনায় তিনি সহজেই বলতে পারতেন—'ভুলভ্রান্তি মানুষের হইয়া থাকে [,] যিনি উহা ভদ্রভাবে দেখাইয়া দেন আমি তাঁহার গোলাম হইয়া যাই।'[৫৪]

এই ব্যক্তি তাঁর বিপুল মনীষা ও পাণ্ডিত্যকে অতিক্রম করে, একটি সজীব, ও জীবনের চেয়ে অতিশয় বৃহদাকার মানুষ হিসেবেও, আমাদের নিয়ত আকর্ষণ করবেন।

৫৪. ননীগোপাল মজুমদার, "চল্লিশ বৎসর পূর্বে: রাজেন্দ্রলাল মিত্র", বর্তমান গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠা দ্র.

তুষার চট্টোপাধ্যায়

লোক সংস্কৃতি ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯০৮-এর নভেম্বর মাসে। কিন্তু,

> '...Government put him on the day of his retirement in charge of a Bureau of information for the benefit of Civil Officers in Bengal, ***in history, religion, customs and folklore of Bengal...***'[১]

ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে সত্তর বৎসর পূর্বে অবসরোত্তর জীবনে হরপ্রসাদকে প্রশাসকদের সহায়তা দানের জন্য যে বিভাগীয় কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছিল 'ফোকলোর' তথা লোককৃতি[২] বা লোকসংস্কৃতি ছিল তার অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রকৃতপক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধ্রুপদী নিষ্ঠা পূর্বাপর লোকায়ত অনুষঙ্গেই অন্বিত এবং তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা বহুলাংশে লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসায় বিকশিত। এইজন্যই সম্ভবত আমাদের ইতিহাস রচনায় তিনি পাশ্চাত্ত্য মোহ বিমুক্ত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশ্বস্ত ভিত্তিভূমি থেকে দেশের অবয়ব আবিষ্কার করে নিতে চেয়েছেন।

'আমাদের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢেলে সাজার কথা বলেছিলেন, দেশের ইতিহাস রচনায় ইউরোপীয়ানরা আমাদের যে পথে

---

১. *Mahamahopadhyay Haraprasad Sastri, M. A., C. I. E., F. A. S. B* Printed and Published by Upendra Nath Bhattacharyya, Calcutta 1916, p. I.

২. "ফোকলোর"-এর প্রতিশব্দ হিসাবে "লোককৃতি" শব্দটি বর্তমান প্রবন্ধকার চয়ন করলেও প্রচলনগত সিদ্ধির কথা ভেবে বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বাপর ''লোকসংস্কৃতি" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

চালিয়েছেন সে পথ পরিত্যাগ করে নিজেদের চেষ্টায় স্বদেশের ঐতিহ্যের স্বরূপ বুঝবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে এই উদ্দেশ্যে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আধুনিক অর্থে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি হয়তো পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু লোকসংস্কৃতির সন্ধান ভিন্ন যে ভারততবিদ্যাচর্চা সম্পূর্ণ হতে পারে না এ-বোধ তাঁর ছিল। তাই দেখা যায় তাম্রলিপি, প্রস্তরলিপি, প্রাচীন পুথি, শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্বাপর লোকায়ত বিষয়ের চর্চা করেছেন। পুরাণাদি গ্রন্থ ছাড়া সে-যুগে অন্য উপাদান গবেষক মহলে প্রায়শ উপেক্ষিত হত, সেই সময়ে তিনি লোকায়ত ধর্ম-আচার-বিশ্বাসের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান সন্ধান করেন। এদিক থেকে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং বাঙলার ইতিহাসকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের পটভূমিতে অনুশীলনের প্রচেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষণার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের বৌদ্ধপ্রবণতা প্রসিদ্ধ, তাঁর বৌদ্ধানুরাগ মূলত লোকজীবনমুখীনতারই প্রমাণ। স্মরণীয়, লোকায়তিক কাপালিক প্রভাবের কথা আলোচনায় তিনি দেহসাধনাভিত্তিক বহু গৌণ ধর্ম-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন যারা নরনারীর মিথুনাত্মক ক্রিয়ার সাধনায় সিদ্ধিলাভে সচেষ্ট এবং এই সূত্রে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার ইতিহাসের উপরে আলোকপাত করেছেন।[৩] ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনে পঠিত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ সহজিয়া বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আদিম উর্বরতা জাদুবিশ্বাসের অনুষঙ্গে কিভাবে যৌন-সাধনার উন্মেষ ঘটেছে—আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী বা নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতো সে বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর না হলেও বৃহস্পতিসূত্র অবলম্বনে কাপালিক সাধনমার্গকে তিনি লোকায়ত বস্তুবাদী দর্শনের ন্যায় সুপ্রাচীন বলে মনে করেছেন।[৪]

বিমলাচরণ লাহা লিখিত 'লিচ্ছবি জাতি' গ্রন্থের ভূমিকায় এবং প্রাচী (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত 'ব্রাত্য' প্রবন্ধে শাস্ত্রী মশাই ঋষি মণ্ডলের বহির্ভূত ও ঋষি সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী যাযাবর শ্রেণীর ব্রাত্যদের কথা বলেন এবং ব্রাত্যস্তোমের মাধ্যমে কিভাবে ব্রাত্যদের শুদ্ধ করে ঋষিসমাজভুক্ত করা হত তার পরিচয় দেন। ব্রাত্য বিষয়ে আলোচনায় তিনি আর্য-অনার্য মিলন মিশ্রণের শাস্ত্রীয় প্রথা ব্যাখ্যা করেন এবং 'সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে' বাঙলার মাটিতে মিশ্র সংস্কৃতির

৩. *'Lokayata'*, উদ্দালক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক সংকলন, ভাটপাড়া ১৯৫৫।
৪. পূর্বোক্ত সূত্র।

প্রক্রিয়ায় কিভাবে আর্য-অনার্য ভাবধারা মিশ্রিত হয়েছে তার ইতিহাস বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন,

> 'এইরূপ আচারে বল, ব্যবহারে বল, উপাসনায় বল, দর্শনে বল, ধর্মে বল, অধর্মে বল, আহারে বল, অনেক নূতন নূতন জিনিস আসিয়া এই মিশ্রিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল আবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গালায় আসিয়া উপনীত হইবে, তখন দেখা যাইবে আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী।'[৫]

এখানে উল্লেখযোগ্য, অধুনা সংস্কৃতিবিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতি প্রবাহে যেভাবে মিশ্র সংস্কৃতির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন সেইভাবেই হরপ্রসাদ বাঙলার সাংস্কৃতিক চরিত্র অনুধাবন ও তার মধ্যে দেশী বা লৌকিক উপাদানের মাত্রাধিক্য নির্দেশ করেছেন।

বিধিবদ্ধভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চা না করলেও শাস্ত্রী মশাই-এর রচনাদির বিক্ষিপ্ত উপকরণ এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় লোকসংস্কৃতির বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও আকর্ষণ ছিল। দেশীয় প্রাচীন সব রকম জিনিসে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। পাঁচালী, কীর্তন, শ্যামাসংগীত,বাউল প্রভৃতি গান শুনতে তিনি ভালবাসতেন। ভিখারী-বাউল-বৈরাগীদের বাড়িতে ডেকে এনে গান শুনতেন। নিজে ভোজন রসিক ছিলেন ; বিশেষত দেশীয় রান্না—বেতোক চচ্চড়ি, চই-এর ঝাল, মুগের টোপা, আমের ফটিক ঝোল, তিল পিটুলি, কাসুন্দি প্রভৃতি ভালোবাসতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ভিটায় প্রস্তরলিপি স্থাপনের সময়ে প্রায় দেড়শ অতিথিকে তিনি আপ্যায়িত করেন। পাড়ার মহিলাদের মধ্যে যিনি যা ভালো রান্না জানতেন তাঁকে দিয়ে সেই রান্না করিয়ে বাহাত্তর রকমের ব্যঞ্জন পরিবেষণ করানোর ব্যবস্থা করেন। বাড়ির মেয়েদের বারব্রত করায় উৎসাহ দিতেন। নিজেদের বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজার পরিবর্তে ভাদ্র-লক্ষ্মী পুজার প্রাধান্য ছিল। এ বিষয়ে তিনি বলতেন, এটি প্রাচীন প্রথা। আধুনিক কৃষিব্যবস্থার ফলে আশ্বিন পৌষ মাসে শস্য প্রাচুর্য এবং লক্ষ্মী পুজার চলু হয়েছে। পূর্বে জুম্ চাষ পদ্ধতির কালে ভাদুই লক্ষ্মীই ছিলেন লোক সমাজের প্রধান পূজিতা দেবী। বাড়ির মেয়েদের তিনি কাঁথা তৈরি করায় উৎসাহ দিতেন। নিজে মুর্শিদাবাদ থেকে বালাপোশ আনাতেন। যখন

৫. হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১১।

যেখানে যেতেন, সেখানকার স্থানীয় শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করতেন। তাঁর সংগ্রহ করা কাঠ, হাতির দাঁত, মোষের শিঙ প্রভৃতি উপাদানে তৈরি নস্যদান ; গণ্ডারের খড়্গ থেকে তৈরি দশ অবতার মূর্তি খচিত কোশা ও নক্শা করা কুশি ; পত্রপুষ্প উৎকীর্ণ শঙ্খ ও দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ; দশাবতার তাস প্রভৃতি এখনও বাড়িতে রক্ষিত আছে। শাস্ত্রী মশাই নিজে ঘুরে ঘুরে স্থানীয় উৎসব পার্বণের খোঁজ নিতেন, তথ্য সংগ্রহ করতেন। ঘোষপাড়া কুলেরপাটের মেলায় ছেলেদের পাঠাতেন।[৬]

লোকসংস্কৃতির প্রধান শাখা লোকসাহিত্য মৌখিক ভাষায় রচিত এবং মৌখিক ধারায় বিবর্তিত হয়। ছড়া ও গীত সংগ্রহ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'মুখ হইতে লিখিয়া লইতে হইয়াছে' তাই 'উহাতে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে ; এমন কি নূতন ভাবও প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক বিভক্তিযুক্ত শব্দ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে।'[৭] মৌখিক ধারায় লোকসাহিত্যের পরিবর্তনশীলতার কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের গান ও দোঁহার আলোচনায় সবিশেষ মনোনিবেশ করলেও শাস্ত্রী মশাই লৌকিক প্রবাদের সূত্রে oral tradition-কে মূল্য দিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। 'এই সময়ে আরও অনেক বাঙ্গালা গীত ও ছড়া লেখা হয়। আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই ধান ভানুতে মহীপালের গীত। সুতরাং মহীপালের গীত বলিয়া একটা জিনিস সেকালে ছিল।'[৮] প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি অবৈষ্ণব কবিদের গান, শ্যামা বিষয়ক গান, কর্তাভজার গান, কবিগান, আফআখড়াই সং, পীর বনবিবির পালা, তরজা-ঝুমুর, ঠানদিদির মুখে ব্রতকথা শোনার অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আদি রসের গানে 'রাধাকৃষ্ণের দোহাই' দেওয়া যে লৌকিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তিনি তার চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন বিদ্যাপতি বিষয়ে আলোচনায় নিজস্ব সংগৃহীত কয়েদীদের গানের উল্লেখে।[৯] এখানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয় রীতি-

৬. ৯, ৪. ৭৬ এবং ২৪. ৫. ৭৬ তারিখে নৈহাটির শাস্ত্রী বাড়িতে শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পরিতোষ ভট্টাচার্য এবং পৌত্র শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভট্টাচার্যর সঙ্গে আলোচনায় তাঁর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে এই সব তথ্য সংগ্রহ করেছি।—লেখক।

৭. হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৬৩, পৃ. ২৪১।

৮. পূর্বোক্ত সূত্র।

৯. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ২২৮

বিরুদ্ধভাবে যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন তাতে লোকসাহিত্যের স্তর থেকে উচ্চতর সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণকথা অনুপ্রবিষ্ট হবার সম্ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে।

লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট বিভাগ প্রবাদ সম্পর্কে হরপ্রসাদ মূল্যবান আলোচনা করেছেন 'ডাক ও খনা' শীর্ষক প্রবন্ধে। ১০৯০ সালে লেখা 'ডাকচরিত' নামক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি পুঁথি থেকে প্রবাদ বচন সংগ্রহ করে ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণে প্রবাদের কাল নির্ণয় করে বলেছেন, 'যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝিতে হইবে ডাক ও খনার বচন বৌদ্ধদের নয়, হিন্দুর। তাও খুব পুরাণ নয়। মুসলমান আমলের বটে, কিন্তু কত পুরাণ বলা যায় না। বোধ হয় পাঠান আমল হইতেই আরম্ভ; মোগল আমলে শেষ।'[১০]

প্রধানত প্রবাদগুলিতে ব্যবহৃত আরবী-পারসী শব্দের সাক্ষ্যে এবং ভাষার আধুনিক রূপ দেখে যেভাবে তিনি কাল নির্ণয় করেছেন তা লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান সম্মত নয়। মৌখিক ধারায় বিবর্তিত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ন্যায় প্রবাদের অঙ্গে নানা কালের ছাপ থাকা সম্ভব। একই প্রবাদের যুগোপযোগী ভাষাগত রূপ গ্রহণ বা ভাবগত রূপান্তর সাধন একান্ত স্বাভাবিক। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী এই সত্য জানেন বলে লোকসাহিত্যের মধ্য থেকে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে বিবর্তনগত সত্যের মূল্যায়ন করেন। হরপ্রসাদ এ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বলা যাবে না, কারণ তিনি নিজেই তামাক চাষ সম্পর্কে একটি প্রবাদের আলোচনায় বলেছেন, 'খনার বচন সংগ্রহমাত্র, উহাতে অনেক কালের অনেক জিনিস আছে।' আসলে নির্দিষ্ট একটি পুঁথি নির্ভর আলোচনা হওয়ায় আলোচ্য রচনায় ঐ পুঁথিগত দৃষ্টান্ত সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য সঠিক হলেও সমগ্র ডাক-খনার বচন সম্পর্কে মন্তব্যটি যথাযথ নয়। অবশ্য প্রবাদ সম্পর্কে তাঁর সাধারণ মন্তব্যগুলির মধ্যে লোকসংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ প্রণিধানযোগ্য। যেমন,

> 'অল্প কথায় এত ভাব প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই সকল বচনে খুব অল্প কথায় অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছে।...ছোট ছোট কথায় ছোট ছন্দে একটি পাকা উপদেশ। ডাকের বচন শুধু জ্যোতিষ ও চাষ লইয়া নয়। ইহাতে আরও অনেক কথা আছে। ছেলে মানুষ করা, গৃহিণীর দোষ, গৃহিণীর গুণ, সতীর লক্ষণ, অসতীর লক্ষণ, ব্যঞ্জন রাঁধা, বর্ষার লক্ষণ, ওষুধ এবং আরও অনেক কথা আছে। উপদেশ অনেক রকম আছে।'

১০. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৩১৩

এখানে লৌকিক প্রবাদের সাভিপ্রায়মূলক সংক্ষিপ্ত ভাষণের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে।

হরপ্রসাদ নিজে সৃষ্টিশীল রচনা ও বিতর্কমূলক প্রবন্ধে নানাভাবে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। কথাসাহিত্য রচনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে রূপকথার বিশিষ্ট ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। রাজবৃত্তের কাহিনী আশ্রিত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পথ পরিত্যাগ করে তিনি জনসমাজের ইতিহাস ও লোকায়ত জীবনকে ভিত্তি করে 'বেণের মেয়ে' রচনা করেন। এই উপন্যাসে যেমন এক দিকে আছে বৌদ্ধ-হিন্দু সংঘর্ষ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের বিবরণ, তেমনি আছে স্থানীয় উৎসবাদির বর্ণনা ও বাংলার লৌকিক জীবনের সর্বায়তনিক রূপ।

'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনায় বিশেষভাবে উভয় সম্প্রদায়ের আহার-বিহার আচার-ব্যবহারের প্রভেদ নির্দেশ করেছেন। এই আলোচনায় লোকায়ত জীবনাচারের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি দেশকাল অনুযায়ী আচার-ব্যবহারের পার্থক্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। 'বামুনের দুর্গোৎসব' রচনাতেও 'দুর্গা বিপত্তি' প্রভৃতি নানা লৌকিক সংস্কারের উল্লেখ আছে।

'লোকসংস্কার' সম্পর্কে শাস্ত্রী মশাই-এর আগ্রহের দিক থেকে তাঁর '*Superstitions Prevalent in the Sundarbans*' নামক প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা যায়নি। এই প্রবন্ধ শাস্ত্রী মশাই-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন মনে করার কারণ আছে। সুন্দরবন-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ গবেষক কালিদাস দত্তর পুত্র বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বিমল দত্ত বর্তমান লেখককে এক চিঠিতে জানিয়েছেন,

> 'আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় কালিদাস দত্ত মহাশয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক। তিনি গভীর আগ্রহে ও কঠিন পরিশ্রমে এই অঞ্চল পরিদর্শন করেন ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ শুরু করেন। এই সময় মজিলপুরে আমাদের বাড়ীতে দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্টেলা ক্রামরিশ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর যাতায়াত ছিল এবং শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার জন্য এখানে আসিতেন। জয়নগর মজিলপুরের দত্ত পরিবারের মধ্যে অন্য কেহ সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে

পড়াশুনা বা গবেষণা করেন নি। সে কারণ উদ্দালকের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক সংকলন গ্রন্থে পিতৃদেবের যেভাবে উল্লেখ আছে তা ঠিকই।[১১]

মনে হয়, সুন্দরবন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রগবেষণা কর্মে রত কালিদাস দত্তের সহায়তায় বা অনুরূপ সূত্রে শাস্ত্রী মশাই সুন্দরবনের কুসংস্কার সম্পর্কে প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন।

লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট শাখা Folk-culinary বা লোকব্যঞ্জন সম্পর্কে শাস্ত্রী মশাই-এর আগ্রহ ছিল সমধিক। ইতিপূর্বে তাঁর ব্যক্তিগত খাদ্যরুচির কথা উল্লেখ করেছি। অনুরূপ আরও কিছু উল্লেখ পাওয়া যাবে বর্তমান সংকলনে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থে শাস্ত্রী মশাই-এর বাড়িতে সুর্যপক্ব গঙ্গাজলী নাড়ু খাবার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনায় বাঙালির বিভিন্ন রান্নার উল্লেখও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ লোকনাট্য সম্পর্কে শাস্ত্রী মশাই-এর আকর্ষণের প্রমাণ তার রচনায় পাওয়া যায়। *The Origin of Indian Drama*' প্রবন্ধে তিনি জর্জর পূজার প্রথায় নাটকের আদিম পূর্বসূত্র নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে জর্জর পূজা যেন পাশ্চাত্যের শীতের পরে বসন্তের আগমনে নবজীবনের প্রতীক ওকবৃক্ষের শাখা নিয়ে নৃত্যগীতে অনুষ্ঠিত মেপোল উৎসবের তুল্য। কালের বিবর্তনে ইন্দ্রের নাম যুক্ত হলেও এবং নূতন ব্যাখ্যা আরোপিত হলেও জর্জর পূজার আদিম প্রথার সাথেই ভারতীয় নাট্যকলা বিকাশের ইতিহাস জড়িত, তিনি এই মত পোষণ করতেন। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'ভরতসূত্র যদি খ্রীষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্ব্বে অনেক নাট্য সম্প্রদায় ছিল' (প্রাচীন বাংলার গৌরব)। সেই কালে বাংলার নাটকের একটি স্বতন্ত্র রীতি প্রচলিত ছিল স্মরণ করে তিনি বাঙালির গৌরব ঘোষণা করেছেন। 'সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ'-এ ও 'অর্ধেন্দুশেখর' (নাচঘর, ২৭ আষাঢ়, ১৩৩১) প্রবন্ধে কবিগান-আখড়াই গান-যাত্রা প্রভৃতির উল্লেখে লৌকিক রীতির নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

---

১১. শান্তিনিকেতন থেকে ১০ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে লেখা চিঠি। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য 'উদ্দালক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক সংকলন', ভাটপাড়া, ১৯৭৫-এর সতের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হরপ্রসাদের চিঠিতে 'দত্ত মহাশয়' উল্লেখ। জয়নগর-মজিলপুরের কালিদাস দত্তকেই শাস্ত্রী মশাই এভাবে উল্লেখ করেছেন।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বিভাগ লোকশিল্প সম্পর্কে শাস্ত্রী মশাই-এর ব্যাপক আগ্রহের পরিচয় তাঁর রচনাবলীতে প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রাচীন বাঙলার গৌরব' নামক রচনায় তিনি নদীমাতৃক বাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর নৌকার বিবরণ দিয়ে নৌ-শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে লোকায়ত বাঙলার পাথর, পিতল, তামা, সোনা, কাঠ ও মৃৎশিল্পের কথা আলোচনা করেছেন। বাঙলার ভাস্করের কাজ বিষয়ে আলোচনায় তিনি মূর্তিবিদ্যার (Iconography) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং বিশেষভাবে দাঁইহাটের ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উল্লেখ করেন। বাঙলার লোকশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন দশাবতার তাস তিনি সংগ্রহ করেন প্রায় আশি বৎসর আগে এবং এই তাস ও তাসখেলার বিবরণ প্রকাশ করেন ('Visnupur Circular Card', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 64, Pt. I, 1895.)। এ আলোচনার শেষ অংশে ঐতিহ্যানুসারী কিংবদন্তী অনুসরণে বুদ্ধের নবম অবতারত্বের স্থলে পঞ্চম স্থান গ্রহণের সূত্রে এবং বুদ্ধের পদ্ম প্রসঙ্গে এই খেলার প্রাচীনত্ব ও কাল নির্ণয় করে বলেছেন,

> 'The Malla Rajas have left behind them an era of which 1201 corresponds to 1895 A. D., and I fully believe that the game was invented eleven or twelve hundred years before the present day.'

'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) পুস্তিকায় হরপ্রসাদ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ অনুসরণ করে বাঙলার বাকলের কাপড় 'দুকূল'-এর উৎকর্ষের কথা বলেছেন এবং বাঙলার কাপাস-বস্ত্রের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রেশমশিল্পের জন্ম চীনদেশে—এই ধারণা সম্পর্কে হরপ্রসাদ প্রশ্ন তোলেন এবং সুবর্ণকুড্য তথা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের পত্রোর্ণ বা রেশম বস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। প্রসঙ্গত মালদহের রেশমী কাপড় ও ঢাকার মসলিনের উল্লেখ করেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তিনি বাঙলার বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় রেশম চাষের পদ্ধতি, তুলা সংগ্রহ, সুতো পাকানো ও কাপড় বোনার প্রথাগত পদ্ধতিরও বর্ণনা দিয়েছেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, শাস্ত্রী মশাই লৌকিক পাল-পার্বণ সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। গ্রামবাঙলার মেলা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর স্মৃতিকথাটি থেকেও জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রামপ্রসাদের ভিটের মেলা বসাতে তিনিই সচেষ্ট হয়েছিলেন। নৈহাটির নিকটবর্তী দুটি মেলা—ঘোষপাড়া ও কুলেরপাটের মেলা সম্পর্কে তাঁর

আগ্রহের কথা শ্রীযুক্ত পরিতোষ ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছি। ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের গান সম্পর্কে একটি উল্লেখ ('মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা' রচনায়) থেকে মনে হয় ভাবের গীতকে তিনি স্বতন্ত্র সংগীত-মূল্য দিতেন। 'চণ্ডীদাস', 'বৃহস্পতি রায়মুকুট', 'বাম্মনের দুর্গোৎসব' প্রভৃতি রচনায় বাশুলী, মঙ্গলচণ্ডী, শক্রোত্থান বা ইন্দ্রপুজা, জন্মাষ্টমীর উৎসব, কাঠাম পুজার প্রথা, চণ্ডীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, ষষ্ঠীপুজো প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। রাজপুতনার মরু অঞ্চলে অগ্নিপুজার অবশেষ আবিষ্কার তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। *Discovery of Living Buddhism in Bengal* প্রবন্ধেও ৪৫ নং জানবাজার স্ট্রিটের ধর্মঠাকুরের মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চানন্দ, শীতলা, ষষ্ঠী, জ্বরাসুর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর বিবরণ দেন। অনুরূপভাবে 'সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ'-এ তিনি অনেক পীর-ফকির ও আঞ্চলিক দেবদেবীর কথা আলোচনা করেছিলেন—যার মধ্যে কালু রায়, দক্ষিণ রায়, সা জঙ্গুলী, পীর গোরাচাঁদ প্রধান।

'রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল' (১৩০৪) ও *Discovery of Living Buddhism in Bengal (1897)* রচনা দুটিতে হরপ্রসাদ ধর্মঠাকুরের পুজায় বৌদ্ধধর্মের সজীব অস্তিত্ব প্রমাণের যে চেষ্টা করেছেন তা যুক্তিযুক্ত না হলেও ধর্মঠাকুরের মধ্যে অনার্য-লৌকিক উপাদান সম্পর্কে তাঁর ইঙ্গিত অভ্রান্ত। *Buddhism in Bengal since Muhammadan Conquest (1895)* প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

> 'The Buddhism has a wonderful aptitude in assimilation of various forms of demon and other worships, is well known from the history of Buddhism in Nepal and Tibet. The Dharma worship appears to be a similar assimilation of some old-world superstition with Buddhism.'

বৌদ্ধ প্রবণতায় পরবর্তীকালে যে মতই তিনি ব্যক্ত করুন না কেন, ধর্মপুজার মধ্যে অনার্য-লৌকিক উপাদানের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা শাস্ত্রী মশাই-ই যে সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেছিলেন সে কথা অবশ্য স্মরণযোগ্য।

শাস্ত্রীয় দেব-দেবীর লৌকিক উৎস সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আলোচনার মধ্যে শিব বা মহাদেব ও দুর্গা প্রধান। 'ব্রাত্য' ও 'মহাদেব' প্রবন্ধে শিব বা মহাদেব সম্পর্কে আলোচনায় তিনি মহাদেবের মধ্যে আর্যসমাজ বহির্ভূত

লোকায়ত বৈশিষ্ট্যের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং আর্ষ ঋষি সমাজে ব্রাত্যদের আগমন কালেই ব্রাত্য শিব গৃহীত হয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শিবের মতো দুর্গাকেও শাস্ত্রী মশাই লোকায়ত উৎসজাত মনে করতেন। 'বৃহস্পতি রায়মুকুট' প্রবন্ধে বৃহস্পতির উল্লেখ অনুসারে 'বড়' ও 'ছোট' দুই রকমের দুর্গোৎসবের আলোচনায় তিনি কল্পারম্ভ, নব পত্রিকা স্নান বা কলাবৌ নাওয়ানো, বিজয়ার ক্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গল ও নীরাজন এবং শাবরোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা' প্রবন্ধটি লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধে তিনি বৃক্ষ বা শস্য সম্পর্কিত শরৎকালীন লোকউৎসব কী ভাবে শাস্ত্রীয় দুর্গাপূজায় রূপান্তরিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই আলোচনা প্রকৃতপক্ষে নবপত্রিকার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার সূত্রে আধুনিক নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দুর্গোৎসবের মৌল চরিত্র উদ্ঘাটন।

বৃক্ষপূজা সম্পর্কে হরপ্রসাদের একটি মূল্যবান রচনা 'ঢেলাই চণ্ডী'। নৈহাটির পূর্বাংশে মাঠে কতিপয় লোককে তিনি একটি গাছের গোড়ায় (date tree) মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করতে দেখেন। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানেন যে ঐ গাছে চণ্ডী অবস্থান করেন। মাটির ঢেলা তাঁকে উৎসর্গ করতে হয় এবং তিনি ঐ ঢেলা খান। ক্রমে তিনি ঐ দেবীর মাহাত্ম্যও অবগত হন। পরে নৈহাটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই রকম ছয়-সাতটি গাছের পূজার কথা জানতে পারেন। এর প্রায় দশ বৎসর পরে আবার খোঁজ নিতে গিয়ে পূজার পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং লেখেন,

> 'Thus in the course of ten years I found there were great changes in this very simple tree worship, the offerings had improved, the sphere of usefulness of the deity had expanded, a myth had grown up, and it only remained for a priest to appear in order to raise the worship to the dignity of a cult'.[১২]

এখানে হরপ্রসাদ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই লোকবিশ্বাসজাত লৌকিক পূজানুষ্ঠান কীভাবে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য কবলিত ও শাস্ত্রীয় হয়ে ওঠে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ও ম্যালি জেলা গেজেটিয়ার-এ হরপ্রসাদের এই আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

১২. "Dhelai Chandi, a from of treo worship", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. LXXI, Part III, 1902, p. 2.

লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনায় শাস্ত্রী মশাই পূর্বাপর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন এবং নৃতত্ত্বগত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। একটি চিঠিতে তিনি বিনয়তোষ ভট্টাচার্যকে লেখেন,

'আমাদের স্মৃতি থেকে যে অনেক এ্যান্থ্রপলজির গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হইতে পারে এটা আমার দৃঢ় সংস্কার।...কিন্তু এসব বুঝিতে হইলে এ্যান্থ্রপলজি একটু জানা চাই।'[১৩]

প্রয়োজনে যে তিনি নিজে নৃতত্ত্বের সাহায্য নিতেন তার প্রমাণ 'দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা' নিবন্ধের নিম্নবর্তী অংশ,

'অ্যান্থ্রপলজির পুস্তক পড়িলে দেখা যাইবে, পৃথিবীর নানা স্থানে শীতের প্রারম্ভে এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব হইয়া থাকে। ক্রমে সেই গাছপালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হন। ক্রমে সেই দেবতাগণের মূর্ত্তি হইল। এমন সময়ে দুর্গা-মাহাত্ম্য নামক পুস্তকের উৎপত্তি হইল। দুর্গা-মাহাত্ম্যের সহিত মিলাইয়া নয় মূর্ত্তি হইতে ছোটখাট মূর্ত্তি বাদ দিয়া বড় বড় মূর্ত্তি দিয়া উৎসবের প্রতিমা গড়া হইল। ক্রমে সে সকল মূর্ত্তি এক মূর্ত্তিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল ; তিনিই প্রধান মূর্ত্তি—তিনিই—দুর্গা। তিনিই—দশভুজা। গাছপালার পূজা ক্রমে ব্রাহ্মণদের হাতে পড়িয়া অম্বেতে পরিণত হইল।'

নৃবিজ্ঞানসম্মত লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের প্রধান ভিত্তি উপযুক্ত ফিল্ড ওয়ার্ক বা ক্ষেত্রানুসন্ধান। আধুনিক লোকসংস্কৃতি চর্চায় ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ তথ্যকে তত্ত্বের আলোয় বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাঙলার ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ অনুরূপ পদ্ধতির কথাই বলেছিলেন,

'বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। পূর্ব্ব গৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস।....এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুঁথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্ত্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে।...
আমাদের চক্ষু নাই, তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইতিহাসের

---

১৩. উদ্দালক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক সংকলন, ভাটপাড়া ১৯৭৫, পৃ. আঠার-উনিশ।

> অনেক তত্ত্ব মাটীর উপরিভাগে পড়িয়া আছে। অনায়াসেই খুঁজিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু খুঁজিবার লোক কই।'[১৪]

হেতমপুরে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর 'কেন্দুবিল্ব কাহিনী' প্রবন্ধ শুনে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছিলেন, 'এমনি ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করলে তবেই কাজ হবে। ঘরে বসে গেজেটিয়ারের অনুবাদে ইতিহাস হবে না।'[১৫] বলাবাহুল্য হরপ্রসাদের এসব মন্তব্যে ক্ষেত্রানুসন্ধানের উপরেই গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তিনি নিজে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং সংগ্রাহক পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আনাতেন। ধর্মঠাকুর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আনবার জন্যে তিনি বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে ময়নাগড়ে এবং রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ঘাটালে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর 'রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের তথ্যলিপিটি যেভাবে যুক্ত করেছেন তা আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। অধুনা নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র পরিদর্শন বা ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তর মূলক (participant observer and interview method) যে ক্ষেত্রগবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়, হরপ্রসাদ পূর্বোক্ত 'ঢেলাই চণ্ডী' সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। হরপ্রসাদের রচনাবলী অনুশীলন করলে বোঝা যায়, তিনি গ্রন্থ-পুঁথি-লিপির পাথুরে প্রমাণকে চূড়ান্ত মনে করতেন না, জীবন-বাস্তবতার লৌকিক পটভূমি থেকে উপাদান সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। মোটের উপর হরপ্রসাদের কর্ম-সাধনা ও রচনা-গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকায়ত জিজ্ঞাসা বিস্তৃত এবং উচ্চ ও লোক-ঐতিহ্যের প্রতি অভিন্ন নিষ্ঠা সম্প্রসারিত, যা নিঃসন্দেহে তাঁর লোকসংস্কৃতি অনুরাগের অন্তঃসাক্ষ্য বহন করে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮। ॥

---

১৪. "সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৬৩, পৃ. ২৪৩।

১৫. বর্তমান গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠা দ্র.

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

হরপ্রসাদের ইতিহাস-দৃষ্টি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত ইতিহাসেও এক সময়ের সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পাল্টে যায়—নতুন তথ্যের আবিষ্কারে, নব নব পদ্ধতির প্রয়োগে। এ ঘটনা ঘটে বলেই ইতিহাস বিষয় হিসাবে প্রাণময়। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি নির্ভর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ সত্যের ব্যতিক্রম হয় না—যাঁরা কোনো যুগ বা বিষয়ের চর্চায় পুরোযায়ী, তাঁদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রায় অনিবার্য। ঔরঙ্গজেব থেকে দ্বিতীয় শাহ আলম পর্যন্ত এই দীর্ঘ যুগের ভারতীয় ইতিহাস যে স্মরণীয় ঐতিহাসিকের নিষ্ঠায়, তথ্য সংগঠনে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে সেই যদুনাথ সরকারেরও অনেক সিদ্ধান্তই এখন নতুন গবেষণার আলোকে সংশোধন করার প্রয়োজন হচ্ছে। যাকে অ্যাকাডেমিকভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয়, যদুনাথের তাতে ঘাটতি ছিল না। সুতরাং আজ থেকে একশ বছর আগে ১২৮২ বঙ্গাব্দে যিনি বঙ্গদর্শনে প্রথম রচনা প্রকাশ করেন, সেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বহু সিদ্ধান্ত যে এখন বাতিল হয়ে যাবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই পুরোযায়ী প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকের পদ্ধতিও যে সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত ছিল না, তাও স্বীকার্য। হরপ্রসাদের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে রাখবার: 'আদিশূরের কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় না—সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদের মতে আদিশূরের নামে কোনও রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না।'[১] এই উক্তিটি সাধারণভাবে আপত্তিযোগ্য মনে হয়, কিন্তু অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদের তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্কতায় যে বাস্তব ফাঁকে পড়ে যায়, তার প্রমাণ আমাদের দেশে ভূরি ভূরি। বস্তুতঃ হরপ্রসাদের কোনো কোনো

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত হরপ্রসাদ রচনাবলী (এর পর থেকে 'হ-র'), প্রথম সম্ভার ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১২।

সিদ্ধান্তের ভুলের কথা আজ স্কুল কলেজের ছেলেরাও জানে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্ব যে ভুল এ কথা হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী পরিষ্কার দেখিয়েছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের মতও এ প্রসঙ্গে আজ গ্রাহ্য নয়। অশোকের অহিংসা নীতির সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি তিনি বোঝেন নি। অতএব হরপ্রসাদ অনেক সিদ্ধান্ত ভুল ভাবে করেছিলেন, তাঁর পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক নয়, তিনি অনেক সময় সহকারীদের কাজ নিজে দেখেন নি, ফলে অনুবাদে কাঁচা ভুল হয়েছে বা তাঁর উৎসাহ পল্লবগ্রাহী ছিল, এসব কথা নিতান্ত বাহ্যিক। আসল কথা, হরপ্রসাদের ইতিহাস চেতনা, ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

বাঙলাদেশে যে ঔপনিবেশিক জাগরণ ঘটেছিল তার সীমাবদ্ধতা ছিল অনেক—কিন্তু সীমার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তির সম্পূর্ণ মানুষের সাধনা ছিল। কোনো বিশেষ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা নয়, আধুনিক বিশেষীকরণ নয়, জীবনের সর্ব দিকে মানবিক উৎসাহই এই সাধনার অন্যতম দিক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই জাগরণেরই অন্যতম ফল। তিনি চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ হতে, তাই তাঁর উৎসাহ নানাদিকে, আর সে উৎসাহ শৌখীন নয়, দস্তুর মত শিক্ষিত—সিরিয়স। হরপ্রসাদকে তাই আমাদের এ যুগের তথাকথিত অ্যাকাডেমিক মানদণ্ডে বিচার করা চলে না। আমাদের পূর্ণ-মনুষ্যত্বের সাধনার যিনি পরিণততম ফসল, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে হরপ্রসাদের এই পটভূমিকা স্পষ্ট হয়েছিল: 'হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূলে পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না।' ইয়োরোপে রেনেসাঁস ইতিহাস চর্চাতেও কেবল স্থূলে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ছিল না। ইতিহাসের বিকাশ সম্পর্কে পদ্ধতিগত জিজ্ঞাসায় সে যুগের ইতিহাসবেত্তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। অতীত সম্পর্কেও যেমন তাঁরা তাঁদের পদ্ধতিগত জিজ্ঞাসাকে প্রয়োগ করে দেখতে চাইছিলেন, রেনেসাঁস অর্থাৎ তাঁদের সমকাল সম্পর্কেও তাঁরা নতুন পদ্ধতিতে আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। রেনেসাঁস ইতিহাসচর্চা বিশ্লেষণ করে ছটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়: 'The six ideas are the ideas of progress, the theory of plenitude of natural, the climate theory, the cyclical theory, the doctrine of uniformitarialism and the idea of dectrine.'[২]

---

২. H. Weisinger, Idea of History during the Renaissance, Paul O. Kristeller and Philip Weiner ed. *Renaissance Essaya*, Harper Torch book 1968.

এই দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর সম্পূরক নয়ঃ প্রগতির ও প্রকৃতির পরিপূর্ণতার ধারণা একদিকে, অন্যদিকে ইতিহাসের যুগাবর্তনের ধারণা—দুটি প্রায় পরস্পরবিরোধী। তবে এর মধ্যে প্রগতির ধারণাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানমুখীনতা অনেকটা এই ধারণার সঙ্গে জড়িত। এ সঙ্গে এটাও স্মরণীয়, প্রাচীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি যে আক্রমণ সতেরো শতকে দেখা যায় তা রেনেসাঁসের উত্তরপর্বের ঘটনা। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত রেনেসাঁসের ইতিহাসবিদরা প্রাচীনদের অধিকারেই বিশ্বাস করতেন। তবে অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমিক পরিবর্তনে এই বিশ্বাস বড় জোর এক শতাব্দী টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল—রেনেসাঁস যে ইতিহাসে এক অনন্যপূর্ব ঘটনা, এ কথা অবশ্য রেনেসাঁসের সময়ই বলা হচ্ছিল। হরপ্রসাদের ইতিহাস দৃষ্টিতে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের প্রতিচ্ছবি খোঁজা পণ্ডশ্রম। কারণ, উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক বঙ্গীয় জাগরণ আর একাধিক শতাব্দী ব্যাপী ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস এক নয়—আকারে প্রকারে মৌলিক তফাৎ। কিন্তু একটি ব্যাপারে উভয়ের মিল আছে—প্রাচীনের আবিষ্কারে। এই প্রাচীনের আবিষ্কারেই হরপ্রসাদের মেধা ও পরিশ্রম মূলত নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের কাছে সমস্যা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ঔপনিবেশিক পরাধীন পরিবেশে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল আর আমাদের উনিশ শতকীয় মহাজনদের মতই তিনি ঔপনিবেশিক কাঠামোকে মেনে নিয়েছিলেনঃ 'ইংরেজরাজের পরাক্রান্ত ভুজচ্ছায়ায় বাস করিয়া আমরা বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া কেবল সাহিত্যের ও জীবনের উন্নতি করিতে থাকিব···।'[৩] এই উক্তিতে হরপ্রসাদের ইংরেজ শাসনপ্রীতি যেমন স্পষ্ট, তেমনি প্রচ্ছন্নভাবে রেনেসাঁসীয় প্রগতি ধারণাও রয়েছে। উনিশ শতক থেকে নিজের সময় পর্যন্ত যুগকে হরপ্রসাদ transition period বা পরিবর্তন সময় বলেছেন। এর প্রারম্ভকাল তিনি ধরেছেন রামমোহনের কলকাতা বাস অর্থাৎ ১৮১৪-র মাঝামাঝি থেকে। লক্ষণীয়, 'রিনেইসান্স', 'মেডিচি' এসব কথা হরপ্রসাদ জানতেন, কিন্তু উনিশের শতকের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস শব্দটি ব্যবহার করেন নি। পরিবর্তন সময়ের কাজ কি? হরপ্রসাদ বলেন, ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, ইংরেজী ভাবের প্রচার, সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালান। 'পরিবর্তন সময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড় বড় চিন্তাশীলগণের সময়।'[৪] এই পরিবর্তনের ফল যে শুভকর, এ বিষয়ে

৩. হ-র ১, পৃ. ২৪৫।
৪. হ-র ১, পৃ. ১৮৩।

হরপ্রসাদের কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে (নাম না করে) হরপ্রসাদ পরিবর্তন সময়ের তুলনা করে বলেছেন: 'কিন্তু আমাদের এ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তখন শুদ্ধ গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃপ্রচার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালায় কি হইয়াছে একবার দেখ দেখি? প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙ্গালীর সম্মুখে আপনাদের গুপ্তভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। এখনকার ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে তখনকার গ্রীকসাহিত্য তুচ্ছ পদার্থ; তাহার উপর আবার সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচার আছে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরুদ্ধার আছে।…ইংলণ্ডের সাহিত্য ফ্রান্সে গিয়া গত শতাব্দীতে এত কাণ্ড করাইয়াছে, আর আজি আমাদের দেশে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জর্ম্মনির, ইতালির, প্রাচীন হিন্দুদের ও প্রাচীন বৌদ্ধদের সাহিত্য উপস্থিত।' হরপ্রসাদ এই সবটাকেই ইয়ং বেঙ্গল বলেন। ইয়ং বেঙ্গলের সুবিধার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: 'প্রধান সুবিধা দেশে শান্তি স্থাপিত আছে, কোথাও কোন গোলযোগ নাই, প্রাণ ও ধন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমীদারের অত্যাচার নাই। কুসংস্কারাপন্ন গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। 'স্বাধীন দেশে দেশ শাসন, শান্তি-রক্ষা, বিচারকার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হেতু কত কত মহাপ্রতিভাশালী লোকের প্রতিভা বিকাশ হইতে পারে না। বাঙ্গালীর অদৃষ্টে এ সকল কার্য্যের জন্য ইংরেজ আছেন। বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে নির্ব্বিবাদে নিরাপদে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে পারেন।' রেনেসাঁস সম্পর্কে হরপ্রসাদের ভ্রান্তিবিলাস ও ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা—বিশেষত পরাধীনতার সুবিধা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—আজ নিশ্চয়ই খুবই প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। যদুনাথ সরকারের মতই হরপ্রসাদ এখানে পরিবর্তন-সময় বা বঙ্গীয় নবজাগরণ নিয়ে উচ্ছ্বসিত। আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয়: দেশে প্রগতি হচ্ছে—হরপ্রসাদ এটাই দেখাচ্ছেন। অন্য একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ভারতচরিত্রে অনেক মলা পড়িয়াছে, অনেক উন্নতিও হইয়াছে। অনেকে যে বলেন কেবল অধঃপাতে গিয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করি না।'[৫] বস্তুতঃ রেনেসাঁস ইতিহাস চিন্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রগতির ধারণা হরপ্রসাদের ছিল—কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই ধারণা বৈজ্ঞানিকমনা স্বাধীন বিকাশের চর্চায় নিয়ে যায় না। হরপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তা হয়নি—হরপ্রসাদ ইংরেজ শাসনের সুফল কীর্তন করেছেন, স্বচ্ছন্দদৃষ্টিতে বিচার করতে পারেন নি পট ও পটধৃত মানুষকে।

৫. হর ১, পৃ. ৫৮০।

তাই হরপ্রসাদের ইতিহাস-চিন্তায় উপনিবেশের যন্ত্রণা কখনও স্পর্শ করেনি : তাঁর লেখা পড়লে কখনোই মনে হয় না তিনি ভারতবর্ষ নামক উপনিবেশের মানুষ, যা মনে হয় রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়লে। বঙ্কিমের, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কমলাকান্ত শীর্ষক রচনাবলীতে যে যন্ত্রণা আমরা দেখি তা হরপ্রসাদের লেখায় কোথাও লভ্য নয়—তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে পারছেন, এটাই অনেক সুবিধা ভাবছেন। পরাধীনতার ওকালতিও করছেন—উপনিবেশের বিকারে প্রগতি ধারণার এই পরিণতিই হয়। সাহিত্য ও ভাষাকে তিনি বৃহত্তর ইতিহাস সংলগ্ন করতে পারেননি, যিনি শেষ জীবনে সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় কখনই ব্যবহার করতে চাইতেন না, সাধু ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও খাঁটি বাঙলা যিনি লিখতেন, তিনিও অ্যাকাডেমিক ব্রহ্মচর্যের বেড়া ডিঙিয়ে বৃহত্তর লোকযাত্রায় নিজেকে মেলাতে পারলেন না। অথচ লোকজীবন সম্পর্কে একই সঙ্গে নানা বিষয় (খাজনা, ইক্ষু ইত্যাদি) সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ রেনেসাঁস লক্ষণ-সূচক। কিন্তু উপনিবেশের ব্যক্তি নিরপেক্ষ পিছুটান তাঁর মধ্যেও, তাঁর প্রগতিধারণা তাই সর্বদা মুক্তি আনে না, নিগড়ে বাঁধে। আর এই নিগড় যথেষ্ট জটিল। ইংরেজ শাসনের অন্যতম গুণগ্রাহী হরপ্রসাদ যখন ইংরেজের সমালোচনা করেন, তখন দেখি তাঁর মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। ১৩২৯-এর ২১শে মাঘ ভারত-হিন্দুসভার প্রথম অধিবেশনে তিনি যে সভাপতির ভাষণ দেন তাতে দেখা যায় তাঁর প্রগতির ধারণাও কত দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার সেখানে তিনি। 'আমরা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী। বেদ আমাদের ধর্ম্ম'। এই আমরা কারা? হিন্দুরা—এখানে হিন্দু মানেই ভারতীয়, কিন্তু 'নন্ মুসলমান'। মুসলমান ও অ-মুসলমান— এই ভাগ তিনি করেন। হরপ্রসাদ স্পষ্ট বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের স্বত্বরক্ষা, আমাদের আচার-ব্যবহারের পবিত্রতা রক্ষা, সনাতন ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা। সে পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব।' হরপ্রসাদ এরপর এক এক করে দেখাচ্ছেন, ইংরাজ শাসন এই সনাতন ধর্মের ওপর আঘাত হেনেছে কতভাবে। যেমন, 'কায়স্থ ধনীর ভাগিনী-পুত্র বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে না, তাঁহাকে অধিকারী করিয়া আদালত ঘোর অবিচার করিয়াছে।' জাতিভেদ প্রথায় যে গণতন্ত্র আছে, হরপ্রসাদ আর কোথাও তেমন দেখেন নি। আর '...জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের সকল রোগের নিদান না হইয়া উহা বহুতর রোগের অমোঘ ঔষধ।' এই প্রথা যাঁরা ওঠাতে চাচ্ছেন, তাঁদের কার্যের প্রতিবাদ করা একান্ত কর্তব্য বলেই হরপ্রসাদ মনে করেন। এমন কি, বৃটিশ সরকার যে গোবরের

পরিবর্তে ফেনাইল ও পারম্যাঙ্গানেট অব পটাসের ব্যবহার চালু করেছিল, হরপ্রসাদের তাতেও ঘোর আপত্তি। বর্ণাশ্রম ধর্মকে রক্ষা করে এই গোবরকেও হরপ্রসাদ রক্ষা করতে চান। হরপ্রসাদ আক্ষেপ করেছেন '...আমাদের সে প্রতাপ আর নাই।' প্রগতি নয়, অধোগতিই হরপ্রসাদ দেখেন এখানে। কিন্তু অনেক ঐতিহ্যবাদী, পুনরুত্থানবাদীর মত হরপ্রসাদ কি তীব্র ইংরাজ বা সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির বিরোধী হতে পেরেছিলেন ? না। এই ভাষণেই 'রাজাবিদেশী' সম্পর্কে বলেন, 'কিন্তু তাঁহারা ত ভাল, প্রতিবাদ করিলে বিচার করেন, ভাল হইবে কি মন্দ হইবে দেখিয়া শুনিয়া বিচার করেন।' হরপ্রসাদের ঔপনিবেশিক প্রগতি-ধারণার এই পরিণতি একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক, পুনরুত্থানবাদী ও ইংরাজভক্ত। প্রাথমিক এই মন্তব্যের পর এসব সত্ত্বেও আমরা হরপ্রসাদের ইতিহাস-দৃষ্টির কয়েকটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁর হরপ্রসাদ জীবনীতে বলেছেন, হরপ্রসাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল চারটি বিষয়ঃ দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি অন্বেষণ, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম ও তার পরবর্তী বিকাশ এবং কালিদাসের কাব্য।[৬] এ মন্তব্যে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু হরপ্রসাদের সব গবেষণা ও চর্চার মূল ভিত্তিভূমি বাঙলা ও বাঙালি এই পরিপ্রেক্ষিত ছিল বলেই হরপ্রসাদ অনায়াসে সর্ববিষয়ে নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে পেরেছেন। এমনকি কালিদাস উপভোগেও তিনি পুরোমাত্রায় বাঙালি। এ ব্যাপারে হরপ্রসাদ অনেকটাই পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের তাৎপর্য সর্ব-ভারতীয় হলেও তার মূল উৎসাহ ছিল বাঙলা ও বাঙালি বিষয়ে। আর বঙ্কিমের বাঙালি চেতনা তো সবাই জানেন। হরপ্রসাদ এই বাঙালি চেতনার অংশভাক্ ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে হরপ্রসাদ বাঙলার পটভূমিতেই দেখেছেন।[৭] আর বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বাঙ্গালার উৎপত্তি বলিয়া বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন'।[৮] এই উত্তরাধিকারই হরপ্রসাদ বহন করেন। কিন্তু হরপ্রসাদের বাঙালি চেতনার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল, সে চেতনা মোটামুটি ভাবে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতামুক্ত, অন্তত প্রথম

৬. Narendranath Law ed. *Mahamahopadhyaya Haraprasad Sastri Memorial Vol.* Calcutta, p. 310.

৭. হ-র ২, পৃ. ৩।

৮. হ-র ১, পৃ. ১৩।

দিকে। বঙ্কিমের মুসলমান বিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদ হরপ্রসাদকে এসময়ে স্পর্শ করেনি। এদিক থেকে আরেক সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগরের মতই তিনি ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষ। হরপ্রসাদ যখন গবেষণায়, সাহিত্য চর্চায় রত তখন বাঙলাদেশে আর্যামির, হিন্দু জাতীয়তাবাদের বন্যা বইছে। মূলতঃ এর উদ্গাতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। রমেশচন্দ্র দত্তর মত চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও হিন্দু আর্যদের ইতিহাস লিখেছেন, হিন্দু শাস্ত্র সংকলন করেছেন। সেখানে হরপ্রসাদের অ-হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী একটি কীর্তিই বলা চলে। হরপ্রসাদ বলেন, 'যে আর্য্য আর্য্য করিয়া দেশশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত, যে আর্য্য নাম বঙ্গীয় যুবকের মুখে দিবানিশি ধ্বনিত, সেই আর্য্যগণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং যে গৌরব তাঁহাদের উপর দিয়া আমরা তাহার অংশ আদায় করি সে গৌরবের তাঁহারা কতদূর অধিকারী ছিলেন, জানা যাইতে পারে।'[৯] ঠাট্টাটি লক্ষণীয়। যারা ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে দেখেন তাঁরা সচেতনভাবে চেষ্টা করলেও এই মনোভাব গোপন করতে পারেন না। হরপ্রসাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা কখনই ঘটতে পারেনি। কারণ মুসলমান বিজয়কে তিনি ভারত তথা বাঙলার ইতিহাসের ভয়াবহ ঘটনা ভাবেন নি, মুসলমানদের দানকে উপেক্ষা করেন নি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ওপর এক কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ধর্মচিন্তা ছিল, তপোবন ছিল—এই ধারণা কত ভুল। হরপ্রসাদের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য সেযুগের পটভূমিকায় তো বটেই, এখনও অবাক করে : 'Take the 13th century of the christian era, when all the kingdoms of Northern India were swept away by the invasion of the sturdy mountaineers of Afghanistan and the entire Hindu Society, there, was convulsed by a revolution the like of which the world has never seen.'[১০] ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ পৃথিবীতে অদৃষ্টপূর্ব এক বিপ্লবের ঘটনা—সংস্কৃতজ্ঞ হরপ্রসাদের এই উক্তি সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের পটে কত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। ভাষাতাত্ত্বিক হরপ্রসাদ জানতেন এই বিজয় শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের জীবনে ও ভাষায় কতদূর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। (এর পাশে যদুনাথ সরকারের বঙ্গীয়

৯. হ-র ১, পৃ. ৩৭৯।

১০. **Haraprasad Shastri, *The Educative Influence of Sanskrit*, Extension lecture delivered at Benaras on the 7th Feb. 1916 ; calcutta 1916, p. 6.**

জাগরণ নিয়ে অনৈতিহাসিক তুলনা ও উচ্ছ্বাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।) যদুনাথের ঔরঙ্গজেবের ইতিহাসকে হরপ্রসাদ এই বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, 'লোকে আরঙ্জেবকে যত মন্দ বলে, তিনি যে ততটা ছিলেন না, সেটা উনি বেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। উনি আরও দেখাইয়াছেন যে, আরঙ্জেব একজন খুব ভাল রাজা ছিলেন। প্রজা হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, প্রজার উন্নতিতে যে রাজার উন্নতি, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং সেইমত কার্য্যও করিতেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বে প্রজা বেশ সুখে ছিল।'[১১] বঙ্কিমী জাতীয়তাবাদের যুগে, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের পটভূমিকায় এই সানন্দ প্রশংসা উল্লেখ করার মত। তেমনি আজ যে যদুনাথ বিরোধিতা এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মধ্যে অসহিষ্ণুভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তাঁদেরও ভেবে দেখা উচিত সমসাময়িক আর একজন ভারতবিদ্যাবিদ্ যদুনাথের গ্রন্থ কীভাবে দেখেছেন। ইদানীং-এর গবেষণায় ঔরঙ্গজীবকে যেভাবে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, তার বীজ যে যদুনাথের রচনায়, হরপ্রসাদের উক্তিতে তার প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য 'হিন্দুর মুখে আরঙ্জেবের কথা' এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে যদুনাথের ঘোরতর আপত্তি ছিল, অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস শাখার অধিবেশনে এই প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ হরপ্রসাদকে যদুনাথ পড়তে দেননি। এর মূলে যদুনাথের আরঙ্জেব বিরোধিতা, অন্য কিছু সামান্য ভুলের উল্লেখও অবশ্য তিনি করেন। এবং হরপ্রসাদও যে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী শেষ অবধি বজায় রাখতে পারেন নি—আগেই আমরা তা দেখেছি। তবু, উগ্র হিন্দুয়ানীর যুগে যেটুকু রেখেছিলেন, তার জন্যই তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়।

তবে কি হরপ্রসাদের জাতীয়তাবোধ ছিল না? যাঁনিই হরপ্রসাদের রচনাবলী পড়েছেন, তিনিই জানেন এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। তাঁর স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধ হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-নির্ভর বিকৃত জাতীয়তাবোধ ছিল না। জাতীয়তাবাদের ঝোঁকে ইংরেজ স্তোত্র লিখে বা ইংরেজ প্রশস্তি করে তিনি যবনদের বিপরীতে বন্দেমাতরম্ বলেন নি। এ বিকৃতি তাঁর ছিল না। তিনি বলেছেন, 'শুধু ইংরেজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না। কিন্তু এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। ...এইভাবে ইতিহাস চালাইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যের না হইয়া মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে।'[১২] আমাদের ইতিহাস নেই, একথার প্রতিবাদ

১১. হ-র ২, পৃ. ৪২৩।

১২. হ-র ১, পৃ. ৪৭৪।

তীব্রভাবে করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মালমশলা যে ইয়োরোপীয় ধরনের ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যাবে না, এর উপাদান যে ভিন্ন, সেটি বুঝলে প্রায় ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাবে। হরপ্রসাদের স্বাদেশিকতাই তাঁকে প্রচলিত অ্যাকাডেমিক ইতিহাসের উপাদান ছাড়াও, আরও অন্য উপাদানের সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। রাজস্থানের চারণ ও ভাট থেকে শুরু করে নানা ধরনের উপাদানের মধ্যে তিনি ইতিহাস সন্ধান করেছেন। ব্রাহ্মণদের কথাই চরম ভাবেন নি, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকেই একমাত্র ভাবেন নি। জীবনের বৈচিত্র্যের মত, তিনি উপাদানের বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর চেতনা আধুনিক। ভারতবর্ষের মর্মোদ্ধারেই হরপ্রসাদের জাতীয়তাবোধ নিয়োজিত ছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও জাতীয়তাবোধে যখন পরোক্ষে, প্রচ্ছন্নে, কখনও বা প্রকাশ্যভাবে হিন্দুয়ানী প্রবলভাবে উপস্থিত, তখন কিন্তু হরপ্রসাদ মনোযোগ দিয়েছেন বৌদ্ধ ইতিহাসে, বিশেষত মহাযান বৌদ্ধধর্মে। মনে রাখতে হবে, ভিনসেন্ট স্মিথের মত ঐতিহাসিকও এই সময়ে পুরাণ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থকে প্রাচীন ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান মনে করতেন না। সেই সময়ে বৌদ্ধদের প্রতি মনোযোগ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বারা তিনি প্রভাবিত, যেমন দুষ্প্রাপ্য পুথি অন্বেষণেও তিনি রাজেন্দ্র-লালের উত্তরাধিকারী। বাঙলা দেশের ইতিহাসকে হরপ্রসাদ বৌদ্ধ আন্দোলন ও বৌদ্ধধর্মের পটভূমিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের ও সমন্বয়ের ইতিহাসে হরপ্রসাদ প্রাচীন বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসের মূল সূত্র পেয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ইতিহাসকে, ব্রাহ্মণদের হরপ্রসাদ খুব একটা ভালো চোখে দেখেন নি। স্পষ্টই বলেছেন, বৌদ্ধ সমাজ ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে উন্নত ছিল। বস্তুত হরপ্রসাদের হিন্দুনিরপেক্ষ জাতীয়তা বোধের মূল অনেকটা তাঁর এই বৌদ্ধ উৎসাহে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'বৌদ্ধযুগ ভারত ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ।...ইহা আর্য ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক ধর্ম বন্যায় ভাঙিয়াছিল...ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর।...ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া এই মহাযান

বৌদ্ধপুরাণ সকলের অনুশীলন করিতে হইবে।'[১৩] ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেন হরপ্রসাদেরই মনের কথা বলেছেলেন। হরপ্রসাদ বৌদ্ধদের ইতিহাসকে মাত্র ধর্মের দিক থেকে দেখেননি, সামগ্রিক ইতিহাসের দিক থেকেই দেখেছেন।[১৪] বলেছেন 'বৌদ্ধধর্ম্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম্ম নগর ও গ্রাম সর্ব্বত্র সমানভাবে আদর পাইত।' অবশ্য সামাজিক পটভূমিকায় বৌদ্ধ ইতিহাস বা মহাবান বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা হরপ্রসাদ করেন নি। করেন নি বলেই বৌদ্ধধর্ম কেন নগরের পক্ষে সুবিধা তা তিনি ব্যাখ্যা করতে চান নি। ইদানীং-এর গবেষণায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধ আন্দোলন ও বৌদ্ধযুগের অপরিসীম তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে—তার সামাজিক পটভূমিও ব্যাখ্যাত হচ্ছে।[১৫] তাতে হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনেকটা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে বৌদ্ধ-ইতিহাসের প্রতি তার মনোযোগ। ইতিহাসের ব্যাপক দৃষ্টি না থাকলে এটা ঐ যুগে সম্ভব হত না। যদিও এ ব্যাপারে হরপ্রসাদ একাকী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের চরিত্রটিও মনে রাখা দরকার। মহাযান বৌদ্ধধর্মের হাতেই ভারতীয় ভাববাদ formidable philosophy হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্মের ভাববাদী উপাদান মহাযানীদের হাতে আরও স্পষ্ট ও প্রকট হয়। কারো কারো মতে মহাযান বৌদ্ধধর্মে তন্ত্র-কান্টের উদ্ভব সুস্থতাই—মূল বৌদ্ধধর্মের মধ্য পথে আবার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা।[১৬]

হরপ্রসাদের এই বৌদ্ধ মনস্কতাই তাঁকে আরও দুটি দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় হরপ্রসাদ বুঝেছিলেন ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা লোকজীবনাশ্রয়ী ঐতিহ্য আছে, আর এই ঐতিহ্য আজও বিলুপ্ত হয়নি, প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্নে তা অব্যাহত। ইতিহাসের বিশ্লেষণে এই লোকজীবনমুখীনতা হরপ্রসাদের অন্যতম কীর্তি বলে স্বীকার করতে হয়। ১৯২৫-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত তার *lokayata* নামক পুস্তিকাটি ও ১৩৩০ সালে প্রকাশিত 'ব্রাত্য' প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত: লোকায়তরা আজও এদেশে বিলুপ্ত হয়নি—সহজিয়া প্রভৃতি নামের আড়ালে এরা এখনও

---

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাস, বিশ্বভারতী পৃ. ৭৮ ৮০।

১৪. হ-র ১, পৃ. ৪১৬, ৪২৫, ৪৩৪, ৪৫৬।

১৫. D. D. Kosambi, *The culture and Civilization of Ancient India in Historical outline*, London, 1965 এবং A. K. Warder, Feudalism and Mahayana Buddhism, in R. S. Sharma ed. *India Society: Historical probings; In memory of D. D. Kosambi*, 1974.

১৬. *What is living and what is dead in Philosophy* Debiprasad Chattopadhyaya, P P H. 1976, Niranjan Dhar, *Vedanta and Bengal Renaissance*, Minerva 1977.

আছে। প্রাচীন বস্তুবাদের প্রতি হরপ্রসাদের এই উৎসাহের গুরুত্ব আরও বোঝা যায় যখন আধুনিক পণ্ডিত বলেন, 'লোকায়তর বিচারে মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত প্রকৃতই যুগান্তকারী।'[১৭] হরপ্রসাদ বরাবরই ভারতীয় ইতিহাসের বিশ্লেষণে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় উপাদানের ওপর তত জোর দেন নি, যতটা দিয়েছেন সামাজিক বস্তুগত দিকের ওপর। ব্রাত্য সম্পর্কে আলোচনায় হরপ্রসাদ বলেছেন, 'যজুর্বেদে ব্রাত্য শব্দের অর্থ হইল একটা প্রকাণ্ড দলের লোক যাহারা চীৎকার ও গোলমাল করে। তাহারা ঋষিদিগের সমাজভুক্ত নয়, বরং তাহাদের বিরোধী।...ব্রাত্যেরা যাযাবরের দল। কিন্তু তাহারা আর্য্য জাতি ও ঋষি সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী।' এরাই ব্রাত্যস্তোমের মাধ্যমে আর্যসমাজে সামিল হতেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণে এই ব্রাত্যদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় বোঝা যায়, হরপ্রসাদ প্রচলিত ব্রাহ্মণ নির্ভর ব্যাখ্যায় ভরসা করতেন না। বিশুদ্ধ আর্যামিতে তার আস্থা ছিল না। তিনি কেবল প্রাচীন গ্রন্থাদির তাত্ত্বিক কাঠামোকেই চূড়ান্ত মনে না করে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি যে খুব অগ্রসর হয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীটি নিশ্চয়ই মূল্যবান। এই বাস্তবতাবোধ ছিল বলেই হরপ্রসাদ দৈনন্দিন জীবন, পোশাক-আশাক ইত্যাদি উপাদানের উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'এখন ক্রমে বাঙ্গালা নাটকে ও দেখাদেখি ভারতের অন্যত্র পোষাকপরিচ্ছদ অলংকার আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকতাবোধ আসিয়া গিয়াছে; এবং আমি বলিব, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রথম চেষ্টা এই ব্যাপারের বীজস্বরূপ'।[১৮] কিন্তু এর থেকেও বড় কথা, হরপ্রসাদ পোশাক-পরিচ্ছদকে ইতিহাস বোঝবার একটা বড় উপাদান মনে করতেন। পোশাক পরার রীতিনীতি ও তার বিবর্তনের থেকে সেই যুগ সম্বন্ধে যে অনেকটা বোঝা যায়, বা কাল নির্ধারণ করা যায় হরপ্রসাদই বোধ হয় প্রথম এটি গভীরভাবে দেখান। শিশুনাগ মূর্তি সম্পর্কে জয়স্বালের সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে গিয়ে হরপ্রসাদ এই পোশাক ও তা পরিধানের রীতির ওপরই জোর দিয়েছেন।[১৯] নতুন ধরনের ঐতিহাসিক উপাদানের প্রতি তাঁর ঝোঁকের এটি যেমন একটি প্রমাণ, তেমনি বস্তুগত ব্যাখ্যার দিকের প্রবণতার একটা উদাহরণ।

---

১৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

১৮. হ-র ১, ভূমিকা।

১৯. **Haraprasad Shastri, "Sisunaga statu"** ***The Journal of the Bihar and Orissa Research Society***, **Dec. 1919.**

বৌদ্ধযুগের প্রতি উৎসাহে ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে হরপ্রসাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর যুগের অন্যান্যদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কনফ্লিক্ট বা বিরোধের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সমন্বয়ের ইতিহাস, ধারাবাহিক শান্তির ইতিহাস একথা আর্য-অনার্য, হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের উল্লেখে তিনি অস্বীকার করেছেন। আমাদের ইতিহাসে তিনি যে দুটি বিপ্লবের কথা বলেছেন, তার মধ্যে প্রথমটির (খৃ. পূ. ৯০০-৪০০) কারণ হরপ্রসাদের মতে 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য ও অনার্য্য সভ্যতার সম্পর্ক'। ঋষিদের প্রণালী বন্ধ শাসন না থাকাও একটি কারণ।[২০] 'আমরা আর্য্যগণের তৎকালীন ইতিবৃত্ত ভাল জানি না, কেবল নানা শাস্ত্রীয় কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া অনুমান করি মাত্র। কিন্তু অনার্য্য সমাজের কোন সম্বাদই জানি না, জানিবার উপায়ও নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, দুই জাতির সংঘর্ষে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরিবর্ত্তন সময়ে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়।' এখানে 'সংঘর্ষ' ও 'প্রলয়কাণ্ড' শব্দ দুটিতে হরপ্রসাদের ইতিহাস দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত তিনি আরও বালন, 'কোনও জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা কোনও বিষম বিপ্লবের সময় তাহাদের ইতিহাস উত্তমরূপে দেখিতে পারিলে তাহাদের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝা যায়।' বিপ্লব অর্থে হরপ্রসাদ রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সব রকম পরিবর্তনকেই বুঝেছেন। এই ইতিহাস দৃষ্টি, পরিবর্তনের ওপর এই গুরুত্ব আরোপ হরপ্রসাদের যুগে অনন্যসাধারণ বলেই মনে করি। হরপ্রসাদ নিশ্চয়ই দ্বান্দ্বিক ইতিহাস-দর্শন ও চর্চার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বস্তুমুখীনতা, বৌদ্ধযুগ সম্পর্কে উৎসাহ তাঁকে এই বিরোধ ও পরিবর্তন নির্ভর বিপ্লবের ইতিহাস-তত্ত্বে নিয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, এদিকের চর্চা তিনি বিশেষ করেন নি।

হরপ্রসাদ এখানেই থামেন নি। তিনি যে দ্বিতীয় বিপ্লবের (৬০০ খৃ.-৯০০ খৃ.) কথা উল্লেখ করেছেন তার কুফল হিসাবে বলেছেন, মঠ সৃষ্টি ও হিন্দু চরিত্রে বৈরাগ্যের আধিক্য। 'ঐহিক বিষয়ে ইহাদের তাদৃশ মনোযোগ নাই। এ জগত ত মায়া ভ্রম; যাহা উৎকৃষ্ট তাহা এ জন্মের পর; সুতরাং এ জন্মের কাজে মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে।.... বিপ্লবের পূর্বে ঐহিক পারত্রিক প্রায় সমান ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত। বিপ্লবের পর সকলেই যতি।' ভারত উৎসাহী ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যার ওপর জোর দিতেন, হরপ্রসাদ সেই

২০. হ-র১ পৃ, ৩৭৭-৩৯২।

ধর্মীয় দিকটিকেই আঘাত করেছেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বিকাশ আদৌ তাৎপর্যমণ্ডিত বলে মনে হয়নি, দুর্বলতাই ঠেকেছে। এই বস্তু-নিষ্ঠ, বিরোধ-বিপ্লবের তাৎপর্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, হিন্দুয়ানী বিরোধী, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য হরপ্রসাদ আজও আমাদের উৎসাহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। আজকের যথার্থ ভারত ইতিহাস সন্ধানে তাঁর ভূমিকা তাই শেষ হয় না, তাঁর বিশেষ পদ্ধতি বাতিল হয়ে গেলেও।

সত্যজিৎ চৌধুরী

প্রতিহত ঔপন্যাসিক প্রতিভা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এক.

ঔপন্যাসিক হিশেবে হরপ্রসাদ স্বীকৃতি পান নি, কিন্তু লেখক জীবনের শুরু থেকে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। এ আকাঙ্ক্ষার সাক্ষাৎ প্রেরণা নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্র। আবার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপত্তিময় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যের জন্যে কথাসাহিত্যে হরপ্রসাদের মৌলিক সৃজনপ্রতিভা স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হতে পারে নি।

ছাত্রজীবন শেষ হবার আগেই হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শনের এক-জন নিয়মিত লেখক রূপে প্রতিষ্ঠা পান। পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্যে লেখা 'ভারত মহিলা' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছিলেন, এই তরুণ লেখককে তিনি অপ্রত্যাশিত সম্মান দিয়েছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শনে ভারত-মহিলা ছাড়া আরও আঠারোটি প্রবন্ধ লেখেন। এই বৎসরেই বঙ্গদর্শনের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় তাঁর প্রথম মৌলিক রচনা 'বাল্মীকির জয়'-এর তিনটি অংশ প্রকাশিত হল। পুরো লেখাটি বই-এর আকারে প্রকাশিত হল পরের বৎসরে, ১২৮৮ সালে (১৮৮১ খৃ.)। হরপ্রসাদের বয়স তখন ২৮ বৎসর। সাধারণত বঙ্গদর্শনে আগে প্রকাশিত হয়েছে এমন কোনো লেখার সমালোচনা না করা এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি ছিল। কিন্তু নিয়ম ভঙ্গ করে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বইটি সমালোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় প্রশংসার কথা আছে তিনটি : ১. 'কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমময়ী।' ২. 'যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা।…এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি।' ৩. 'আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।' একে অকৃপণ প্রশংসাই

বলতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাল্মীকির জয়'-এর ভেতরের তত্ত্বটি সরাসরি নাকচ করে দেন। বলেন, 'কথাটা বড় পাকা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না।...এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে Physical, Intellectual এবং Moral নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে—এমত আমাদের বোধ হয় না।'

এই লেখায় হরপ্রসাদ পুরাণের উপাদান থেকে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বাল্মীকি চরিত্র তিনটি পুনর্গঠন করেছিলেন। তিনটি চরিত্রেরই উদ্দেশ্য বিশ্বে মানব-ঐক্য প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। বশিষ্ঠ বুদ্ধিবলের শ্রেয়ত্বে বিশ্বাসী, বিশ্বামিত্র বাহুবলের শ্রেয়ত্বে, আর বাল্মীকি নৈতিক বলের। জয়ী হলেন বাল্মীকি। বাল্মীকির ভাবনামন্ত্র প্রীতি, প্রীতিই শ্রেষ্ঠতম শক্তি প্রমাণিত হল। দর্শন ও সমাজতত্ত্বের কোনো কোনো মূল প্রত্যয়ের ভিত্তিতে জাতীয় পুরাণ-ইতিহাসের তথ্যাবলী পুনর্বিন্যাস করে আধুনিক ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় জীবনাদর্শ প্রচারের পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কৃষ্ণচরিত্র বা শেষের দিকের তিনটি উপন্যাস আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার প্রভাবে নবীনচন্দ্রও রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্যে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। রচনার আঙ্গিকের দিক থেকে 'বাল্মীকির জয়'-এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের এসব লেখার কোনোই মিল নেই, 'বাল্মীকির জয়' কৃষ্ণ চরিত্র-এর মতো তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ নয়, উপন্যাস বা কাব্যও নয়। তবুও উদ্দেশ্য ও ভাব-প্রেরণার দিক থেকে একটা অন্তর্গত মিল আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' আর হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়' একই সময়ে লেখা হয়েছিল, বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ শুরু হয় ১২৮৭-র চৈত্র সংখ্যা থেকে, 'বাল্মীকির জয়'-এর একটি অংশও ঐ সংখ্যায় ছিল। কলকাতার বৌবাজার স্ট্রিটের বাসায় সাহিত্যিক বৈঠকে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ পড়ে শোনাতেন। এই-সব বৈঠকে হরপ্রসাদ উপস্থিত থাকতেন অনুমান করা যায়, তখন তিনি কলকাতায় চাকরি করতেন। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে আখ্যানধর্মী রচনার ভেতর দিয়ে একটা জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন।

১২৮৭-র ফাল্গুন মাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষে ২০ বৎসর বয়সের তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ে হরপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'বাল্মীকির-জয়'-এ বাল্মীকির কবিত্ব লাভ বর্ণনায় হরপ্রসাদ 'রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন'। একথা

যদি ঠিক হয় তবুও প্রভাব অংশ বিশেষেই নিবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য আর হরপ্রসাদের রচনায় পরিকল্পনাগত, রচনার আঙ্গিকগত কোনোই মিল নেই। হরপ্রসাদের রচনাটির পত্তনও হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখার আগে, বঙ্গদর্শনের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় দুটি অংশ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির চরিত্রপাত্রে কাব্যসৃষ্টি-প্রতিভার প্রথম উপলব্ধি জনিত বিস্ময় ও আবেগ প্রকাশ করেছেন, অন্যপক্ষে হরপ্রসাদ রূপায়িত করেছেন মানুষের পার্থিব জীবনের চরিতার্থতা বিষয়ে একটা মতাদর্শ। দুটি রচনার আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'বাল্মীকির জয়' অন্তর্গত বক্তব্যের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা পদ্ধতির কাছাকাছি, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা পদ্ধতির সঙ্গে এর কিছুই মেলে না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' সংগীতের এলাকার বস্তু। সংগীতের বন্ধন মোচনের, 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা' গাঁথার একটা পরীক্ষা হিশেবে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটা নূতন পরীক্ষা'। (জীবনস্মৃতি)

জাতীয় পুরাণের আশ্রয়ে নিজের কালের ধ্যানধারণা রূপ দেবার যে পদ্ধতি হরপ্রসাদ উদ্ভাবন করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে তার ইঙ্গিত পেয়ে থাকলেও রচনাটির আঙ্গিক ও বিন্যাস-কলায় কারো কোনো প্রভাব ছিল না। ভাষার ছাঁদটি মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী, কোথাও কোথাও কমলাকান্তের দপ্তর-এর ভাষা মনে করিয়ে দেয়, 'গানে মুগ্ধ কে নয় ? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায়, তখন কে না মুগ্ধ হয় ?···আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহু-ক্ষালিত-চরণা-চির-নীহার-ধবলোন্নত-শীর্ষা প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন।' বাল্মীকির জয়-এর আগে আর্যদর্শনে, 'বঙ্গদর্শনে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার ভাষার সঙ্গে এ ভাষার মিল নেই। প্রবন্ধে লৌকিক কথ্য-ভাষার একটা বিশিষ্ট শৈলী ততদিনে অনেকটাই পরিণত হয়ে উঠেছিল তাঁর হাতে। 'প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ' বা 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা'—এরকম কোনো প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায়, খুব সচেতন ভাবে তিনি ঐ গদ্যের চাল এড়িয়ে একটা স্বতন্ত্র রীতি, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পরিমার্জিত যে গদ্য গড়ে উঠেছিল, সেই রীতি ব্যবহার করেছেন বাল্মীকির জয়-এ। নিশ্চয়ই তাঁর মনে হয়েছিল, সাদামাঠা লৌকিক ধাঁচের ভাষায় এ বিষয়ের মহিমা উপযুক্ত ভাবে ফোটানো যাবে না। বিষয়ের দিক থেকে ভাষার ছাঁদ তৈরি করে নেবার এই

দৃষ্টির পরিচয় তিনি বার বার দিয়েছেন। এতে তাঁর প্রকৃষ্ট শিল্পবোধেরই পরিচয় পাই।

বাল্মীকির জয় পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, পত্রিকায় প্রকাশের পরে মেজেঘষে বই করে বের করায় লেখাটি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও আত্ম-প্রত্যয়েরও প্রমাণ মেলে। কিন্তু আর তিনি ও জাতীয় কোনো প্রচারমূলক লেখা লেখেন নি। আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাই এর কারণ। বক্তব্যগত ভাবে বাল্মীকির জয়-এ লেখকের যে অভিপ্রায়, বঙ্কিমচন্দ্র তা গ্রহণ-যোগ্য মনে করেন নি। তিনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বাল্মীকি চরিত্র তিনটির। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা হরপ্রসাদ নির্দেশিত Physical, Intellectual, Moral ইত্যাদি Force-এর রূপকার্থ থেকে গভীরে যায়—এমন মনে করাও চলে। কিন্তু হরপ্রসাদের তত্ত্বগত অভিপ্রায় যে বঙ্কিমচন্দ্র অনুমোদন করলেন না, এটা নিশ্চয়ই হরপ্রসাদের পক্ষে স্বস্তিকর হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের এত কাছে থেকে তাঁর অনুমোদনের প্রশ্ন উপেক্ষা করা হরপ্রসাদের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে ভাষা ও কল্পনা-সামর্থ্য সম্পর্কে প্রশংসা পেয়েও হরপ্রসাদ ও জাতীয় তত্ত্বরূপকধর্মী লেখায় আর উৎসাহ বোধ করেন নি।

বাল্মীকির জয় উপন্যাস নয়, একে সাহিত্যের কোন শ্রেণীভুক্ত করা হবে স্থির করে উঠতে না পেরে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুক করে বলেছিলেন, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন'। রচনাটি এতাবৎ 'গদ্যকাব্য' নামে চলে আসছে, কিন্তু কবিত্বই এর শেষ কথা নয়, ভেতরে একটা রূপকার্থের অন্তঃসার খুব স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় পড়বার সময়ে। জাত-গোত্র যাই হোক, বাল্মীকির জয় পড়লে বোঝা যায়, বড়ো কোনো কল্পনাকে শিল্পরূপের অবয়বে ধরে দেবার জন্যে যে সমর্থ কলানৈপুণ্য প্রয়োজন হয়, হরপ্রসাদ সেই নিপুণতার অধিকারী ছিলেন। এই রচনাটিতেই প্রথম তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয় মেলে।

দুই

'বাল্মীকির জয়' প্রকাশের পরের বৎসর হরপ্রসাদ তত্ত্বরূপক ছেড়ে সরাসরি উপন্যাস লিখলেন—'কাঞ্চনমালা'। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে মাঘ পর্যন্ত 'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি

অস্বাভাবিক ব্যাপার: উপন্যাসটি বই হিশেবে বেরোয় পত্রিকায় প্রকাশের তেত্রিশ বৎসর পরে (১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১৯১৬ খৃ.)। এত দেরি কেন হল—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে। কাঞ্চনমালা-র ভূমিকায় হরপ্রসাদ লিখেছেন, '১২৮৯ সালে যখন ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন কাঞ্চনমালা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর নানা কারণে আমি অনেকদিন ধরিয়া বাঙ্গালা লিখি নাই; সুতরাং কাঞ্চনমালা প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। কেন, কি বৃত্তান্ত—সে অনেক কথা—বলিয়া কাজ নাই।' এই না বলা কথার কিছু আভাস পাওয়া যায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হরপ্রসাদের ভাষণে, 'আমার সঙ্গে তাঁহার দুই তিন বার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন কি তাহার জন্য আমাকে কিছুদিন বাঙ্গালা লেখা ছাড়িতেও হইয়াছিল। আর একবার অন্য কারণে একটু বিবাদ হওয়ায় আমি চার পাঁচ মাস বঙ্কিমবাবুর বাড়ী যাই নাই। এ কারণটা সাহিত্য-ঘটিত নহে, আমাদের দেশীয় কোনো ব্যাপার।' শেষ বাক্যটি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, আগের দু তিন বারের মতবিরোধ ছিল 'সাহিত্য-ঘটিত'।

হরপ্রসাদের ভাইপো, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য মশাই-এর কাছে আমি শুনেছি, কাঞ্চনমালা উপন্যাসে বর্ণিত কোনো কোনো প্রসঙ্গ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন। মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্যের উক্তি, 'জ্যাঠাবাবু আমাকে বলেছিলেন, তিষ্যরক্ষিতা কুণালের চোখ উপড়িয়ে এনে পা দিয়ে পিষ্ট করেছে এই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র খুব রেগে যান। বলেন, এরকম সব ভয়ানক ব্যাপার যদি লেখ তবে আমি তোমার বিরুদ্ধে যাব।'

আরো দুটি তথ্য: গণপতি সরকার তাঁর 'হরপ্রসাদ জীবনী'-তে কাঞ্চনমালা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই উপন্যাস বাহির হইলে স্বয়ং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বীই বা হরপ্রসাদ হইয়া পড়েন; এই চিন্তা তাঁহার আসিয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুমহলে এ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া রাজকুমারবাবু হরপ্রসাদকে উপন্যাস লিখিতে মানা করিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি এখন নাই লিখিলে you will survive him long, লেখার সময় তো ঢের পাবে, বন্ধুবিচ্ছেদ নাই বা করিলে।' (পৃ. ২৯)

গোপীনাথ কবিরাজ মন্তব্য করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইহার গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণবশতঃ অগ্রজ সঞ্জীববাবুর দ্বারা তিনি শান্তি-

মহাশয়কে এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন।....ইহার কিছু কিছু বিবরণ তাঁহার নিজের মুখে এবং কনিষ্ঠ সহোদর পূজ্যপাদ ৺মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম।....শাস্ত্রিমহাশয় বঙ্কিমবাবুর মনোগত ভাব অবগত হইয়া যারপরনাই নিরুৎসাহ হইলেন এবং ভগ্নহৃদয়ে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।' (বর্তমান সংকলনের ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদের 'সাহিত্য-ঘটিত' মতবিরোধ বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল এই সময়ে। ফলে হরপ্রসাদ সত্যিই বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকতে আর কোনো উপন্যাস লেখেন নি।

আমি মন্তব্য করেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি-প্রতিপত্তিময় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য হরপ্রসাদের সৃজনপ্রতিভা বিকাশের দিক থেকে অনুকূল হয় নি। বাল্মীকির জয় সম্পর্কে যা বলেছি তা নিশ্চয়ই আনুমানিক, কিন্তু কাঞ্চনমালা বিষয়ে তথ্যগুলি উপেক্ষা করার উপায় নেই। এবং বলতেই হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাঙলা কথাসাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখকের স্বাভাবিক আত্মবিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল।

'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসটিকে সব সমালোচকই কাঁচা লেখা বলেছেন। শাস্ত্রী-মশাই নিজেও মন্তব্য করতেন, 'ওসব ছেলেবেলার লেখা, তাই অত পণ্ডিতীতে ভর্ত্তি'।[১] এ সব মতামত সত্ত্বেও তখনকার বাঙলা কথা-সাহিত্যের রুচি-প্রকৃতির দিক থেকে বইটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরভাগে নতুন বাঙলা সাহিত্যের পাঠক সমাজকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাবৈভবময় রোমান্সগুলি। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, প্যারীচাঁদের লেখায় সমাজ-বাস্তবতার জমিতে ব্যক্তিমানুষের সমস্যা নিয়ে যথার্থ নভেল লেখার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, ইতিহাসের বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স সাময়িকভাবে সেই উদ্যোগকে আড়াল করে দিল। কৃষ্ণকান্তের উইল লেখার পরেও যে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ-আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম লিখলেন, এ থেকেই বোঝা যায় খাঁটি নভেলের আঙ্গিক তাঁকে টানতো না। সেকালের কথাসাহিত্য পাঠকের রুচি বঙ্কিমের প্রভাবে গঠিত হয়েছিল, তাই নতুন লেখকেরা পাঠক পাবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুবর্তন নিরাপদ মনে করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে অনেকগুলি ইতিহাস নির্ভর কাহিনী রচিত হয়েছিল এই সময়ে (সুকুমার সেন-এর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ,

১. বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের লেখা কাঞ্চনমালা-র মুখবন্ধ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, হরপ্রসাদ-রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার, ১৯৬০, পৃ ২৯৫।

পৃ. ২৩৬ দ্র.)। রমেশচন্দ্র দত্তেরও খ্যাতি 'সংসার' বা 'সমাজ'-এর জন্যে নয়, বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবনসন্ধ্যাই কথাসাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠার কারণ। বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদের কাঞ্চনমালা বেরোয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দে, ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে। তার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। বাঙলা কথাসাহিত্যের এই রুচিগত বাতাবরণে হরপ্রসাদ যে তাঁর প্রথম উপন্যাসের বিষয় ইতিহাস-কিংবদন্তি থেকেই নিলেন—এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তিনিও অন্যদের মতো প্রস্তুত পাঠক-রুচির সুযোগ নিতে চাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক অভিভাবকত্ব তিনি মনে-প্রাণে মানতেন, তাই প্রথম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার আদর্শ অনুসরণ তাঁর কিছু অগৌরবের মনে হয় নি। কিন্তু তৎসাময়িক রুচি ও রীতির পরিসীমার মধ্যে থেকেও হরপ্রসাদ তাঁর উদ্ভাবনাশক্তি এবং স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এই উপন্যাসে।

মধুসূদন থেকে আমাদের নাটকে-উপন্যাসে ফিরে ফিরে একই মোগল-রাজপুত যুগের ইতিহাস ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তার ওদিকের ইতিহাস আমাদের লেখকদের কাছে অন্ধকারময়। হরপ্রসাদ তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতায় নির্ভর করে কাঞ্চনমালা-য় দূরতর কালের পটভূমি ব্যবহার করলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রখ্যাত বই *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*-এর ভূমিকায় বইটির উপাদান সংগ্রহে তরুণ গবেষক হরপ্রসাদের শ্রম ও নিষ্ঠার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে। রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-সহায়কের কাজ করার সময় থেকে হরপ্রসাদ বৌদ্ধ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হন, এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। এই অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগালেন উপন্যাস রচনায়। বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে আজ থেকে বৌদ্ধধর্মই প্রচলিত হবে, ভারতের বাইরেও সদ্ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হবে—মহারাজ অশোকের এই ঘোষণায় 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস শেষ হয়েছে। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'এই দিবস যে কার্য্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এসিয়া এই দিনের কার্য্যবলে বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করে।' হরপ্রসাদ তাঁর উপন্যাসে ভারতে বৌদ্ধধর্ম পত্তনের কাল-পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করে আমাদের ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত সাহিত্যের গতানুগতিকতা কাটালেন। তাঁর কাহিনীর পটভূমিতে এল অশোকের সময়ের ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-বৌদ্ধ শক্তি সংঘাতের ইতিহাস। এ-বস্তু বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে নতুন সংযোজন। মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে রাজপুত-মারাঠিদের স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামের প্রসঙ্গ আমাদের ঐতিহাসিক নাটক-উপন্যাসের মামুলি বিষয় হয়ে উঠেছিল। এসব

লেখায় নবোদিত জাতীয়তাবাদের যে রূপকার্থ আভাসিত হত, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ। কোনো কোনো লেখার ভেতর থেকে সাম্প্রদায়িক বিরূপতার ঝাঁজ বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠতো। ভারতীয় বাস্তবতার স্বরূপ যথাযথভাবে বুঝবার অক্ষমতাই এ-ধরনের সংকীর্ণ মনোভাবের কারণ, এবং উত্তরকালীন ভারতীয় রাজনীতির গতিধারায় এর খেসারত দিতে হয়েছে বড়ো মর্মান্তিক ভাবে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ জাহির করার মতো কোনো বিষয় হরপ্রসাদ নির্বাচন করেন নি, এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। 'আমাদের ইতিহাস', 'হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়লে অনুভব করা যায়, বহু জাতি ও ধর্মে বিমিশ্রিত ভারতীয় জনসমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যায় তিনি সর্ববিধ সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকেছেন, বস্তুনিষ্ঠ শুদ্ধ ইতিহাস চেতনারই পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে অন্য লেখকেরা প্রধানত হিন্দু-মুসলমান শক্তি সংঘাতের পটভূমি ব্যবহার করেছেন, হরপ্রসাদ তাঁর দুটি উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন হিন্দু-বৌদ্ধ শক্তি সংঘাতের পটভূমি। সর্বত্রই এসেছে অতীতের জাতিগত ধর্মগত বৈরিতার প্রসঙ্গ। এ বৈরিতার ইতিহাস কে কী দৃষ্টিতে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন, তা থেকে লেখক বিশেষের মানসিক প্রগতিশীলতার পরিমাপ করা যায়। যখন কোনো কোনো লেখক 'মার মার যবন মার' ধ্বনির মহিমা কীর্তন করেছেন, সেই সময়ে হরপ্রসাদ বৌদ্ধ ত্রিরত্নে বিশ্বাসী কুণাল-কাঞ্চনমালার উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'বিধর্মী ব্রাহ্মণের যদি আশীর্বাদ গ্রাহ্য হয়, আশীর্বাদ করি, কৃতার্থ হইয়া জগৎকে কৃতকৃতার্থ কর।' হরপ্রসাদের হিঁদুয়ানির ঊর্ধ্বে ওঠার এই দৃষ্টান্ত সেকালের ধ্যান-ধারণার পরিসীমায় ব্যতিক্রম এবং বলতেই হবে, অনেক বেশি প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচায়ক।

তখনকার বাঙলা কথাসাহিত্যের পরিবেশে কুণাল-তিষ্যরক্ষিতার কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা হরপ্রসাদের মাথায় এসেছিল ভেবেও বিস্ময় লাগে। মহারাজ অশোকের ছেলে কুণাল। তিষ্যরক্ষিতা অশোকের মহিষী, কুণালের বিমাতা। তিষ্যরক্ষিতা কুণালের প্রেমে পড়েছিল, কুণালের ভুবনমোহন দুটি চোখ তাকে পাগল করেছিল। কিন্তু তিষ্যরক্ষিতার দুরন্ত বাসনা চরিতার্থ হবার উপায় ছিল না, বৌদ্ধ ত্রিরত্নে বিশ্বাসী কুণাল তার ডাকে কখনো সাড়া দেয় নি। কুণালের স্ত্রী কাঞ্চনমালা। এদের দুজনের নিখাত ভালোবাসা ও বৌদ্ধ জীবনাদর্শে আশ্রিত চারিত্রিক শালীনতায় বাধা পেয়ে তিষ্যরক্ষিতা ক্রমে হিংস্র হয়ে ওঠে। নির্জন কেলিগৃহে কুণালকে প্রলুব্ধ করার আয়োজন ব্যর্থ হলে, 'বহুক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষার চৈতন্য হইল। সে ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীব্র দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া বলিল, যদি ওই চোখ—পরে মাটিতে পা ঘষিয়া বলিল, যদি ওই চোখ—একদিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি তিষ্যরক্ষা।' (সপ্তম পরিচ্ছেদ)। অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতিপত্তি কিছু কম ছিল না। তারা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে তুলত। তিষ্যরক্ষিতা একদিকে গোপনে এই বিদ্রোহী হিন্দুদের সঙ্গে যোগ রেখে চলে, অন্যদিকে অশোকের একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠবার চেষ্টা করে। তিষ্যরক্ষিতার প্ররোচনাতে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে কুণাল সে বিদ্রোহ দমন করতে যায়। এই সময়ে অশোক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তিষ্যরক্ষিতা অক্লান্ত সেবায় অশোককে সুস্থ করে তুলল, প্রতিদানে সাময়িক ভাবে রাজ্য শাসনের অধিকার পেল। তিষ্যরক্ষিতার আদেশে কুণাল বন্দী হল এবং তার চোখ দুটি উপড়িয়ে আনিয়ে পা দিয়ে পিষ্ট করে তিষ্যরক্ষিতা ব্যর্থ কামনাজাত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল। বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকান্তের উইলের যুগে হরপ্রসাদ বিকৃত সংরাগের এই ভয়ানক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছিলেন—এও আশ্চর্য! এ রকম একটি গল্প, বিশেষত তিষ্যরক্ষিতার মতো জটিল চরিত্রের গূঢ়ৈষা রূপ দেবার সঙ্গত পদ্ধতি 'মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে' নেমে যাওয়া, 'যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে'। 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো'-র আধুনিক আঙ্গিক তখনো বাঙলা উপন্যাসে আসে নি, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-র প্রকাশ শুরু হয়েছিল নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে, কাঞ্চনমালা প্রকাশের প্রায় নয় বৎসর পরে। তবুও রবীন্দ্রনাথ যাকে চোখের বালির ভূমিকায় 'নির্মম সাহিত্য' বলেছেন, বাঙলায় তার সূচনা 'কাঞ্চনমালা' থেকে।

কাঞ্চনমালায় গল্প বলা হয়েছে বঙ্কিমী রীতিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই হরপ্রসাদ একটি পূর্বপরিকল্পনা অনুসরণ করে কাহিনী বিন্যাস করেছেন। উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা চোদ্দটি, একে ছেষট্টিটি উপপরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। কোথাও কোথাও উপপরিচ্ছেদ মাত্র তিন চারটি বাক্যে গঠিত। ক্ষিপ্রগতিতে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আনুষঙ্গিক সংবাদ খুব সংক্ষেপে জানানো এবং গল্পের প্রবাহ শাখান্বিত বিস্তার যাতে না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এ-উপন্যাসে হরপ্রসাদের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের সংযত-সংহত কায়ার এই আদর্শ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। চরিত্রের মনের জগতের স্পন্দন ফোটানোয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সুমতি-কুমতির

স্পন্দন রেখেছেন। চরিত্রের ভাবনা বিশ্লেষণের বদলে ঘটনার ও নাটকীয় পরিস্থিতির চাপে চরিত্রের স্বরূপ ফোটানো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বহু ব্যবহৃত আঙ্গিক, কাঞ্চনমালায় এই আঙ্গিকই ব্যবহার করা হয়েছে। অশ্লথ, ত্বরিতগতি ঘটনার টানের ভেতরে চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় হরপ্রসাদ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে কথাসাহিত্যিক হিশেবে তাঁর নিশ্চিত সামর্থ্যের প্রমাণ মেলে। তিষ্যরক্ষিতার কুটিল-গতি গূঢ়েষার বিবরণ পড়তে আজও কোথাও কোথাও বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়। বৃদ্ধ অশোকের শিথিল ও অদূরদর্শী প্রশাসনের এবং সেকালের সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধ বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে সে এক প্রলয় ঘটিয়েছে। এমন একটি মেয়ের পক্ষে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে যাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। তিষ্যরক্ষিতার পাশে কাঞ্চনমালাকে মনে হবে বড়ো বেশি আদর্শায়িত চরিত্র। কিন্তু কুণালের শালীন ব্যক্তিত্ব হরপ্রসাদ চমৎকার ফুটিয়েছেন। ছোট চরিত্রের মধ্যে কুঞ্জরকর্ণ ব্যক্তিত্বের জোরে মনে স্থায়ী দাগ কেটে যায়। অবশ্য উপন্যাসের শেষে চণ্ডালের চোখ কুণালের চক্ষু কোটরে বসিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফেরানো বা কাঞ্চনমালার প্রভাবে উন্মাদ তিষ্যরক্ষিতার শাক্যভিক্ষুণী হয়ে যাওয়া বা সত্যকথা বলায় চণ্ডালের দৃষ্টি ফিরে পাওয়া অস্বাভাবিক লাগে।

'কাঞ্চনমালা'-র ভাষা সম্পর্কে অনেকেই অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। এমন কি লেখকের পুত্র বিনয়তোষও বলেছেন, এ ভাষা হরপ্রসাদের বলে চেনাই যায় না। উপন্যাসের ভাষাই উপন্যাসের বিষয়াধার। বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উপন্যাসের ভাষা নিয়ে আলোচনার কোনো মানে হয় না। 'কাঞ্চনমালা' ও 'বেণের মেয়ে'-র ভাষাশৈলী এক নয়, কিন্তু একের তুলনায় অপরটির ভাষার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো উপন্যাস সমালোচনার রীতিবিরুদ্ধ। দেখা উচিত, বিশেষ উপন্যাসের বিষয় যথাযথভাবে তার ভাষায় আধারিত হয়েছে কিনা। অশোকের-কুণালের-তিষ্যরক্ষিতার জগৎ এবং ঐ কাহিনীর ভয়াবহ সংরাগ ও গূঢ়েষা ঠিক দৈনন্দিনতার স্তরের বিষয় নয়। কাঞ্চনমালা-য় ভাষাকে তাই উঁচু সুরে বাঁধতে হয়েছে, বিষয়ের প্রয়োজনে সাধারণ স্তর থেকে উন্নীত ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। উঁচু সুরে বাঁধা বলেই এ ভাষাকে কৃত্রিম মনে করার কারণ দেখিনা। 'কাঞ্চনমালা' লেখার আগে বঙ্গদর্শন ও আর্যদর্শন পত্রিকায় হরপ্রসাদ উনত্রিশটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই প্রবন্ধগুলি পড়লে অনুভব করা যায়, ততদিনে প্রবন্ধ-নিবন্ধের গদ্যে তাঁর অনন্য শৈলীটি গড়ে উঠেছিল। ইচ্ছে করলে তিনি খাঁটি লৌকিক উপাদানে গড়া কথাগদ্যের ভাষাশৈলীও উদ্ভাবন করতে পারতেন নিশ্চয়। তা করেন নি। উপন্যাসটির বিষয়গত বাতাবরণের জন্যেই তাকে

ভিন্ন ভাষা-শৈলী ব্যবহার করতে হয়েছিল। ভাষার ছাঁদ সম্পর্কে এই বিবেচনায় তাঁর শিল্পীজনোচিত বোধেরই পরিচয় মেলে। এ-ভাষা কতটা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবিত, সেটা বড়ো বিবেচ্য বিষয় নয়। দেখা উচিত, উপন্যাসের যা বিষয়, ব্যবহৃত ভাষায় তার উপযুক্ত আধার তৈরি হয়েছে কিনা। হয়নি বলা চলতো, যদি এর অন্তর্গত মানবিক জগৎ পাঠকের মনে সঞ্চারিত না হতো, যদি পদে পদে আয়াসের চিহ্ন চোখে পড়তো। তা হয় না। আজও এ লেখা একটানা পড়ে যাওয়া যায় এবং অশোকের যুগের পাটলিপুত্র-তক্ষশিলার বাতাবরণ পাঠকের মনে প্রত্যয়সিদ্ধভাবে সঞ্চারিত হয়। আবার সর্বত্রই তিনি যে উন্নীত ভাষা ব্যবহার করেছেন, তাও নয়। বিশেষ পরিস্থিতির বাস্তবতা ফোটাবার জন্যে, সংলাপে ক্ষিপ্রতা আনার জন্যে হরপ্রসাদ উপন্যাসটির বহু জায়গায় জমকালো ভাষা পরিহার করেছেন। এটাই স্বাভাবিক। উপন্যাসের মতো শিল্পসৃষ্টিতে যে বড়ো জগৎ রচনা করে তুলতে হয়, তার মধ্যে নানা স্তরান্বিত অসমতা থাকা অনিবার্য। ভাবাবেগের উচ্চাবচতা, সংঘটনার প্রকৃতি, চরিত্রের ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ভাষা রীতিকে প্রভাবিত করে। এক উপন্যাসের মধ্যেই তাই ভাষা রীতির বৈচিত্র্য ও অসমতা এসে পড়ে, যেমন ঘটেছে কাঞ্চনমালায়।

'কাঞ্চনমালা' বাঙলার একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, কিন্তু নিশ্চয়ই একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। আজও এ-উপন্যাস পড়লে মনে হবে, এটি একজন সমর্থ লেখকের পরীক্ষামূলক লেখা। এ-লেখায় হরপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা এবং কলানৈপুণ্যের আভাস সচেতন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। উপন্যাস শিল্পে তাঁর আত্মবিকাশের পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়েছে। এই ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিকাশধারা সম্পর্কে তাই কিছু বলবার উপায় নেই এবং ছত্রিশ বছর ডিঙিয়ে পাই তাঁর দ্বিতীয়, শেষ ও শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস 'বেণের মেয়ে'।

তিন

চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'বেণের মেয়ে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১৩২৬-এর অগ্রহায়ণ অবধি। ১৩২৬-এই, অর্থাৎ ১৯২০ খৃস্টাব্দে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কাঞ্চনমালা' এবং 'বেণের মেয়ে' রচনার মধ্যবর্তী কালে বাঙলা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র-তারকনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের সব লেখা তো বটেই, রবীন্দ্রনাথেরও চোখের বালি (১৯০৩)-নৌকাডুবি (১৯০৬)-গোরা (১৯১০)-ঘরে বাইরে (১৯১৬)-চতুরঙ্গ (১৯১৬) প্রকাশিত হয়ে গেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্রের বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯২০-র মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ধারাটি অবসিত হয়ে গেছে ততদিনে, বাঙলা কথাসাহিত্যে এসে গেছে প্রকৃত নভেলের যুগ। এ সময়ে দূর কালের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে উপন্যাস লেখার রেওয়াজ আর ছিল না। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরাবৃত্তের গবেষণায় রাখালদাস হরপ্রসাদকে গুরু মানতেন, তাঁর মানসিকতা ও দৃকভঙ্গিতে হরপ্রসাদের প্রভাব ছিল গভীর। হরপ্রসাদের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশিত রাখালদাসের বহু সমাদৃত বই 'পাষাণের কথা' (১৯১৪) পাষাণের জবানিতে ভারহুত স্তূপের কাহিনী। 'পাষাণের কথা' উপন্যাস নয়। তিনি উপন্যাসের আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন দশটি রচনায়, তার মধ্যে চারটির বিষয়বস্তু সংগ্রহে হরপ্রসাদের ইঙ্গিত অনুসরণ করেছিলেন মনে করা যায়। মোগল-রাজপুত ইতিহাসের বাইরে থেকে বিষয় নিয়ে রাখালদাস 'শশাঙ্ক' (১৯১৪), 'করুণা' (১৯১৭), 'ধ্রুবা' (১৯২১) ও 'ধর্মপাল' (১৯১৫) লেখেন। শশাঙ্ক, করুণায় ও ধ্রুবায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের এবং ধর্মপাল-এ পালরাজত্বের গৌরবের দিনের পটভূমি নিয়েছেন। কিন্তু সেও রাজবৃত্তেরই ইতিহাস, যেমন পাই বঙ্কিমচন্দ্রের বা রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে। রাখালদাস ঔপন্যাসিক হিশেবে খুব ব্যাপক বা স্থায়ী পাঠক পান নি। হরপ্রসাদ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটির বিষয়ের জন্যে হাজার বছরের পুরানো বাঙলায় ফিরে গেলেন। এদিক থেকে সমসাময়িক কথা সাহিত্যের আবহাওয়ায় হরপ্রসাদের বেণের মেয়ে-কেও একটি ব্যতিক্রম মনে করা যায়। 'কাঞ্চনমালা' শেষ করেছিলেন মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার বর্ণনায়, বেণের মেয়ে-তে ধরলেন বৌদ্ধপ্রভাবের অন্তিমতম কাল; দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে লেখা হলেও উপন্যাস দুটির মধ্যে বিষয়গত যোগসূত্র আছে।

বেণের মেয়ে-তে হরপ্রসাদ সমকালীন কথাসাহিত্যের প্রবণতা উপেক্ষা করে দূর কালের ইতিহাসে ফিরে গেলেন, কিন্তু বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুসরণ করলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক বিষয় বলতে বুঝতেন দেশের রাজবৃত্তের কাহিনী। প্রশাসন কর্তৃত্বের শীর্ষতম পুরুষেরাই তাঁদের উপন্যাসের প্রধান পুরুষ। তাঁদের দৃষ্টি বিশেষ বিশেষ কালখণ্ডের আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের কার্যকারণ সন্ধান করেছে।

রাজকীয় পরিবেশের জমকালো বিবরণ এবং বীরত্বময় যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণে তাঁরা উপন্যাসের পরিসর ভরাট করেছেন। সেসব যুগের সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার শোভাযাত্রার আড়াল থেকে দু-এক জায়গায় আভাসিত হয়েছে মাত্র, কখনো প্রাধান্য পায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে হরপ্রসাদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'তিনি বড় বড় জিনিসগুলিই দেখিতেন; ভাল ও বড় জিনিসগুলিই দেখিতে চাহিতেন, বাছিয়া লইতেন। তাই তাঁহার বইয়ে দুঃখী গরীবের স্থান নাই; যাহারা খেটে খায় তাহাদের স্থান নাই। তাঁহার সকল নায়ক-নায়িকাই বড়মানুষ। অভাবের তাড়নায় ক্লেশ পায় না।'[২] হরপ্রসাদের দৃষ্টি এর বিপরীত। তিনি ইতিহাস বলতে বুঝতেন জনসমাজের ইতিহাস। হাজার বছরের পুরানো বাঙালি জীবনের সর্বায়তনিক রূপ প্রতিফলিত করার উপযোগী একটা কাহিনীর কাঠামো তৈরি করলেন বেণের মেয়ে উপন্যাসে। সাতগাঁ-এর বৌদ্ধ রাজা রূপা বাগদীর রাজ্য লোপ ও হিন্দু রাজা হরি বর্মার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা—বাইরের দিক থেকে তৎসাময়িক রাজকীয় কর্তৃত্ব বদলের উচ্চতর রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু রাজকীয় কর্তৃত্ব বদল উপন্যাসটিতে গৌণ বিষয়। প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মূলে যে সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্ব কাজ করছিল, সেই দ্বন্দ্বময় সমাজ-জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপটি বুনে তোলাই ছিল হরপ্রসাদের লক্ষ্য। আমাদের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে তুলনা করে পড়লে 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদ বুঝেছিলেন, বিশেষ কোনো রাজা বা তাঁর রাজসভায় ও যুদ্ধ জয়ের কাহিনীতে দেশের মানুষের জীবনের রূপ ধরা যায় না। ধরতে হলে সেই কালের সমাজ বিন্যাসের রূপটিই ধারণায় আনতে হবে। বুঝতে হবে দেশের ধনসম্বল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে ভাঙছে গড়ছে। ধন সম্বলের উপরে কর্তৃত্ব কোন্ শ্রেণীর মানুষের হাতে এবং তারা কীভাবে সামাজিক জীবনের নিম্নতম ধাপ থেকে উচ্চতম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের স্তর অবধি নিয়ন্ত্রণ করছে। বাঙলার বা ভারতের পুরাতন সমাজ কাঠামোয় দেশের ধনসম্বল উৎপাদনের দিক থেকে জনজীবনের বিভিন্ন উপবিভাগ বৃত্তিগত 'জাতি' রূপে চিহ্নিত ছিল। তাই জনবৃত্তের পটভূমি রূপায়ণে সঙ্গতভাবে হরপ্রসাদ বৃত্তিগত জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বুনট উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিফলিত করেছেন। সামাজিক স্তরগুলি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণে পরিস্ফুট করেছেন। সামাজিক শক্তির টানাপোড়েনে ইতিহাসের গতি ও বাঁক ফেরার

২. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৫৩।

তাৎপর্য বোঝার এমন বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে শিল্পরূপের বাস্তবতায় প্রমূর্ত করার এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে বিরল।

আধুনিক কালে রাষ্ট্রের প্রভাব যেমন জনজীবনে ওতপ্রোত, সর্বত্র অনুভূত, আমাদের দেশে পুরানো কালে রাজশক্তির প্রভাব কখনোই তেমন ছিল না। জনজীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি ছিল 'সমাজ'। জনজীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ধর্ম-কর্ম, দৈনন্দিন আচারবিধি, বৃত্তিগত জাতিগুলির মান মর্যাদার স্তরানুক্রম—সর্বত্র 'সমাজ'-এর শাসন অনুভূত হত। এই শাসন প্রয়োগ করবার ক্ষমতা যারা দেশের ধনসম্বলের কর্তৃ-শ্রেণীর সমর্থন পেত সেই শ্রেণীর (জাতির) মানুষের হাতে থাকত। ধন-সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধির উপায় ছিল তিনটি : কৃষি,, শিল্প, বাণিজ্য। বেণের মেয়ে-তে হরপ্রসাদ বণিক শ্রেণীকেই প্রধান সামাজিক শক্তি দেখিয়েছেন।[৩] বণিকদের সমর্থন-অসমর্থনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তির উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম উপপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'বিহারীর ধর্ম্ম কি ছিল, তাহা ঠিক বুঝান যায় না। শুধু বিহারী কেন? সেকালের বেণেদের যে কি ঠিক ধর্ম্ম ছিল, বলা যায় না। তাহারা ব্রাহ্মণ দিয়া দশকর্ম্মও করাইত, আবার বুদ্ধের মন্দিরে ধূপ-ধূনাও দিত। তাহারা ব্রাহ্মণ আসিলে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া পায়ের ধুলা লইত; বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী আসিলেও তাহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিত। দুই ধর্ম্মের লোককেই তাহারা যথেষ্ট দান করিত।' উপন্যাসের শুরুতে জনসমাজের যে চেহারা ফোটানো হয়েছে সেই সমাজে বৌদ্ধ ও হিন্দু রীতিনীতি মিশ্রিত ভাবে প্রচলিত। উপন্যাসের ঘটনাকালের বৃত্তের

৩. ১০০০ খৃস্টাব্দের বাঙলার সমাজে বণিকদের এত প্রতিপত্তি সত্যিই ছিল কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "অষ্টম শতক হইতে সমাজ অধিকতর কৃষি-নির্ভর এবং উত্তরোত্তর এই নির্ভরতা বাড়িয়াই গিয়াছে; শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় আর থাকে নাই এবং সেই জন্যই রাষ্ট্রে ও সমাজে ইঁহাদের প্রাধান্যও আর থাকে নাই; ব্যক্তি হিসাবে কাহারও কাহারও মর্যাদা স্বীকৃত হইলেও শ্রেণী হিসাবে সপ্তম শতকপূর্ব মর্যাদা আর তাঁহারা ফিরিয়া পান নাই।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩৪২)। নীহাররঞ্জন নিজের এই অভিমতকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক অনুমান'। সপ্তগ্রাম একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, সপ্তগ্রাম কেন্দ্রিত কাহিনীতে হরপ্রসাদ বণিক বিহারী দত্ত-র পরিবারটিকে যে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছেন তা অবাস্তব মনে হয় না। আর ঐতিহাসিক তথ্যের যথাযথতা আমাদের বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য হরপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের বাস্তবতা বুঝবার আগ্রহ।

মধ্যেই বৌদ্ধ-হিন্দু সংঘর্ষ এবং হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বণিক শ্রেণী এবং বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় পুরুষ বিহারী দত্ত। বিহারীর বিধবা মেয়ে মায়াকে বৌদ্ধরা নিজেদের দলে টানতে চেষ্টা করায় বিরক্ত বিহারী শ্রীধরের কাছে দূত পাঠাল 'চতুর্বর্ণের মধ্যে তাদের স্থান কোথায়'— জানতে চেয়ে। এই সূত্রে হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার ভবদেব ভট্টকে হরপ্রসাদ উপন্যাসের ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা দিয়েছেন।[৪] 'বেণের মেয়ে' অর্থাৎ গন্ধবণিক বিহারী দত্তর মেয়ে মায়াকে নিয়ে সপ্তগ্রামে যে হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের সূচনা হল,—তা ক্রমেই ছড়িয়ে গেল অনেক ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে। বৌদ্ধ রাজার পরিবর্তে হিন্দু রাজা, বৌদ্ধ গুরুর পরিবর্তে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃত্বে এল। এই পরিবর্তনের দূর প্রসারিত ফলাফল হরপ্রসাদের উপন্যাসের বিষয়। তিনি গোটা জনসমাজের পুনর্বিন্যাস বর্ণনায় তাই অনেকটা পরিসর (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) ব্যয় করেছেন। ভবদেবের পরামর্শে হিন্দু রাজা হরিবর্মদেব নানা বৃত্তির মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত করে দিচ্ছেন, বৌদ্ধ আমলে যেসব কারুজীবী-শিল্পজীবী গোষ্ঠী সমাজে সম্মানিত ছিল, তাদের অবনমিত করা হচ্ছে,—পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে হরপ্রসাদ এই সমাজ বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করলেই বোঝা যাবে তাঁর সমাজবাস্তবতা বোধ কতো তীক্ষ্ণ ছিল, সেকালের বাঙলার লোকজীবনের বাস্তব সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কতো গভীরে গিয়েছিল।

যেমন ভবদেব বলেছেন, 'সব কাপড়েই ভাতের মাড়। নীচ জাতির এঁটো ছুঁয়ে অশুচি হইতে হয়। তাই আমরা রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের গ্রামে জাত-তাঁতি বসাইয়া কাপড়ে খই-এর মাড় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।...এখন ত হিন্দুর দেশ হইল। এখন এই কাপড়ের যাহাতে দেশে চলন হয়, তাহাই করিতে হইবে।' মহারাজ হরিবর্মদেবের উত্তর, 'যাহারা যুগীর কাপড় পরিয়া জল আনিবে, তাহাদের জল আপনারা লইবেন না বা স্পর্শ করিবেন না, তাহাতেই তাঁতিদের কাপড় চলিয়া যাইবে।' ভবদেবের উক্তি, 'এখানে ঘানির মুখে চামড়া দেওয়া থাকে, চামড়ার ঠোঙ্গা বাহিয়া তেল একটি কলসীতে পড়ে। চামড়ার স্পর্শে সে তেল অশুচি হয়। সে তেল কিছুতেই মাখা উচিত নয়। আমরা ব্রাহ্মণের

৪. পরবর্তী গবেষণায় হরিবর্মা ১১০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রমাণিত হয়েছে। বেণের মেয়ে ১০০০ খৃস্টাব্দের কাহিনী। এ উপন্যাসে হরিবর্মার উল্লেখে কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে স্বীকার করতে হয়। অবশ্য এতে উপন্যাস হিশেবে বেণের মেয়ের মূল্য কমেনা।—বর্তমান সংকলনের ২৪৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার-এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

গ্রামে বন্দোবস্ত করিয়াছি, একটা কাঠের কেট্‌কোর ঠিক মাঝখানে ছিদ্র করিয়া ঘানিটি তাহাতে খুব আঁট করিয়া বসান হয়। ঘানি বাহিয়া তেল কেট্‌কোয় পড়ে ; কেট্‌কো ভরিয়া গেলে, নারিকেলের মালা করিয়া তেল একটি কলসীতে তুলিয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপে পবিত্রভাবে তেল তৈয়ারী করিবে, আমরা তাহাদেরই জল আচরণ করিব। চর্ম্ম-তৈলের ব্যবহার এইরূপে কমিয়া যাইবে।'

এইভাবে বাঙালির জীবনের এক ক্রান্তিকালে সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে যাবার, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদার ওঠা-নামার ইতিহাস উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বৃত্তি-গত জাতি ব্যবস্থার যে-নতুন কাঠামো গড়ে তোলা হল, তার অনুক্রম নির্দিষ্ট ভাবে বেঁধে দেবার জন্যে এক ধরনের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল—তা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। সামাজিক ইতিহাসের তথ্যের অন্তর্গত কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের এইসব দৃষ্টান্ত হরপ্রসাদের সমাজ বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ।

বিহারী দত্তর মেয়ে মায়া এ-উপন্যাসের নায়িকা, তাকে লক্ষ করে উপন্যাসের নাম রাখা হয়েছে 'বেণের মেয়ে'। কিন্তু মায়া কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি চরিত্র গোটা উপন্যাসে বড়ো হয়ে ওঠে নি, বড়ো হয়ে উঠেছে একটি ঐতিহাসিক কাল ও সেই কাল খণ্ডের বাঙালির জীবনের বাস্তবতা। বইটির মুখপাতে হরপ্রসাদ বলেছেন, 'বেণের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়।' সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী ব'লেছেন, 'লেখক ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নাই, আমরাও নাই বলিলাম। তবে ইহাকে এক হিসাবে সামাজিক উপন্যাস বলিতে ক্ষতি দেখি না।' (বাংলার লেখক)। বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে সূচনা কাল থেকে আমরা রাজবৃত্তের কাহিনী, রাষ্ট্রের উচ্চতম অধিনায়কদের উত্থান পতনের কাহিনী ব্যবহৃত হতে দেখেছি। সেই সংস্কার থেকেই 'বেণের মেয়ে'-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলায় এ-দ্বিধার জন্ম। কিন্তু জনজীবনের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস, জনজীবনের গতি-প্রকৃতির হিশেব বাদ দিয়ে কোনো কালের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। 'সিংহাসন নিয়ে হানাহানির 'রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায় এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।' (ভারতবর্ষের ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথ)। ইতিহাস বিষয়ে এই সঙ্গত বোধ নিয়ে যদি ঐতিহাসিক

উপন্যাসের সংজ্ঞা সংশোধন করা যায় তাহলে 'বেণের মেয়ে'-কেই বলতে হয় প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বস্তুত হরপ্রসাদ বাঙলায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিন্ন আদর্শ আনলেন, তথ্য বয়নের কলারীতিও পূর্ণত তাঁর নিজস্ব। কল্পনার সাহায্য তাঁকেও নিতে হয়েছে, কিন্তু এ-কল্পনা বর্ণচ্ছটাময় বা আকাশ বিহারী নয়। তথ্যের বুনট বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে উদ্ভাবিত পরিপূরক তথ্যগুলি যদি ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণে সমর্থিত নাও হয়, তবুও আইনের জগতে যাকে বলা হয় circumstantial evidence, সেই আনুষঙ্গিক প্রমাণের মর্যাদা তাকে দিতেই হয়।

হরপ্রসাদ 'বেণের মেয়ে'-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করেন নি, বলেছেন, 'বেণের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙ্গালার সব ছিল।' এ-কালের 'গণিকাতন্ত্রের' উপন্যাসের পাঠকদের হাতে তিনি সেকালের 'সহজিয়াতন্ত্রের' উপন্যাস তুলে দিয়েছেন মুখ বদলাবার জন্যে। 'গণিকাতন্ত্রের' কথাটিতে এ-কালের উপন্যাস সম্পর্কে একটা খোঁচা আছে, যা বোধ হয় হরপ্রসাদের বিরূপতাই প্রকাশ করছে। তবুও হরপ্রসাদ মূলত তাঁর সমকালীন উপন্যাসের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে যে কালে, তখনকার কোনো সচেতন কথাসাহিত্যিকের পক্ষে আর বঙ্কিমী আদর্শে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এমন কি ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখলেও নয়। ততদিনে উপন্যাস বলতে সমাজ বাস্তবতার টানাপোড়েনে সামাজিক মানুষের জীবন ও মূল্যবোধের ভাঙাগড়ার কাহিনীই আমরা বুঝতে শিখেছি। দূর কালের উপাদান ব্যবহার করলেও রোমান্সের জগৎ, উধাও কল্পনার অবাধ বিহার ক্ষেত্র রচনার পরিবর্তে হরপ্রসাদ সেকালের গদ্যময় বাস্তবতাকে উপন্যাসের আধেয় করে তোলেন। অস্ত সূর্যের আলোয় দ্রুত ধাবমান কোনো অশ্বারোহীর বর্ণনায় বা কোনো রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যের জাঁকজমক বর্ণনায় 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের সূচনা হয় নি। বেণের মেয়ের সূচনায় আছে তারাপুকুরে মাছ ধরার বিবরণ। এটা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। লেখাটি এ-ভাবে শুরু করার পেছনে সুস্থির ভাবনা ছিল। রচনার বস্তুগত উপাদান কী হবে, জীবনের কোন রূপকে ধরবেন, তা সতর্ক ভাবে ছকে নিয়ে তিনি এ-ভাবে শুরু করেছেন। শুরুতেই তাঁর বাস্তব জীবনাগ্রহের অসংশয়িত প্রমাণ প্রতিভাত হল, যদিও এ-বাস্তব সমসাময়িক নয়, সুদূর ও ধূসর এক ইতিহাসের বাস্তব। ফলে কাঞ্চনমালার

স্টাইল পরিত্যাগ করতে হয়েছে, সৃষ্টি হয়ে উঠেছে গল্প বলার, পটভূমি রচনার এক ক্ষিপ্রতাহীন মন্থর রীতি, পাতি পাতি করে দেখানোর রীতি।

বেণের মেয়ে উপন্যাসের ভাষার চাল যে কাঞ্চনমালার ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হল, সেও এই উপন্যাসের আধেয় বস্তুর উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম গড়ার তাগিদে। লেখকের বাস্তব জীবনাগ্রহ ভাষারীতি বদলের মূলে কাজ করেছে। যথার্থ উপন্যাস মাত্রেই মানব অস্তিত্বের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ, সেই জগৎটিকে বাস্তবিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা ঔপন্যাসিকের প্রাথমিক শৈল্পিক দায়িত্ব। ভাষা-রচিত আধারে সেই জগৎটিকে ধরে দেবার দায়িত্ব নিষ্পন্ন করার জন্যে বিশেষ উপন্যাসের বিষয়ানুগ ভাষাগত উপাদান আহরণ ও উদ্ভাবন করতে হয়, সঙ্গত শৈলী উদ্ভাবন করতে হয়। উপন্যাসের জগৎ স্বয়ংসত্তাবান এক প্রত্যক্ষ জগৎ, বিমূর্ত যুক্তিতর্কের জগৎ নয়। উপন্যাসে ভাষার গড়ন বা form তাই discursive from নয়, উপন্যাসের ভাষার অন্তর্গঠনে যৌক্তিক পারম্পর্য থাকে না। উপন্যাসের ভাষা ধারণ করে রাখে লেখকের আন্তর-অভিজ্ঞতার এক অখণ্ড জগৎসত্তা। ভাষায় এই জগৎসত্তা 'নিরূপিত', প্রত্যক্ষ হয়ে প্রকাশ পায়। এই কারণে প্রবন্ধের ভাষা আর উপন্যাসের ভাষা, একই লেখকের হলেও, এক হয় না। হরপ্রসাদের ক্ষেত্রেও হয় নি। প্রবন্ধের ও উপন্যাসের ভাষার গড়ন ও মৌল উপাদানগত প্রভেদ গুলিয়ে ফেললে উপন্যাসের শিল্পরূপ সংক্রান্ত বিচারে বিভ্রম দেখা দেওয়া অনিবার্য। হরপ্রসাদ প্রাবন্ধিক হিশেবে যে-ভাষা ব্যবহার করেছেন, তাতে লৌকিক উপাদান আছে, সুদক্ষ কথক সুলভ কৌতুক-পরিহাস ও গভীর প্রজ্ঞার মিশ্রণ আছে সে-ভাষায়। কিন্তু সে-ভাষা মূলত যুক্তিরই ভাষা, বিচার-বিশ্লেষণের ভাষা, analytical। অন্যপক্ষে, বেণের মেয়ে উপন্যাসে তিনি যে-ভাষা-রচিত objective correlative সৃষ্টি করেছেন তাতেও নিশ্চয় লৌকিক উপাদান আছে, ধী-শক্তির দ্যুতি আছে,—কিন্তু এ-ভাষার চাল আলাদা। এ-ভাষার texture বা জমিন তৈরির জন্যে হরপ্রসাদ হাজার বছরের পুরানো বাঙলার লোক সমাজে প্রচলিত জিনিশপত্রের, যন্ত্রপাতির, যানবাহনের, ব্যবসা বাণিজ্যের, দৈনন্দিন জীবনের রীতিনীতির ব্যবহারিক নাম ও তার সঙ্গে জড়িত আনুষঙ্গিক অজস্র শব্দ ব্যবহার করেছেন। করতেই হবে, কারণ ঐ পুরানো সমাজের জীবনযাত্রার বাতাবরণটি তৈরি করে তুলতে না পারলে এ-উপন্যাস দাঁড়ায় না। সে-কালের কোনো আচার-অনুষ্ঠানের কথা, কোনো জিনিশের নাম, কোনো গ্রন্থের উল্লেখ এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় সূচক দু-চার ছত্র লিখে যেতেও হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ-ভাষায় প্রবন্ধের ভাষার অনুরূপ যৌক্তিক কাঠামো

আসে নি, বিবরণের ভেতর দিয়ে একটি জগৎ রচনা করে তোলার, একটি মানব-জগৎ প্রকাশনই এ-ভাষার মূল ধর্ম। এ-ভাষার গড়নকে, form কে বলা যায় expressive form, প্রকাশনধর্মী, কখনোই discursive form নয়। যথাযথ ভাবে প্রকাশনের জন্যে তিনি ত্বরাহীন, শ্লথগতি বিবরণের রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি ঐতিহাসিক কাল-পর্বের লোক সমাজের জীবন যাত্রার সমস্ত স্তর উপন্যাসের পরিধির মধ্যে রূপায়ণ তাঁর উদ্দেশ্য। বিরাট ক্যানভাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনায় ভরে তুলতে হবে। ভাষার চালটি সেই অভিপ্রায়ের দিক থেকে সঙ্গত ভাবে ধীর মন্থর। এ-রকম বিষয় রূপায়ণের জন্যে ঠিক এই জাতীয় মন্থর, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাত্মক একটি ভাষা ভঙ্গিই প্রয়োজন ছিল। কাঞ্চনমালার মতো উঁচু সুরে বাঁধা, নাট্যগুণপুষ্ট ভাষায় এ-উপন্যাস লেখা আদৌ সম্ভব ছিল না। বিষয়ানুগ ভাষাশৈলী সৃষ্টির এ-ক্ষমতা হরপ্রসাদের সৃজনপ্রতিভার এবং শিল্প-চেতনারই প্রমাণ।

সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী রূপা রাজার বিহার প্রতিষ্ঠার উৎসবের, লুই-সিদ্ধার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার বর্ণনায় উপন্যাসের শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান আক্রমণের সূচনায়। এই ফ্রেমের মধ্যে হরপ্রসাদ যে-কাহিনী বুনেছেন তার ব্যাপ্তি বিরাট। তৎসাময়িক বাঙলার এবং বাঙালার বাইরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জগতের অনেক ঐতিহাসিক পুরুষকে তিনি কাহিনীর মধ্যে এনেছেন। কেন্দ্রীয় গল্পের সঙ্গে, অর্থাৎ বিহারী দত্ত ও মায়ার জীবনের সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগেই এ-সব ঐতিহাসিক চরিত্র আনা হয়েছে উপন্যাসে। এ-জাতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোনো ব্যক্তি চরিত্র বড়ো হয়ে ওঠার কথা নয়। সামগ্রিক 'ঐতিহাসিক রস' ঘনিয়ে তোলার দিকে অভিনিবিষ্ট থাকতে হয়, একটি ঐতিহাসিক কাল পর্বের পূর্ণায়ত গঠন ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেদিক থেকে সামাজিক-রাজনৈতিক বস্তু সমাবেশে ও ঐতিহাসিক কাল-পর্বটি পুনর্গঠনে হরপ্রসাদ অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন আর একটি মাত্রায়, dimension-এ, ব্যক্তি চরিত্র রূপায়ণেও তিনি সমর্থ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত মেলে সহজ সঙ্ঘের গুরু লুই সিদ্ধার গৌরবময় দিনের প্রতিপত্তির তুলনায় হিন্দু আধিপত্যে তাঁর খর্বিত ব্যক্তিত্বের দীনতা ফোটানোয়, কিংবা নিঃসীম দুঃখের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে চারিত্রিক শক্তিতে মায়ার স্থৈর্য ও শুদ্ধতা অর্জনে কিংবা অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা ও গ্লানি বয়ে গুরুপুত্র চরিত্রটির অপসৃতিতে। মায়ার প্রতি গুরুপুত্রের প্রচ্ছন্ন প্রকাশহীন প্রেম উপন্যাসটির ঘটনার ক্রমপর্যায়ের ভেতর দিয়ে আদ্যন্ত বইয়ে আনা হয়েছে।

সংগোপন বাসনার সঙ্গে ভিক্ষু জীবনের নৈষ্ঠিকতার দ্বন্দ্বে দীর্ণ এই চরিত্রটির জটিল ব্যক্তিত্ব রূপায়ণে হরপ্রসাদ 'মনের সংসারের কারখানা ঘরে' নেমেছেন,— যা আধুনিক উপন্যাসের কলারীতি সম্মত। তার ভিক্ষু জীবন ও সহজযান -এর তত্ত্বের পরিমণ্ডলের সঙ্গে বিজড়িত মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের গতিধারা বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসের শেষতম উপপরিচ্ছেদে গুণীজন সংবর্ধনা সভায় গুরুপুত্রের বহুদিনের পোষিত বাসনা প্রকাশ পেল তার স্বরচিত গানে, 'দারুণ পিআসা, হিঅ মোর ধাবই, কণ্ঠ শোষ গেলা।' এ এক আশ্চর্য মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন লেখক। মায়া এ-সভায় উপস্থিত রয়েছে। সকলেই বুঝতে পারল কার জন্যে গুরুপুত্রের এই আর্তি। হিন্দু আধিপত্যের দিনে হৃতগৌরব তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর পক্ষে প্রকাশ্য সভায় এমন ভাবে বিহারী দত্তর মেয়ের উদ্দেশে প্রেম নিবেদন নীরব ধিক্কারে তিরস্কৃত হল। তার সপ্তগ্রামের মহাবিহার ছেড়ে যাবার উদ্যোগে উপন্যাসের সমাপ্তি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাই বলেছেন, পাথুরে প্রমাণখোঁজা ঐতিহাসিকদের সমালোচনায় উত্যক্ত হয়ে নাকি ইতিহাস লেখা ছেড়ে হরপ্রসাদ বেণের মেয়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। (বর্তমান সংকলনের ১০৭-৮ পৃ. দ্রঃ) ভাগ্যে তাঁকে উত্যক্ত করা হয়েছিল! তাই স্বেচ্ছাসংবৃত তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা শেষ বারের মতো দীপ্ত হয়ে উঠল, সৃষ্টি হল বেণের মেয়ের মতো একটি অনন্যসদৃশ উপন্যাস।

চার.

তবু খেদ রয়ে যায়। বাঙলার এমন একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয় নি, তাঁর কাছ থেকে সম্ভাবিত পূর্ণ দান আমরা পাইনি। সন্দেহ নেই, স্বাভাবিক বিকাশে পরিণতির দিকে এগোলে তাঁর পরীক্ষায়, তাঁর সৃষ্টিতে বাঙলা কথাসাহিত্য ভিন্নভাবে ঋদ্ধ হত। বঙ্কিমের যুগে যাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগেও যাঁর শক্তি অম্লান ছিল, তাঁর মধ্যকালীন আত্মবিকাশের পরীক্ষায় তিনি গোটা বাঙলা উপন্যাসের কালান্তরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সুদীর্ঘ মৌনে নিজেকে সংবৃত রেখে তিনি সে প্রত্যাশা পূরণ করেন নি।

জীবনপঞ্জী

জীবনপঞ্জী

এই জীবনপঞ্জী ও কুলজি শাস্ত্রী মশাই-এর পুত্র শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমঙ্গুগোপাল ভট্টাচার্যের দ্বারা অনুমোদিত।

১৮৫৩ জন্ম ৬ ডিসেম্বর (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৬০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী)। পিতা : রামকমল ন্যায়রত্ন, মাতা : চন্দ্রমণি। প্রথমে হরপ্রসাদের নামকরণ করা হয়েছিল শরৎনাথ। একবার কঠিন অসুখে 'হরের প্রসাদে' ভালো হয়ে ওঠেন। তাই পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় 'হরপ্রসাদ'।

১৮৬১ পিতার মৃত্যু। দাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দী অ্যাঙ্গলো সংস্কৃত স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ কান্দী স্কুলে ভর্তি হন। "আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর স্কুলেই হয়। আমরা প্রায় এক বৎসর কান্দীতে ছিলাম।...তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য,...।" (পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড)।

১৮৬২ নন্দকুমার-এর মৃত্যু। হরপ্রসাদ কাঁটালপাড়ার টোলে অধ্যয়ন শুরু করেন।

১৮৬৬ সংস্কৃত কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কলকাতায় প্রথমে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর বাড়ির ছাত্রাবাসে থাকতেন। ঐ ছাত্রাবাস উঠে যাওয়ায় 'বৌবাজার নেবুতলা নিবাসী' গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকতেন। সেখানে তিনি ঐ বাড়ির ছেলেদের পড়িয়ে নিজ হাতে রান্না করে খেতেন।

১৮৬৮ ডবল প্রমোশন পেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠেন। এই শ্রেণীতে তিনি আট টাকা বৃত্তি পান।

১৮৭১ সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

১৮৭৩ সংস্কৃত কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১৯শ-তম স্থান অধিকার করে পাশ করেন।

১৮৭৬ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি কলেজে বেশি দিন পড়ায় তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ বলে গণ্য করা হয়। তিনি সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় প্রতি মাসে ৫০ টাকা 'সংস্কৃত কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ্', ২৫ টাকা 'লাহা স্কলারশিপ্' এবং 'রাধাকান্ত দেব মেডেল' পেয়েছিলেন।

বি. এ. ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় 'ভারত-মহিলা' নামে যে রচনাটি লিখে হোলকার-পুরস্কার পেয়েছিলেন তা 'বঙ্গদর্শন' (মাঘ চৈত্র সংখ্যা)-এ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়।

১৮৭৭ সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করেন এবং শাস্ত্রী উপাধি পান।

১৮৭৮ হেয়ার স্কুলে ট্রানস্লেশন-মাস্টার পদে নিযুক্ত হন: ১৬ ফেব্রুয়ারি। ২৪ জানুয়ারি ১৮৮৩ পর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন। মাসিক বেতন ছিল ১০০ টাকা। কাটোয়ার কাছে দেয়াসিন গ্রামের রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যা হেমন্তকুমারী দেবীর সঙ্গে বিবাহ: ১৮ মার্চ। চৈত্র মাসে বাসন্তী সপ্তমীর দিনে মাতা চন্দ্রমণির মৃত্যু। সেপ্টেম্বরে ১৩ মাসের ছুটি নিয়ে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

১৮৮০ নৈহাটি পৌরসভার কমিশনার নিযুক্ত হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে ভাইস চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান হন।

১৮৮২ রাজেন্দ্রলাল মিত্র *The Sanskrit Buddhist Literature* গ্রন্থের ভূমিকায় হরপ্রসাদের কাছে ঋণ স্বীকার করে লেখেন: "Babu Haraprasad Shastri, M. A., offered me his Co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works."

১৮৮৩ রামনারায়ণ তর্করত্ন অবসর গ্রহণ করলে সংস্কৃত কলেজের ঐ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন: Asst. Professor of Rhetoric and Grammar (class VI) at Rs 100 per month. Transferred from Hare School and joined in the forenoon of the 25th January 1883."

২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকারের অনুবাদ বিভাগে সহকারী অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৮৪ নৈহাটি বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে এই বেঞ্চের সভাপতি।

১৮৮৫ ৪ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব-কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন এবং বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ঋগ্বেদ অনুবাদে রমেশচন্দ্র দত্তকে সাহায্য করেন। রমেশচন্দ্রের মন্তব্য: "তিনি এই বৃহৎকার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম না।"

১৮৮৬ জানুয়ারি মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি এই পদে কাজ করেন।

১৮৮৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (আজীবন) এবং সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সভ্য।

১৮৯১ জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু হয় এবং এই মাসেই তাঁর জায়গায় হরপ্রসাদ 'ডিরেক্টর অফ দি অপারেশন্‌স ইন সার্চ অফ স্যান্‌সক্রিট ম্যানস্‌ক্রিপ্টস' অর্থাৎ পুঁথি সংগ্রহ কার্যের প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হন।

১৮৯২ এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েণ্ট ফিললজিক্যাল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন।

১৮৯৫ ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক। তাঁর চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতে এম. এ. পড়াবার ব্যবস্থা হয় (১৮৯৬)।

Buddhist Text and Research Society-র সম্পাদক।

১৮৯৭ ১৪ মার্চ (২ চৈত্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর সদস্য নির্বাচিত হন।

মে মাসে পুঁথি সন্ধানের জন্য নেপাল যাত্রা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। ১৩০৪-১৩০৯, ১৩১৮-১৩১৯, ১৩২৩-১৩২৬, ১৩৩১, ১৩৩৭-১৩৩৮ তিনি পরিষৎ-এর সহকারী সভাপতি ছিলেন।

১৮৯৮ সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন।
ডিসেম্বর-এ অধ্যাপক বেণ্ডেল-এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার নেপাল যাত্রা।

১৯০০ ৮ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাঙলাদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন।

১৯০৩ বুদ্ধগয়া মন্দির সম্পর্কে গঠিত কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৯০৪ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৯০৬ এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯০৭ তৃতীয়বার নেপাল যাত্রা। চর্যাপদ আবিষ্কার।

১৯০৮ নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। সরকার তাঁকে 'ব্যুরো অফ ইন্‌ফরমেশন' নামক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল: 'for the benefit of Civil Officers in Bengal, in history, religion, customs and folklore of Bengal....'
সরকারের অনুরোধে অক্সফোর্ড-এর অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলকে পুঁথি সংগ্রহে সাহায্য করেন এবং ম্যাক্সমুলার স্মৃতিভবনের জন্য দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করেন।
স্ত্রী হেমন্তকুমারী দেবীর মৃত্যু।

১৯০৯ এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজপুতানা এবং গুজরাটে ভাট ও চারণদের পুঁথি অনুসন্ধানের দায়িত্বগ্রহণ।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন।

১৯১০ এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো হন।

১৯১১ সরকার সি. আই. ই. (Companion of the Indian Empire) উপাধি দেন। সিমলায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্‌দের সম্মিলনীতে সদস্য মনোনীত হন।

১৯১৩ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর সভাপতি (১৩২০ বঙ্গাব্দ)।
হরপ্রসাদ ১২ বৎসর পরিষৎ-এর সভাপতি ছিলেন (১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬ বঙ্গাব্দ)।
কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯১৪ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে ১৩২১ বঙ্গাব্দ) মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯১৬ মথুরায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মিলন-এ সভাপতি।
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সৌধের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে *'The Educative Influence of Sanskrit'* নামে একটি ভাষণ দেন।

১৯১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে (সাহিত্য-সম্মিলন) সভাপতি।

১৯১৯ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯২১ পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন।

১৯২০ হেতমপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পান কিন্তু এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি।
কমলা বুক ডিপো নামক প্রকাশন সংস্থায় যোগ দেন। আমৃত্যু এই সংস্থার বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯২১ ইংলণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির 'অনারারি মেম্বার'।
রবীন্দ্রনাথের ৬০তম জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আয়োজিত সভায় আশীর্বাণী পাঠ।
১৮ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ জুন ১৯২৪ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

১৯২২ চতুর্থবার নেপাল যাত্রা।
রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য পদ লাভের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সংবর্ধনা (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)।
কলকাতায় ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিভাগের সভাপতি।

১৯২৩ কলকাতায় অনুষ্ঠিত অখিল-ভারত-হিন্দুসভায় সভাপতিত্ব।
নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনের (৮ আষাঢ় ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ২৩ জুন) আহ্বায়ক। এই সম্মিলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নৈহাটিতে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৯২৪ রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল সভাপতি।
সংস্কৃত কলেজে গভর্নর লর্ড লিটন শাস্ত্রী মশাই-এর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯২৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দান।

১৯২৮ কলকাতায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায়। ফলে তাঁকে ক্রাচ এবং চাকা লাগানো চেয়ার ব্যবহার করতে হত।
লাহোরে ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান সভাপতি।

১৯৩০ বৃহত্তর ভারত পরিষদের (Greater India Society) সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হরপ্রসাদ-বর্ধাপন-সমিতি 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা' প্রথম খণ্ড এবং তখন পর্যন্ত অমুদ্রিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলী শাস্ত্রী মশাইকে উপহার দেন। আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় তাঁকে মাল্যভূষিত করেন এবং নিজে তাঁকে খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দেন।
১৭ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) রাত্রি ১১টায় অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠতম পৌত্র দেবতোষ ভট্টাচার্য কাছে ছিলেন। রাত্রেই শবদেহ কলকাতার পটলডাঙার বাড়ি থেকে নৈহাটির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরদিন নৈহাটিতে অন্ত্যেষ্টি নিষ্পন্ন হয়।

[বারাণসীর ভারতধর্ম মহামণ্ডল শাস্ত্রী মশাইকে প্রত্নতত্ত্ব-রত্নাকর উপাধি দেন। কিন্তু কোন সময়ে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল তা জানা সম্ভব হয়নি। তিনি Indian Association of the Cultivation of Science-এর সদস্য ছিলেন।]

ক্ষিতীশ

ইনি কান্যকুব্জ থেকে বাঙলাদেশে আসেন

|

ভট্টনারায়ণ

এঁকে বংশের আদি পুরুষ মনে করা হয়। সংস্কৃত নাটক বেণী-
সংহার সম্ভবত এঁর রচনা। খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ

|

বরাহ

|

সুবুদ্ধি

|

বৈনতেয়

|

বিবুধেশ

|

গাউ

|

গঙ্গাধর

|

পশো

|

শকুনি

|

মহেশ্বর

লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন। একে সভাতিলক বলা হত

|

মহাদেব

|

দুর্বলী

|

নারায়ণ

|

পীতাম্বর

|

শ্রীরঙ্গ

|

নিত্যানন্দ

|

প্রজাপতি
বেদাঙ্গদ
পুণ্ডরীকাক্ষ
জীবনাথ
কৃষ্ণদাস
রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্কার
নলডাঙার সভাপণ্ডিত
রঘুনাথ চক্রবর্তী
রামনাথ
রামবল্লভ
মাণিক্য তর্কভূষণ
মাণিক্য তর্কভূষণ কুমিরা (যশোর, অধুনা খুলনা) থেকে নৈহাটি আসেন ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে
শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার
রামকমল ন্যায়রত্ন ঃ ১৮০১-১৮৬১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (শরৎনাথ) ঃ ১৮৫৩-১৯৩১
মনোরমা (বুড়ি)
সুরবালা
সন্তোষ
আশুতোষ
পরিতোষ (বড়খা)
বিনয়তোষ (ছোটখা)
সুষমা (ফুলি)
কালীতোষ
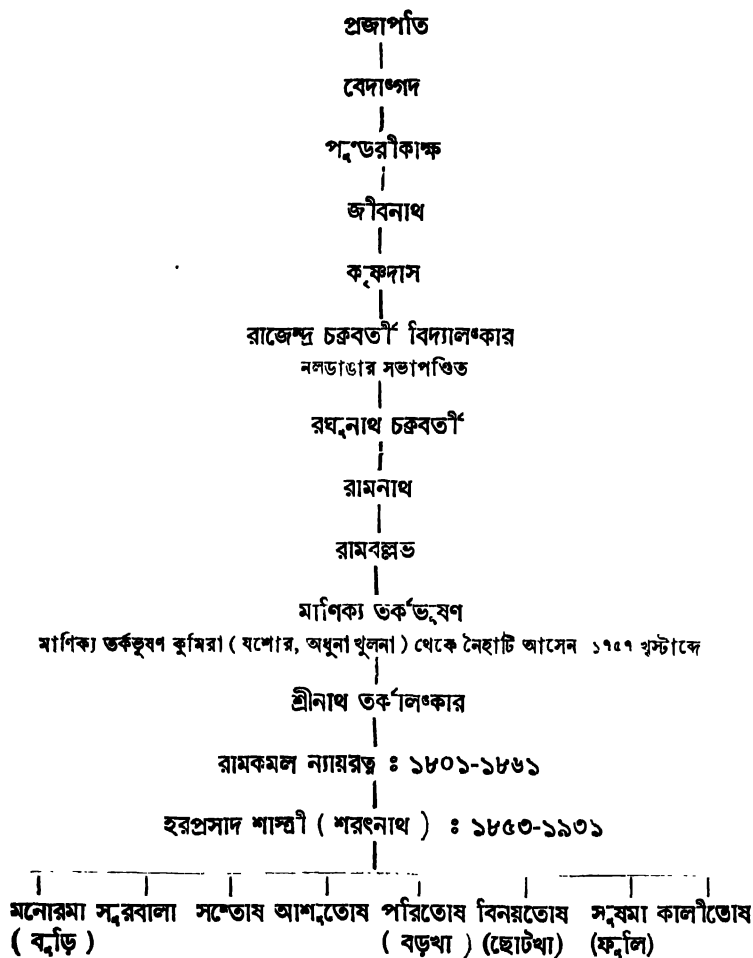
শাস্ত্রীমশাই-এর মৃত্যুতে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে শোকনিবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ নিচে সংকলন করে দেওয়া হল।

The Statesman, Thursday, Nov. 19, 1931

"Mahamahopadhyay Haraprasad Sastri a distinguished Sanskrit Scholar and historian, who died in Calcutta on Tuesday night, was regarded as an authority on ancient Indian history and Indian classical languages.

"He was an ordinary Fellow of the Calcutta University, and an active member of the Asiatic Society of Bengal, and for many years was Principal of the Calcutta Sanskrit College. On his retirement from Government Service in 1908 he was placed in charge of the Bureau of Information, for assisting civil officers in Bengal in matters relating to the history, religion, customs and folklore of Bengal. He was also one of the founders of the Bangiya Sahitya Parishad."

The Amrita Bazar Patrika, Nov. 19, 1931
Editorial : LATE PANDIT HARAPRASAD SASTRI

"In the death of Pandit Haraprasad Sastri India has lost one of her greatest sons and world one of her savants. He was one of the most distinguished Sanskrit scholars but unlike other erudite Pandits did not confine his attention to Sanskrit. History, Archæology and Philology captivated his attention very much more than Sanskrit literature. He was a great linguist and man of encyclopædic lore but the most remarkable character of his genius which distinguished him from many people with the same vast range of studies was that he assimilated what he read and could bring to bear upon the discussion of every subject the indelible stamp of his great synthetic mind. For more than half a century he carried on researches in the field of ancient Indian History, Archæology and Philo-

logy with unabated zeal and remarkable success. As a matter of fact it would be no exaggeration to say, he was the founder and the fountain head of inspiration of the new school of scientific research in History and Archæology in this country. His service to the Bengali literature and Philology was also very great. His discovery of a large volume of Bengali-Buddhist literature which threw a new light on the origin and nature of the Bengali language and literature was in fact one of the most notable achievement. Pandit Haraprasad Sastri was born in a poor Brahmin family but solely by dint of industry, assiduity and his inborn genius he attained the great position which he did. He was a scholar who literally lived among his books and had no time to be engaged in other pursuits. But though politics was not his field of action, Pandit Haraprasad was an ardent patriot who from his intimate acquaintance with the great achievements of India in the past had a burning faith in an equally or even greater future for her. Pandit Haraprasad has died full of years and honours. May his soul rest in peace."

বঙ্গবাণী, বৃহস্পতিবার, ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, ১৯ নভেম্বর ১৯৩১
সম্পাদকীয় : পণ্ডিত হরপ্রসাদ

"জ্ঞানের প্রদীপ্ত প্রতিভা, বাঙ্গালার চিরগৌরব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর নাই। গত মঙ্গলবার রাত্রি দুইটার সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া বাঙ্গালার এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ পরলোক গমন করিয়াছেন। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া শিক্ষার আলোকে যাঁহারা বাঙ্গালীর চিত্ত আলোকিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সাধনা সার্থক হইয়াছে, জ্ঞানের গৌরবে বাঙ্গালী আজ বিশ্বজয়ী, কিন্তু শিক্ষা প্রবর্ত্তক পণ্ডিত হরপ্রসাদকে আর আমাদের কাছে পাইব না। জাতির এই শোক ভুলিবার নহে, এ বিয়োগ ব্যথা দুর্বিষহ।

"যাহাদের অনেক আছে, দুঃখে শোকে তাহাদের সান্ত্বনার অভাব হয় না। কিন্তু যাহাদের সম্বল অল্প, সম্পদ বলিতে যাহারা স্বল্পকেই আঁকড়াইয়া থাকে,

তাহাদের নিকট বিচ্ছেদ ব্যথা অসহনীয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদের তিরোধানে বাঙ্গালা আজ শোকমগ্ন, তাঁহার মহাপ্রয়াণে সমগ্র জাতি আজ অভিভূত। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি যে অক্ষয় সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, জাতির ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় রহিবে। তাঁহার গভীরতার তল খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সংস্কৃতের পণ্ডিত হইয়াও বঙ্গসাহিত্যে তিনি যে অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও ভাব মন্থন করিয়া বাঙ্গালীর জ্ঞাননেত্রে তিনি যে অমৃতের অঞ্জন পরাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীর সাহিত্য জ্যোতিষ্মান হইয়া আছে। সংস্কৃতের এই প্রবুদ্ধ পণ্ডিতকে, পালি প্রাকৃতের এই সন্ধানী আলোকে, বঙ্গসাহিত্যের এই দীপংকরকে বাঙ্গালী ভুলিবে কি করিয়া?

"মনীষার দীপ জ্বালাইয়া আলোকের দীপ্তরথে পণ্ডিত হরপ্রসাদ মহাপ্রয়াণ করিলেও, তাঁহার সাধনার দীপ্তি নির্ব্বাপিত হইবে না। এ জগৎ হইতে তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত জ্ঞানালোকই তাঁহাকে বাঙ্গালীর চিত্তে চিরজাগরূক করিয়া রাখিবে। যাঁহার আলোকে জগৎ আলোকিত, যাঁহার কর্ম্মসাধনায় সমগ্র জাতি গৌরবান্বিত, তাঁহার তিরোধান যে এত আকস্মিক হইবে তাহা কে জানিত? পণ্ডিত হরপ্রসাদের মহাপ্রয়াণে বাঙ্গালী মাত্রেই আজ মুহ্যমান। এ শোকের ভাষা নাই, এ দুঃখের গভীরতা অপরিমেয়। শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আমরা আমাদের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮ সাল
সম্পাদকীয়: পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

"পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরলোক গমনে শুধু বাঙ্গলা সাহিত্যের নয়, শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজেরও একটী ইন্দ্রপাত হইল। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী সমাজকে তিনি তাঁহার অম্লান প্রতিভার জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বের নিকট গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

"আধুনিক যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যকে যাঁহারা ধাত্রীর মত সযত্নসেহে পুষ্ট করিয়াছেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ভাটপাড়া প্রাচীন পণ্ডিত সমাজের বংশধর তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন।

যৌবনে নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যরূপে তিনি বাংগলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বানে যাঁহারা নব্য বাংগলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তারপর হইতে অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া তিনি সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সর্ব্বাবস্থায় নানাভাবে বাংগলা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। এমন অতন্দ্রিত নিরলস সাহিত্য-সেবী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাংগলা সাহিত্যের উপর ধাত্রীর মতই তাঁহার এমন একটা 'নাড়ীর টান' ছিল যে, তাহার জন্য তিনি বহু ত্যাগ, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভংগ হইয়া পড়িয়াছিল, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়া গিয়া তাঁহার একখানি পাও ভাংগিয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে একদিনের জন্যও বিরত হন নাই, রোগশয্যায় শুইয়াও প্রাচীন বাংগলা সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা, প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন।

"বংগীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ন্যায় তিনি অকাতরে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। পরিষদের যে আজ এত প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার কার্য্যক্ষেত্র নানাদিকে এত বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মূলে শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি। এই অকৃত্রিম বন্ধু, হিতৈষী ও সেবককে হারাইয়া সাহিত্য পরিষদের যে গুরুতর ক্ষতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"বাংগলার প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসভাণ্ডারে শাস্ত্রী মহাশয়ের দান অসীম। বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বাংগলা, প্রাকৃত, পালি ও তিব্বতীয় গ্রন্থ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার ফলে বাংগলা ভাষা, বাংগালী জাতি ও বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। বাংগলার প্রাচীন ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত তথ্য তিনিই প্রথম প্রকাশ করিয়া বাংগালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বাংগালীর অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্য্য তিনি বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া জগৎসমক্ষে তাহা প্রচার করিয়া বিশ্বে বাংগালীর সম্মান বাড়াইয়াছেন। তিনিই একদিন বলিয়াছিলেন, 'বাংগালী আত্মবিস্মৃত জাতি'—তাঁহার সেই কথা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

"বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা অমূল্য।

এ বিষয়ে তিনি যেসব নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা জগতের পণ্ডিত সমাজে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

"শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু ঐতিহাসিক গবেষণার ফল, ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধাকারে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাকারে অনেক জিনিষ প্রকাশিত হয় নাই। যদি বাঙ্গলা সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুরাগীগণ সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তবে বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে তাহা স্থায়ী সম্পদ রূপে গণ্য হইবে।

"শাস্ত্রী মহাশয় স্বভাবতঃই নীরবে অন্তরালে থাকিয়া কাজ করিতেন,—আত্মগৌরব প্রচারে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্য বাঙ্গলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতির জন্য তাঁহার বিরাট দান দেশবাসী সম্পূর্ণ অবগত নহে,—তাঁহার যোগ্য সম্মানও দেশবাসী তাঁহাকে দিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রত্যেক জীবন্ত জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি আত্মসমাহিত নীরব কর্ম্মী জন্মেন, যাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানযজ্ঞ ও তপস্যার ফল নিষ্কাম ভাবে জাতিকে দান করেন। জাতির প্রাণ-শক্তিকে অন্তরলোক হইতে ইঁহারাই উদ্বুদ্ধ করেন, মানব-সভ্যতার উচ্চস্তরে তাহাকে উন্নীত করেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেইরূপ একজন মহান্ তপস্বী ছিলেন। ৭৮ বৎসর বয়সে জীবনের কর্ম্ম শেষ করিয়া ভীষ্মের ন্যায় তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের এই পিতামহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।"